সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

সম্পাদক	:	বিনয় ঘোষ
কার্যকরী সম্পাদক	:	সঞ্জয় চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	:	কল্যাণ ভট্টাচার্য, অসীম রক্ষিত, মানস বসু, শ্যামলী সুর
ব্যবস্থাপক	:	প্রশান্ত পাল
বিজ্ঞাপন	:	মধুছন্দা সিন্‌হা
প্রচার	:	সোমা মুখোপাধ্যায়
পরিচালক মণ্ডলী	:	সুমিত বসু, অলোকসুন্দর বসু, তপন দে, স্বপন দে, ডা. শুভানন রায়, মধুমিতা বসু, আশিস সেনগুপ্ত
প্রচ্ছদ	:	সুনীল দে
যোগাযোগ	:	টি জি ২/২৯, তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০ ০৫৯ ৪৩/১এ, মলঙ্গা লেন কলকাতা-৭০০ ০১২
ফোন	:	৫৯ ৪০৪৮

উৎপলকুমার বসু / ভূমিকা ৭ □ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় / ঘাটশিলার স্মৃতি ১১ □ ইমানুয়েল কাণ্ট / জ্ঞানদীপ্তি কাকে বলে ১৫ □ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত / একটি চিঠি ২৩ □ শিবাজীপ্রতিম বসু / বিমূর্তায়নের প্রক্রিয়া : জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ ২৫ □ শ্যামলী সুর / বিমূর্ততা : ইতিহাসের বন্ধন ও মুক্তি ৩২ □ শুভেন্দু দাশগুপ্ত / বিমূর্ততা—একটি স্বাধীন অবস্থান ৩৬ □ অরুণ নাগ / দীপান্তরী অভিরাম ৬৯ □ প্রদীপ বসু / বিমূর্ত সংগীতের সামাজিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ৫৫ □ মিহির চক্রবর্তী / আকাশকুসুমের অধিকার / ৬৭ □ সুদীপকুমার আচার্য / মন্তব্য : ১ ৭২ □ পার্থপ্রতিম ঘোষ / মন্তব্য : ২ ৭৩ □ মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র / দর্শনে বিমূর্ত বিষয় ৭৫ □ শুভানন রায় / রোগনির্ণয় ও চিকিৎসায় বিমূর্তের ভূমিকা ৮৮ □ মনসিজ মজুমদার / অরূপের রূপ ও ভাষা ৯১ □ অমিতাভ সেনগুপ্ত / মূর্ত-বিমূর্ত সংবাদ ১০৫ □ যোগেন চৌধুরী / বিমূর্ততা এবং বাস্তবিকতা ১১১ □ গণেশ হালুই / ডায়েরি থেকে ১৩১ □ ইমামুর রশীদ / সাধের পুতুল ১৩৫ □ কালীকৃষ্ণ গুহ / অস্তিত্ব, অতিথি তুমি ১৩৬ □ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় / মল্লিনাথের সঙ্গে তর্কাতর্কি ১৪০ □ মানস রায় / আকাশকুসুমের রাজনীতি : কালচারাল স্টাডিজ প্রসঙ্গে দু-চার কথা ১৬৩

ছবি :

স্বপ্না সেন ১৪-১৫ □ তপন মিত্র ৩০-৩১ □ অশোক চন্দ ৪৬-৪৭ □ রবীন মণ্ডল ৬২-৬৩ □ প্রকাশ কর্মকার ৭৮-৭৯ □ বাঁধন দাস ৯৪-৯৫ □ অমিতাভ ধর ১১০-১১১ □ সুনীল দে ১৪২-১৪৩ □ প্রভাত বসু ১৫৮-১৫৯

[শিল্পীর নামের পাশে ছবিসংলগ্ন পাতার নম্বর দেওয়া আছে।]

পত্রিকা উঠে গিয়েছে ধরে নিয়ে, সমবেদনার চিঠি পাঠিয়েছেন কেউ কেউ। যোগসূত্রের সেই পাঠকদের আগ্রহ ও প্রত্যাশা এ পর্যন্ত কতটা পূরণ করতে পেরেছি সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এটা নিশ্চয়ই অপরাধ বলে গণ্য হবে যে সম্পাদকের তরফে ঐসব চিঠির লেখকদের আমরা এক লাইন লিখেও পত্রিকার কুশল সংবাদ দিতে পারিনি। বিলম্বে হলেও সংখ্যাটি যে প্রকাশিত হল, ধরে নিতে হবে সেটাই কুশল বার্তা। তবে এই অতি বিলম্বের জন্য লেখক-পাঠক-বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত উচ্চাঙ্গের ক্ষুটিকয় পত্রিকার শীর্ষে ছিল 'এক্ষণ'। সম্পাদক নির্মাল্য আচার্যের একক চেষ্টায় বিগত কিছুকাল যাবৎ পত্রিকাটি বছরে একবার মাত্র প্রকাশিত হলেও, বাঙালি পাঠকের একাংশ পত্রিকাটির প্রকাশের দিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত নির্মাল্যবাবুর সম্প্রতি মৃত্যু ঘটেছে। 'এক্ষণ' প্রকাশিত হবে না। এর থেকে দুঃখের আর কী আছে!

২২. ৮. ৯৫

বিমূর্ততা বিষয়ক এই সংখ্যার আমন্ত্রিত সম্পাদক

□ উৎপলকুমার বসু □

☐ Space donated by a Well Wisher ☐

□

কীভাবে ঘটল আজ প্রায় মনেই পড়ে না।

প্রায় ম্যাজিকের মতো।

১৪-সালের মাঝামাঝি 'ফার' বা 'ফোরাম ফর আর্ট অ্যান্ড রিসার্চ'-এর সাপ্তাহিক আড্ডায়, গল্প-গাছার ফাঁকে, এক ধরনের অতৃপ্তি প্রকাশ পায়। কারণ হল এই, আমাদের কথাবার্তা জমতে না জমতেই সকলকে উঠে পড়তে হচ্ছে। কেউ যাবেন যাদবপুর, কেউ সল্ট লেক, কেউ হাওড়া। আবার কেউ-বা বেহালা। সুতরাং, কলকাতার বাইরে, দিন তিন-চারেকের জন্য একটা বাধাবন্ধহীন আলাপচারিতার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?

কর্মটির একটা ভারিক্কি গোছের নামও স্থির হল— 'কলোক্যুয়াম'। অর্থাৎ সেই খোলামেলা আড্ডাই। তবে সামান্য গোছানো। বাড়ির রান্নাঘরের তাক আর কি। স্থান? পার্বতী মুখোপাধ্যায় তাঁর ঘাটশিলার আবাসটি

অফার করলেন। সঙ্গে পাওয়া যাবে বিভূতি স্মৃতি-সঙ্ঘের অতিথিশালা। সময় ? পুজোর পর। পুজোর পর ঘাটশিলা! অনেকে তক্ষুনি রাজি।

এবার বিষয়। আমরা এ ওর দিকে তাকালাম। ধীরে ধীরে, একটি দুটি প্রস্তাব মাদুরে পড়ল। শেষে রফা হল, বিষয় হবে— বিমূর্ততা। বিমূর্ততা ও তার প্রক্রিয়া। 'অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড প্রোসেসেস্ অফ অ্যাবস্ট্রাকশন।' বেশ ভালোই শোনাল কথা ক-টি। জ্ঞানী এক দার্শনিক পরে ভয় দেখালেন— 'তোমরা পাগল হয়েছ ? ও-সব নিয়ে প্লেটো-অ্যারিস্টটল ভাবতেন।' কিন্তু সাঁতার না-জানা লোকেরও কি সময় সময় ইচ্ছে হয় না স্রোতে লাফিয়ে পড়ি ? জলবুনো হয়ে উঠি ?

এবার টাকাকড়ি। 'ফার' তার ঝোলাঝুলি ঝেড়ে কিছু অর্থসাহায্য করতে রাজি হল।

এগিয়ে এল 'যোগসূত্র'। তারা সমস্তটা ডকুমেন্ট করবে। এবং একটি সংখ্যাও তারা প্রকাশ করতে রাজি। ঐ ঘাটশিলা কলোকুয়ামের উপর। সেই সম্মতির অভিজ্ঞান আপনি এখন পাঠ করছেন।

যদিও এইসব লিখিত রচনায় ধরা পড়েনি আলোচনাকালীন কথার-পিঠে-কথার চমকপ্রদ আলোড়ন, যুক্তি-নাকচের শাণিত বিদ্যুত, নতুন কোনো তত্ত্বের ঘুমভাঙা সৌন্দর্য এবং বিস্ময়বোধ, হাস্যপরিহাস ও অবিশ্বাসীর ভ্রূবিলাস।

এবার কাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে? ছবি-আঁকিয়েরা তো যাবেনই। কবি-লেখকরাও যাবেন। সমালোচকরা যাবেন। কিছু ছাত্র-ছাত্রী যাবেন।

বিশেষজ্ঞরা যাবেন না ? অধ্যাপকরা ? হ্যাঁ, তাঁরাও যাবেন! তবে একটি শর্তে— মিহির চক্রবর্তী নির্দেশ দিলেন। তাঁরা এই মানসিকতা নিয়ে যাবেন যে ঐ সভায় তাঁরা কিছু পাবেন বলে এসেছেন, অন্যদের জ্ঞান দিতে নয়। হাততালি পড়ল।

শেষ পর্যন্ত যাঁরা যোগ দিতে পেরেছিলেন তাঁদের সামগ্রিক নামের তালিকাটি (পদবীর ইংরেজি অ-কারাদি ক্রমে) পেশ করি : সুদীপ ব্যানার্জি, মানস বসু, প্রভাত বসু, শিবাজীপ্রতিম বসু, উৎপলকুমার বসু, প্রদীপ বসু, মিহির চক্রবর্তী, নমিতা চৌধুরী, অশোক চন্দ, অনিন্দ্য চাকী, সঞ্জয় চক্রবর্তী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বিজন চৌধুরী, সুনীল দে, অর্পিতা দে, অভিজিৎ দাস, অমিতাভ ধর, বাঁধন দাস, সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত, ভুমেন গুহ, কালীকৃষ্ণ গুহ, সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদার, গণেশ হালুই, প্রকাশ কর্মকার, অনিরুদ্ধ লাহিড়ি, পার্বতী মুখোপাধ্যায়, মাধব মিত্র, তপন মিত্র, তন্দ্রা মিত্র, মনসিজ মজুমদার, অসীম

রক্ষিত, মানস রায়, স্বপ্না সেন, শ্যামলী সুর ও নবীনানন্দ সেন। কলকাতা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও টাটা থেকে কিছু ছাত্র ও উৎসাহী ছেলেমেয়েরা খবর পেয়ে নিজেরাই হাজির হলেন। কলকাতার আর্ট কলেজের স্টুডেন্টরাও হাজির। শুনেছি তাঁরা রাত্রে সুবর্ণরেখার পাথরে শুয়ে থাকতেন। সভায় কাটাতেন সারাদিন। আমাদের অতিথিরা নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে গিয়েছিলেন, বলা বাহুল্য। দু-একজনকে অবশ্য আমরা এ-বিষয়ে রাগে আনতে পারিনি।

এবার বলি সভা বা কলোক্যুয়াম কীভাবে চলত। প্রথমত, ঘাটশিলায় যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ও বিতর্কিত এবং যাঁরা অপেক্ষাকৃত কমবয়েসী তাঁরা সৃজনকর্মে ও চিন্তার গভীরতায় বয়স্কদেরই সমতুল্য। এ ছাড়া শ্রোতা এবং আলোচনায় ছোটভাবে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা তো ছিলেনই। স্থানীয় অধ্যাপক দু-একজন এসেছিলেন।

প্রথম দিন, বিকেলে, সভার শুরুতে, আমার উপর দায়িত্ব ছিল অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর এবং সেই সূত্রে প্রাসঙ্গিক দু-একটা কথা বলার। আমি অনুরোধ করেছিলাম বক্তারা যেন মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে তাঁদের বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখেন। কারণ বক্তা, শ্রোতারা এবং সঞ্চালক যেন একত্রে, পরে, আলোচনায় পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতে পারেন। বহু সদুপদেশের মতো, এসব কথায় কেউ কান দেয়নি।

কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে বক্তা, শ্রোতাদের উত্তর-প্রত্যুত্তরে, তাঁর বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে অনুধাবনের প্রেরণা লাভ করেছেন। এই কলোক্যুয়াম বা আলাপচারিতা থেকে কোনও প্রস্তাব গঠিত হয়নি, কোনও পলিসি বা সিদ্ধান্তজড়িত জটিলতায় আমাদের বিব্রত হতে হয়নি। আমাদের লক্ষ্য ছিল স্বচ্ছ চিন্তা, মুক্ত প্রয়োগ ও স্বাধীন অনুসন্ধান।

আমাদের ভাবনার বিষয় যদিও ছিল বিমূর্ততা বিষয়ক প্রশ্নাদি— স্বভাবতই বক্তারা প্রক্ষিপ্ত কিছু প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারেননি।

যাঁরা ততটা বলিয়ে-কইয়ে নন, তাঁরা ছবি একেছেন, কবিতা লিখেছেন।

আমরা অনুভব করেছি যাঁরা উপস্থিত হতে পারেননি তাঁদের অলক্ষ্য প্রভাব —মাদ্রাজে অমিতাভ সেনগুপ্ত, দিল্লীতে রবীন মণ্ডল, ঢাকায় শুভেন্দু দাশগুপ্ত, শান্তিনিকেতনে যোগেন চৌধুরী, কলকাতায় বিনয় ঘোষ এবং রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কথা বহুবার ভেবেছেন, উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের লেখা, ছবি এবং বিবিধ শ্রমের ছাপ এই সংখ্যায় আছে।

আরও আছে কিছু মৌলিক এবং বিশিষ্ট ভাবনা-সম্বলিত রচনা যা আমরা পরবর্তীকালে সংগ্রহ করেছি। এঁরা যেন আমাদের নতুন বন্ধু— অরুণ নাগ ও শুভানন রায়। মিহির চক্রবর্তীর গণিত-বিষয়ক রচনার প্রাসঙ্গিক সংযোজন এসেছে সুদীপকুমার আচার্য ও পার্থপ্রতিম ঘোষের কাছ থেকে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর ইমানুয়েল কান্ট-বিষয়ক সংযোজনটি এই সেদিন হাতে পেলাম।

আমাদের কিছু কিছু দোষের কথাও বলা দরকার। কয়েকটি বিষয়ের জন্য উপযুক্ত কোনও অংশগ্রহণকারীকে আমরা পাইনি বা তেমনভাবে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। অবহেলিত হয়েছে বিজ্ঞান, নৃত্য, নাট্যশাস্ত্র, মনোবিদ্যা ও সংযোগতত্ত্ব। বিমূর্ততার আলোচনায় ধর্মজ্ঞানী এবং সমাজকর্মী-রাজনৈতিক কর্মীদের অনুপস্থিতিও মেনে নেওয়া চলে না।

আরেকটি ছোট স্খলনের কথা বলি। আমরা ঘাটশিলায় বেশ কিছুটা সময় ছোটদের এবং প্রতিবন্ধীদের বিমূর্ত চিন্তা ও তার প্রকাশ (ভাষায়, ছবি আঁকায় ও হাতের কাজে) নিয়ে আলোচনা করেছি। এই সংখ্যায় তার কোনও লিখিত প্রতিবেদন নেই।

অনিরুদ্ধ লাহিড়ি এবং নবীনানন্দ সেনের উজ্জ্বল ভাষ্য থেকেও আপনারা বঞ্চিত হলেন। বিজন চৌধুরীর ছবি শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

আমাদের সভা বা কলোক্যুয়াম শুরু হত সকাল ন-টায়। মধ্যে স্নান-খাওয়ার বিরতি ছিল। কিন্তু তখনও বৈঠক চলত। অনেক রাতে ছাদে বসে, আলোচনার ক্লান্ত শেষ পর্যায়ে আমরা দেখেছি আকাশ তামার খনির লাল আগুন ও ধোঁয়ায় ভরে গেছে। তখন কেউ কেউ গান ধরতেন।

আমার, ব্যক্তিগত ভাবে, অনেককে ধন্যবাদ দেওয়ার আছে। অশোক চন্দ, তপন মিত্র, সুনীল দে, পার্বতী মুখোপাধ্যায় এবং মিহির চক্রবর্তীর সাংগঠনিক প্রতিভাকে সেলাম। বিভূতি স্মৃতি-সঙ্ঘের অতিথিশালার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন নবপত্র প্রকাশনীর প্রসূন বসু। পথের পাশে যে ছোট্ট হোটেলটিতে আমরা খেতে যেতাম সেটিও আজ আমাদের স্মৃতির অঙ্গ।

ফেরার পথে একটি প্রশ্নই আমরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছি— 'আবার কবে এমন একটা মেলামেশা হবে?'

উৎপলকুমার বসু

ঘাটশিলার স্মৃতি

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের 'জুতা-আবিষ্কার' পদ্যটি যে-দেশে ছোটবেলাতেই পড়তে হয়, সে-দেশে সেমিনার ব্যাপারটা যে কী, তা হয়তো বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। পৃথিবীর সব সেমিনারেই, আমারও ধারণা ছিল, পদধূলিতত্ত্ব নিয়ে উনিশ পিপে নস্য সেবনান্তর সতের লক্ষ সম্মার্জনী হস্তে ধুলোই ওড়ানো হয় শুধু। সূর্য ঢেকে যায়। ঘাটশিলায় তাই পেন্সিল বা নোটবই নিয়ে যাইনি। কোনও প্রত্যাশা ছিল না।

ঘাটশিলায় 'ফোরাম ফর আর্ট অ্যান্ড রিসার্চ' (FAR) আয়োজিত তিনদিনের সেমিনারে যোগ দিয়ে, আমার তাই বলতে অত্যন্ত নিষ্পাপ লাগছে যে, আমার সেমিনার-ধারণা, নির্মূলভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রেমে-পড়ার মতন ভুল ধারণা ভেঙে-পড়ারও কোনও বয়স নেই। এ-রকম অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছে তাঁরাই জানেন এতে কী মুক্তির আনন্দ! এরকম অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পরাজয়ই জয় হয়ে দাঁড়ায়।

২৭, ২৮, ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৪ এই সেমিনার চলে ঘাটশিলায় পার্বতী মুখার্জির 'মৌ-শিলা' নামে বাড়ির ঢাকা বারান্দায়। মাঝখানে লাঞ্চ-ব্রেক-এর এক ঘণ্টা বাদে

সেমিনার চলত অনর্গল— সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। লাঞ্চ বলতে ফুলডুংরির টিলার পাদদেশে একটি ঝোপড়ি-হোটেলে তিন কোর্সের লাপ্সি। সকালে মুড়ি-সিঙারা সহযোগে ভাঁড়ে চা-পানের সময়টুকুতেও আলোচনার জের চলত। রাত্রিবাস ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে— এর-ওর বাড়িতে— বিভূতি-ভবনে। মশারি বা লেপ-তোষক সবাই পায়নি। শিল্পী বাঁধন দাস সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন বহনযোগ্য তাঁবু। উনি মাঠে থাকতেন। উল্লেখযোগ্য যে, কমবেশি ৪০ জন বুদ্ধিব্রতীর এই দৈনিক ৪-প্রহর-ব্যাপী মন-কষাকষি ছিল একান্তভাবে তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ, তাঁরা ছাড়া এই আলাপচারিতার (কলোকিয়াম) আর কেউ সাক্ষী ছিল না। এ-যেন তন্ত্রসাধকদের গোপন সাধনচক্রের মতো। নিঠুর-দরদী উৎপলকুমার বসুর কর্তৃত্বে ও পার্বতী মুখোপাধ্যায়ের নিখুঁত গৃহিনীপনায় ফার-এর এই সেমিনার ছিল এমন এক অভিজ্ঞতা যা শুধু তাঁরাই জানলেন, যাঁরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার কোনও রিপোর্ট কাগজে বেরোয়নি। শুধু 'যোগসূত্র' পত্রিকাকে ডাকা হয়েছিল। এঁরা সেমিনারের আদ্যোপান্ত অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে টেপে রেকর্ড করেন। এই অভিনব কর্মশালার ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিকগুলি আজ এই পত্রিকা বিশদভাবে উপস্থিত করছে।

২

কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল : বিমূর্ততা ও বিমূর্তনের প্রক্রিয়া। গণিত, পদার্থবিদ্যা, সমাজ-বিজ্ঞান ও দর্শন থেকে বেশ ক'জন জানে-মানে বিশেষজ্ঞ বিষয়টির ওপর নিজ নিজ অনুসন্ধানের আলোকপাত করেন। প্রায় সকলেই বিষয়টিকে দেখতে চান পোস্ট-মডার্ন বা উত্তর-আধুনিক অবস্থান থেকে।

উত্তর-আধুনিকতা বা পোস্ট-মডার্নিস্ট বিচারধারার আলোয় 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স'-এর মানস রায়ের ভূমিকা এই আলোচনাচক্রে ছিল প্রধান পুরোহিতের মতন। পরিশীলিত, শ্মশ্রুময়, আয়তচক্ষু ও রূপবান এই তরুণ অধ্যাপক মূলত বক্তব্য রাখেন বিমূর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে। তাঁর লিখিত বর্ণনা ও কাগজপত্র সরিয়ে রেখে সুদীর্ঘ মৌখিক ব্যাখ্যানগুলি ছিল নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে সরে যাবার মতন। অন্তত, আমার অনেকটা সে-রকমই মনে হয়েছিল। প্রায় মাস-আটেক আগের কথা। তাঁর বক্তব্য আমি যা বুঝেছিলাম তার স্মৃতি এইরকম :

উত্তর-আধুনিকতার যে শিক্ষায়তনিক চর্চা, তাঁর মতে, তা প্রকৃত ঐতিহাসিক সমাজ-চর্চা থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে রাখছে। টালিগঞ্জে স্তূপাকার জঞ্জালের একটি পেপার-কাটিং দেখিয়ে সংবাদপত্রের একটি রিপোর্ট পড়ে শোনালেন। জানা গেল, আসলে এখানে ছিল একটি মস্ত পুকুর। এটিকে সুইমিং-পুল করার জন্য মালিক পুরসভাকে দান করেন। কালক্রমে পুকুরটি বোজানো হয়েছে জঞ্জাল দিয়ে। এখন বহুতল আবাসন হবে। মালিক ভদ্রলোক শর্তভঙ্গের কারণে মামলা করেছেন।

বিদেশী পত্রিকায় হোমি ভাবার মতো (পরমাণু বিজ্ঞানী নন, বলাই বাহুল্য) প্রাতিষ্ঠানিক তাত্ত্বিক, মানসবাবু জানালেন, এটাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন পরিচ্ছন্ন প্রথম বিশ্বের বিরুদ্ধে নোংরা তৃতীয় দুনিয়ার অভিমানী প্রতিবাদ হিসেবে। অর্থাৎ, ঐ দুর্গন্ধমাদনকে। আর এটাই হয়ে দাঁড়াল এক মূল্যবান পোস্ট-মডার্নিস্ট গবেষণার বিষয়! আন্তর্জাতিক সেমিনার হল, বিস্তর আলোচনা ও পেপার বেরুল এসব নিয়ে। উনি ঐ হোমি ভাবার জঞ্জাল-তত্ত্ব থেকে বেশ কিছুটা পড়েও শোনালেন। সে কী দুর্জ্ঞেয় ভাষা রে বাবা! ব্রহ্মজ্ঞদের একদম ছোটভাই। দাঁত ফোটাবে কার সাধ্য। বিশেষত আমরা যারা সাব-অলটার্ন— আমাদের তো দুধে-দাঁত। পাশে বসা পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট বন্ধুকে অত্যন্ত অচেনা-অচেনা লাগল বা এই প্রথম শব্দই মনে হল যখন 'কিন্তু এইসব শব্দ— এদের কি ডিকশনারিতে পাব?'— জানতে চাওয়ায় ধ্যান-ভঙ্গের বিরক্তি থেকে তিনি জানালেন, 'চুপ করুন, এ-জন্যে আলাদা ডিকশনারি আছে!' বুঝলাম, এ কিছু অক্সফোর্ড কনসাইজের কর্ম নয়'— যা আমার আছে।

রাতের দিকে ছাদে বসেছিলাম সবাই। আকাশ নক্ষত্রখচিত। কিন্তু দূরে-কাছে মাদল-শব্দ নেই। বরং ক্ষেতে-খামারে কোথাও এত রাতে একটা জলের পাম্প চলছে। আকাশে এখন দৃশ্য বলতে একটি অন্ধকার জলের ট্যাঙ্ক।

মানসবাবুর কাছে জানতে চাইলাম, টালিগঞ্জের জঞ্জাল পড়ে থাকবে টালিগঞ্জে, আর তাই নিয়ে সাধনা চলবে উত্তর-আধুনিকতার তারাপীঠ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, গবেষণা করে যাবেন তৃতীয় দুনিয়ার প্রথম বিশ্বস্থ নাগরিক, ডক্টরেটও পাবেন, এতো ভারি মজার ব্যাপার! উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'ওঁরা হয়তো এ-রকম কৌতূহলকে উপেক্ষা করবেন ক্ল্যারিটি ফেটিশিজম বলে। ক্ল্যারিটি? ফেটিশিজম? এরও বঙ্গানুবাদ হয়। তবে সে বড় রকের ভাষা। আপাতত, ধরা যাক, মানে হল, ব্যাখ্যা-ক্যাংলা। সত্যিই তাই। আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বের অবমানব (সাব-অলটার্ন) আমাদের তো কোনও নিজের ভাষাই নেই। আমাদের ভাষা হল প্রভুর ভাষা, যা আমরা বলি। আর, 'আমাদের ভাষার' উৎস-সন্ধানেই তো এঁরা— এই হোমি ভাবা ও তাঁর সাহেব সতীর্থরা যা খুঁজে বের করছেন, শিকাগোর ইউনিভার্সিটিতে। আমাদের ভাষা যোগাতে প্রাণান্তিপাত করছেন। তাই আপাতত আমাদের ধৈর্য হারা যাবতীয় জিজ্ঞাসার পোস্ট-মডার্নিস্ট উত্তর একটাই: চোপ শালা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক মিহির চক্রবর্তী পঠিত ও বক্তব্য বিষয় ছিল: গণিত ও আকাশকুসুমতা। আকাশ? কুসুমতা? 'আপনাদের ভাষায় হয় না বুঝি?' স্মিতচক্ষু নাবিকের হাসি হেসে মিহির জানালেন, 'হয়-না, হতে-পারে-না এমন কনসেপ্ট কিন্তু গণিতে নেই। এখানে এগিয়ে যাবার পথ একটাই। যেখান দিয়ে যাব সেটাই পথ আর কী।' 'রাজপথও বলতে পারেন'— উনি আরও বললেন। সবাই সহাস্যে সমর্থন করেন ওঁকে। উনি প্রথমেই বলে নেন, আসলে আমি কোনও থিসিস পড়ছি না। গণিত আর বিমূর্ততা নিয়ে কতকগুলো সাবটাইটেল কী হতে

পারে, তাই আপনাদের জানাচ্ছি। উনি এক-একটি উপ-শিরোনাম জানিয়ে সে-সম্পর্কে খানিকটা করে বলেন। প্রকাশ কর্মকার মাঝে মাঝেই মন্তব্য করছিলেন, 'আরে, আমার ক্যানভাস নিয়েও তো একই সমস্যা।' সে এক অশ্রুতপূর্ব বক্তৃতা ছিল মিহিরবাবুর, সত্যিই। যাদুকর যেন, যন্ত্র তন্ত্র থেকে কত পাখি যে এসে বসছে তার সর্বাঙ্গে!

জীবনানন্দের একটি কবিতার কথা আমারও ধূসরভাবে মনে আসছিল তখন— যেখানে জাফরান-রঙা সূর্যের নরম শরীরে থাবা বুলিয়ে খেলা করছিল একটি বিড়াল। তারপর তার ভিতরের অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো লুফে আনছিল সে। সারা পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিচ্ছিল। মিহির যেন ঠিক তাই করছিলেন।

তিনদিনব্যাপী এই সেমিনারে অংশ নেন 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স'-এর প্রদীপ বসু। মূলত উত্তর আধুনিক বা উত্তর সংগঠনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজবিদ্যা, জাতীয়তাবাদ, চিত্রশিল্প, চলচ্চিত্রে বিমূর্ততাসহ নানান বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে প্রতিদিন। দিন গড়িয়ে যায় রাতে। নবীনানন্দ সেন, অনিরুদ্ধ লাহিড়ী, মনীসজ মজুমদার, শিবাজীপ্রতিম বসু, প্রকাশ কর্মকার, কালীকৃষ্ণ গুহ বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন। যতদূর মনে পড়ছে, শিবাজীপ্রতিমের অন্যতম বক্তব্য ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের গরীবরা অংশগ্রহণ করেনি। গরীবের বিমূর্ততাকে ঐ ইতিহাসে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। অনিরুদ্ধ শুরু করেছিলেন, 'বিমূর্ত ছবি থেকে অবজেক্ট নির্বাসিত।' এই বলে। বিমূর্ত শিল্পী বাঁধন দাস বললেন, বুদ্ধিজীবীরা যে-ভাবেই বলুন, আঁকতে গিয়ে বুঝি বিমূর্ততা থেকে বস্তুর মৃত্যু হয়নি। থিয়োরিটিক্যালি তারা আছে।

আবোল-তাবোল রাগিনীতে প্রকাশ কর্মকারের গলা-সাধা (বক্তব্য রাখা) সেদিন সুকুমার রায় পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। বিজন চৌধুরী দেখালেন, তিনি সশরীরে স্বয়ং এক সবাক বিমূর্ততা!

পরিশিষ্ট

শেষদিন বিভূতিভবনে অনেক রাত পর্যন্ত ভূতের গল্প। ফেরার পথে দেখলাম নির্জন পথ দিয়ে একটি গরুর গাড়ি এগিয়ে আসছে। গাড়োয়ান নেই। ভয়ই পেয়েছিলাম। গাড়িটি এগিয়ে যেতে দেখি, ছইয়ের মধ্যে লণ্ঠনের আলোয় গাড়োয়ান একজন শায়িতা নারীর দিকে ঝুঁকে কথা বলছে। পাশে শুয়ে ঘুমন্ত শিশু।

ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ তুলে গরুর গাড়িটি ফুলডুংরির দিকে এগিয়ে চলছে। দেখলাম, এত রাতে চন্দ্রাস্ত হচ্ছে পথ জুড়ে।

বাঁধন বলেছিল, সমস্ত বিমূর্ততার মধ্যেই বস্তু থেকে যায়। তাই, সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম চাঁদ তাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। □

“ঘাটশীলার কথা বলতে বড় বেশী নস্টালজিক হয়ে পড়ি। তুমি যাচ্ছো খুব ভাল। বিভূতিভূষণ আর ঘাটশীলা যেন আলাদা করা যায় না, এই ঘাটশীলার কথা কত শুনেছি রঘুদার কাছে। “বই এর মলাটে ছবি আঁকার আগে নদীটা এসে দেখে গেছো? ঠেকে শেখার প্রশ্নই ওঠেনা। সত্যি। রঘুদার আঁকা স্কুলের বেড়ানোর ছবি সব সময়ে ওঁর হাতে খোলেন দেখেছি।

"আমরা বিভূতিভূষণের বাড়ী গেলে সঙ্গে নিতাম মন্টিল ঘোরান গ্রামোফোন আর বেবি বক্স কেমেরা। উনি খোকাকে কোলে নিয়ে ছবি তুলতে ভালবাসতেন, তখন অত পয়সা কোথায় ... কখনো হতো ছবি তুলতাম, কর্মী সব এলম, কিন্তু একটা সুবিধে ছিল পাবে আর সে ছবি দেখতে চাইতেন না।" [illegible]

কোজাগোরি লক্ষ্মী পুজোর দিন খোলা আকাশের নিচে পূর্ণিমার আলোয় কোয়ার্টজাইট পাথরের বোল্ডার গুলো থেকে আলো ঠিকরে পড়ে। বিভূতিভূষণ এই চাঁদনি রাতে গ্রামোফোনে মুনলাইট সোনাটা শুনতে খুব ভালবাসতেন। সেই সব দিন গুলোর কথা মনে পড়ে, আর ভাবি আমাদের জীবন কত পদাতিক। কোথায় গেল সেই সব দিন,

"হাঁটছি তো হাঁটছি, জঙ্গলের রাস্তা ঘাট দিগ্বিদিক্‌যেন সব জানা, কত রকম নাম না জানা ফুল, আবার কোন কোন ফুলের নাম উনি দিয়ে ছিলেন। কিছু কিছু গাছে এমন ভাবে হয়ে আছে মনে হয় কেউ যত্নে লাগিয়ে রেখেছে, কোন কথা বার্তা নেই হাঁটতে হাঁটতে খিদে তেষ্টায় যখন প্রাণ যায় এমন কোন গাছতলায় ও পিসবাটার লাগান পাউরুটি"

কোথায় কোন ঝর্না, কোথায় কোন জলের ধারা, বড় গাছের তলায় পাথর, সবই ওঁর জানা ছিল একবার জঙ্গলের ভিতর একটা বড় পাথরের উপর বসে গান করে ছিলেন, মনে পড়ে সেই সঙ্গে একটি আদিবাসী মেয়েও গান করে ছিল, জঙ্গলে সেই মহুয়া ফুলের গন্ধ, আর একতারার সেই সুর, চারিপাশ জঙ্গলের নিস্তব্ধ, সব কোথায় গেল

জ্ঞানদীপ্তি কাকে বলে

ইমানুয়েল কান্ট

(১৭৮৪ সালের মাঝামাঝি, অর্থাৎ আজ থেকে দু-শ এগারো বছর আগে, এক জার্মান পত্রিকা পাঠকদের কাছে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে মতামত জানতে চায়। তেমন একটি বিষয় ছিল আউফক্লেয়ারুঙ বা জ্ঞানদীপ্তি বা 'এনলাইটেনমেণ্ট'। নভেম্বর মাসে, উক্ত প্রসঙ্গে, জনৈক পাঠকের এক চিঠি প্রকাশিত হয়।

পত্রলেখকের নাম ইমানুয়েল কাণ্ট।

কাণ্ট-এর বিপুল, প্রভাবশালী দর্শনতত্ত্বের পাশে এটি একটি সামান্য রচনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গত দুই শতাব্দী ধরে এই পাতা সাতেকের পত্র-প্রবন্ধ বহু বিতর্কে জলসিঞ্চনের কাজ করেছে। এর গূঢ় অর্থ, উচ্চারিত প্রশ্ন এবং তার দ্বিধাহীন উত্তর, তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগভিত্তিক সন্দেহ নিয়ে কাজ করেছেন হেগেল, নীট্‌শে, হেবার, হর্কহেইমার ও অ্যাডরনো। শেষোক্ত দু-জনের লিখিত 'ডায়ালেকটিক অফ এনলাইটেনমেণ্ট' বা জ্ঞানদীপ্তির দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। আমাদের সময়ে মিশেল ফুকো এবং য়ুরগেন হাবেরমাস-এর প্রভাবশালী তাত্ত্বিক বিতর্কের কথাও আমাদের এই সূত্রে মনে পড়ে।

কী আছে এই মারাত্মক রচনায় যা বস্তুত একটি খোলা চিঠি? এর মৌলিকত্ব কোথায়? কোথায় বা এর অন্তঃসলিল?

বস্তুত, এনলাইটেনমেণ্ট শব্দটি তৎকালে শিক্ষিত লোকদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা ছিল না। যে

জার্মান পত্রিকাটির উল্লেখ করেছি সেটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ পাঠকশ্রেণীর কাছে এক ধরনের আবছা ধারণাবাহী প্রসঙ্গ নিয়েই চিঠিপত্র ছাপাতে শুরু করে করে। কাণ্ট-এর এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার ছ-বছর আগে মারা যান ভলতেয়ার ('ন্যাচারাল রাইট্স'-এর প্রবক্তা) এবং রুশো ('সোস্যাল কনট্রাক্ট'-এর প্রবক্তা)। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার এবং সেই সরকারের সঙ্গে সমাজ ও ব্যক্তি-নাগরিকের সম্পর্ক কী হবে—এই ছিল এললাইটেনমেণ্ট যুগের প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়।

প্রসঙ্গত এটাও বলা দরকার, এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ বছর পর বাস্তিল আক্রান্ত হয় এবং তারও বছর তিনেক পর, অর্থাৎ ১৭৯২ সালে ফরাসীদেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এমন ভাবা ঠিক নয় যে এইসব বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্ম, বাকস্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি নিয়ে বিতর্ক নিম্ন মধ্যবিত্ত, স্বল্পশিক্ষিত ইয়োরোপীয় নাগরিকদের স্পর্শ করেনি। হিসেব আছে যে ঐ শতাব্দীর প্রথম দশকেই লণ্ডন শহরে তিন হাজারের বেশি কফিহাউস ছিল।

জ্ঞানদীপ্তির দু-টি প্রধান বক্তব্য প্রায় সকলেই তখন মেনে নিয়েছিলেন। প্রথমত, সব কাজে যুক্তির বা 'র‍্যাশনালিটি'-র অপরিহার্যতা চাই এবং দ্বিতীয়ত, মানবসমাজ কালক্রমে উন্নত হয়ে উঠছে অর্থাৎ ইতিহাস-পাঠে আমরা জানতে পারছি যে 'প্রোগ্রেস' ঘটছে। এই দু-টি সিদ্ধান্তের, শুধু সরলীকৃত চরিত্র নয়—মূল সূত্রগুলিও সন্দেহ উদ্রেক করে।

আশ্চর্যের কথা, আজও সর্বত্র আধুনিকতা, যুক্তিবাদ, বিমূর্তন-প্রক্রিয়া নিয়ে তর্ক উঠলে এই অনূদিত লেখাটির উল্লেখ হয়। কয়েকজন প্রভাবশালী আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ এমনও মনে করেন যে কাণ্ট-এর এই লেখার বক্তব্য সম্পূর্ণ বিমূর্ত। সেজন্য এর বিতর্কিত চরিত্র এবং প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে এটি বাংলায় অনুবাদ করা হল।

অনুবাদ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে রাখি। ক্যাথরিন পোর্টার-এর ইংরেজি থেকে লেখাটি অনুবাদ করা হয়েছে। কয়েক জায়গায় জার্মান-ভাষীর সাহায্য নিতে হল। তবু কিছু শব্দের অর্থ ও তাৎপর্যের মধ্যে ফারাক চোখে পড়ে। যেমন আউফক্লেয়ারুঙ শব্দটির আমরা অনুবাদ করেছি জ্ঞানদীপ্তি। ইংরেজিতে মানেটা দাঁড়ায় 'ক্লিয়ার আপ' বা বাংলায়, অবহিত করা, জানানো, কোনো বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ লোককে জ্ঞানদান করা। কাণ্ট অবশ্য, বিশদভাবে, এই রচনায় বলেছেন যে অপ্রাপ্তবয়স্ক, পরনির্ভরশীল অবস্থা থেকে মানুষ তখনই বেরিয়ে আসতে পারে যখন সে যুক্তিবাদী জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ করতে শেখে।

আবার এমন প্রশ্ন আপনারা তুলতে পারেন, কাণ্ট যে-আলোকপ্রাপ্তির কথা বলছেন তা কি একটি ঘটনামাত্র (ফেনোমেনন)? আপনা থেকেই ঘটবে? নাকি বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে এটি ঘটানো আমাদের দায় বা কর্তব্য?

নিশ্চয়ই আপনাদের মনে এ-প্রশ্ন জাগবে যে 'জনগণ' বলতে কাণ্ট কি আপামর জনসাধারণ বোঝাতে চাইছেন, যাকে আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি 'ম্যানকাইণ্ড'? নাকি এক বিশেষ রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত এক জাতির কথা বলা হচ্ছে? যেমন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাশান জাতি?

হয়তো আমাদের 'প্রাইভেট' এবং 'পাবলিক' শব্দদুটির ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে। 'প্রাইভেট' বলতে কাণ্ট বুঝেছেন সেই জগত যেখানে জীবিকা বা চাকরির জন্য, বিরুদ্ধ মত পোষণ করলেও, আমাদের কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনে কাজ করা উচিত। এবং সেইসঙ্গে, এক নিশ্বাসে তিনি বলছেন, বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে, অর্থাৎ 'পাবলিক' ক্ষেত্রে, লেখায় ও বক্তৃতায় আমার প্রতিটি সংশোধন চিন্তা বা বিরুদ্ধমত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই।

এইসব বৈপরীত্য, এদের প্রয়োগের সম্ভাবনা-বিচার, আমাদের চিন্তা ও কর্মের জগতের উপর তাদের প্রভাব—একালেও গভীর অনুশীলনের বিষয়।

*

আমি অনুবাদে পাঠের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। দীর্ঘ, যৌগিক বাক্যকে ভেঙে দুটি-তিনটি বাক্যে ছড়িয়ে দিয়েছি। তাছাড়া, বাংলা গদ্যের একটা অন্তর্নিহিত ছন্দ আছে যা

অগ্রাহ্য করলে যে-কোনো রচনা তার পাঠযোগ্যতা হারায়। আশা করি, মনীষীরা এই সামান্য অথচ প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাটুকু বাঙালি অনুবাদককে দিতে দ্বিধা করবেন না। খবরের কাগজে, পাঠককে উদ্দেশ্য করে, জগৎবরেণ্য দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট যে-চিঠি লিখেছিলেন, তা-ও ছিল সহজ ও সাবলীল বিন্যাসে রচিত একটি পত্র-প্রবন্ধ মাত্র।

অনুদিত লেখাটির উপর চোখ বুলিয়ে আমার এক স্থিতধী বন্ধু মন্তব্য করেন— আপনারাও কি শেষপর্যন্ত মৌলবাদী হয়ে উঠলেন নাকি? আমার ম্লান হাসি, তাঁকে যথেষ্ট আশ্বস্ত করেনি। আপনারা কী বলেন?)

স্বেচ্ছায় অপরের হাতে নিজের অভিভাবকত্ব তুলে-দেওয়া থেকে মুক্তির নাম জ্ঞানদীপ্তি (এনলাইটেনমেন্ট)। মানুষ যখন তার স্বীয় বিচারবুদ্ধিকে না খাটাতে চায় এবং অন্যের নির্দেশে চলে তখনই অন্যজন তার অভিভাবক হয়ে দাঁড়ায়। একে স্বেচ্ছাকৃত বলব এই জন্য যে যুক্তির কোনও অভাব বস্তুত মানুষের থাকে না। থাকে সাহস ও উদ্যমের অনটন। তার ফলে, অন্যের নির্দেশ ছাড়া সে অনড়। **সাপেরে অডে** ! Sapere aude[১] (ইংরেজিতে যার মানে দাঁড়ায় 'অডাসিটি টু নো'।) 'নিজের যুক্তিকে ব্যবহার করার মতো সাহসী হও' — এই জ্ঞানদীপ্তির মর্মবাণী।

প্রকৃতির নির্দেশে চালিত হওয়ার যুগ বহুকাল আগে শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আলস্য এবং ভয়ের কারণে আজীবন অপরের নির্দেশে চালিত হয়। সেজন্য অপর ব্যক্তিরা তাদের কর্তা হয়ে দাঁড়ায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকা কত সহজ। যদি কোনও গ্রন্থ আমার হয়ে বুঝে ফ্যালে, কোনও যাজক যদি আমার বিবেকের দায়িত্ব নেন, কোনও চিকিৎসক যদি আমার খাদ্যের বিধান নির্দিষ্ট করে দেন, তবে, এবং এরকম আরও অনেক কাজে, আমার নিজের মাথা-ঘামানোর কোনও প্রয়োজন থাকে না। কিছু টাকাকড়ি ধরে দিলেই অন্যেরা, আমার হয়ে, অনায়াসে এসব বিরক্তিকর কাজগুলি করে দেবে। আমার চিন্তাভাবনা করার কোনও প্রয়োজন থাকবে না।

আমাদের রক্ষকরা — যারা দয়াপরবশ হয়ে আমাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন— দেখেছেন যে বৃহত্তর জনসাধারণ [এবং সমগ্র নারীজাতি] মনে করে স্বনির্ভর (কর্মাপটেন্ট) হয়ে-ওঠার পথ কষ্টকর তো বটেই, এমনকি ঘোর বিপদসঙ্কুল।

ঐ রক্ষকরা তাদের গৃহপালিত পশুগুলিকে প্রথমত বোবা করেন এবং তারপর নিজেরা নিশ্চিন্ত হন এই ভেবে যে শান্ত পশুগুলির গলায় লাগাম না পরিয়ে দিলে তারা এক পা এগোনোর সাহস পাবে না। অতঃপর তাঁরা পশুগুলিকে একা একা চলাফেরা করার সম্ভাব্য বিপদ-আপদ দেখিয়ে দেন। বস্তুত, স্বচেষ্টায় চলমান হওয়ার বিপদ এমন কিছু বেশি নয়। কয়েকবার পড়ে যাওয়ার পর পশুগুলি শেষ পর্যন্ত নিজেরাই ঠিকঠাক হাঁটতে পারবে। কিন্তু ঐ অসমর্থতার উদাহরণ তাদের আতঙ্কিত করে এবং সাধারণত ভবিষ্যত সবরকম পরীক্ষা থেকে তাদের ভয়ে সরিয়ে রাখে।

---

১. 'জানার সাহস চাই' (হোরেস, আর্স পোয়েটিকা)। জার্মান এনলাইটেনমেন্ট সম্প্রদায়ের একটি শাখা, 'সোসাইটি ফর দ্য ফ্রেণ্ডস অফ ট্রুথ'' ১৭৩৬ সালে ঐ বাণীকে তাদের 'মটো' বা মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে।

যদি কোনও মানুষ আজীবন অপরের অভিভাবকত্বে চালিত হয় তবে সেটা প্রায় হয়ে দাঁড়ায় তাঁর স্বভাব (নেচার) এবং সেই জগৎ থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। ঐ অবস্থাকে সে যেন ভালবাসতে শুরু করে। সাময়িকভাবে সে সত্যিই নিজের যুক্তি ব্যবহারে অক্ষম কেননা কেউ তাকে চেষ্টা করে দেখতে দেয়নি। যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার বা অপব্যবহার করার জন্য যেসব আইন ও ফর্মুলা মানুষ স্বভাবগুণে তৈরি করেছে সেগুলিই হয়ে দাঁড়ায় তার চিরকালের শৃঙ্খল। যে সেই শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে সে একটি ছোট্ট ফাটল অনিশ্চিতভাবে লাফ দিয়ে পার হল কেননা এ-জাতীয় মুক্ত-চলনে সে অভ্যস্ত নয়। সুতরাং তেমন লোকের সংখ্যা কম যারা নিজেরাই মাথা-খাটিয়ে অসমর্থতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে এবং দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু জনসাধারণ যে নিজেরা জ্ঞানদীপ্ত হবে, তার সম্ভাবনাই বেশি। বস্তুত মানুষকে যদি কেবলমাত্র স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে জ্ঞানদীপ্তি নিশ্চয়ই হবে তার পরবর্তী ধাপ। সর্বকালে কিছু মুক্তচিন্তার মানুষ থাকেন, এমনকি যাঁরা সুবিশাল জনগণের প্রতিষ্ঠিত রক্ষক তাঁদের মধ্যেও, যাঁরা নিজেদের ঘাড় থেকে অপরের অভিভাবকত্বের জোয়াল নামিয়ে দেওয়ার পর, যুক্তিবাদী চিন্তার উদ্দীপনায় প্রতিটি মানুষের কাছে নিজেদের মূল্যায়ন করেছেন এবং সকলকে স্বাধীন চিন্তা করতে শিখিয়েছেন। কিন্তু এও মনে রাখা দরকার, যে-জনসাধারণ (পাবলিক)-এর, কাঁধে রক্ষকরা প্রথমত জোয়ালটি চাপিয়েছিলেন, তারা রক্ষকদেরও এক সম্পর্কদাড়িতে বেঁধে রাখে। কোনও কোনও রক্ষক, জ্ঞানদীপ্তি সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়ে উঠলেও, জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করে থাকেন এবং জনসাধারণ, পরে, তাঁদের বা তাঁদের বংশধরদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং জনগণ ধীরে ধীরে জ্ঞানদীপ্ত হয়ে ওঠে। দেখা যায় কোনও নিষ্ঠুর শাসকের স্বার্থ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে হয়তো মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে-মানুষের চিন্তার জগতে যথার্থ পরিবর্তন হয়নি। বরঞ্চ, নতুন কুসংস্কারের জোয়াল, পুরনোগুলির বদলে, সমান ওজনে বিপুলভাবে চিন্তাশক্তিরহিত জনগণের কাঁধে চেপে বসেছে।

এই জ্ঞানদীপ্তির জন্য কিছুরই প্রয়োজন নেই একমাত্র স্বাধীনতা ছাড়া। বস্তুত উদ্যম সঠিক হলে বোঝা যাবে এর চেয়ে নিরাপদ আর কিছু ব্যবহারযোগ্য নেই। স্বাধীনতা মানে জীবনের প্রতিটি নাগরিক (পাবলিক) ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত যুক্তি-ব্যবহারের অধিকার।[১] কিন্তু আমি চারিদিকে শুধু শুনতে পাই, 'তর্ক কোরো না।' অফিসার বলেন, 'তর্ক কোরো না, লাইনে দাঁড়াও।' খাজনা আদায়কারী বলেন, 'তর্ক কোরো না, খাজনা দাও।' যাজক বলেন, 'তর্ক কোরো না, বিশ্বাসী হও।' কিন্তু দুনিয়ায় এমনও এক রাজপুত্র আছেন যিনি বলেন, 'যত ইচ্ছে তর্ক করো, যা

১ স্বাধীনতার এই সংজ্ঞা নিয়ে তৎকালীন 'সেনসর' আপত্তি জানায়। তখন কান্ট 'প্রাইভেট' এবং 'পাবলিক' শব্দ দু-টির বিশদ ব্যাখ্যা দেন— যা এখানে আছে।

নিয়ে খুশি তর্ক করো, কিন্তু আজ্ঞাপালন করে চলো।' স্বাধীনতা সর্বত্রই শৃঙ্খলাবদ্ধ।

কোন্ বিধিনিষেধ জ্ঞানদীপ্তির পথে অন্তরায় এবং কোন্‌টি বাধা সৃষ্টি না করে বরঞ্চ সাহায্যকারী হয়ে ওঠে? আমি উত্তর দেব: ব্যক্তিগত (পাবলিক) ক্ষেত্রে আমাদের যুক্তিপ্রয়োগ সর্বদাই মুক্ত থাকা উচিত। শুধু এইটুকুই জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানদীপ্তি ছড়িয়ে দিতে পারে। অপরদিকে, স্ব-ক্ষেত্রে (প্রাইভেট) যুক্তির ব্যবহার হয়তো প্রায়ই সীমাবদ্ধ থেকে যেতে পারে এবং তা জ্ঞানদীপ্তির প্রসারকে খুব একটা ব্যাহত করবে না। ব্যক্তিগত (পাবলিক) ক্ষেত্রে স্বীয় যুক্তির ব্যবহার বলতে আমি সেই প্রয়োগের কথা বলছি যা পণ্ডিতরা তাঁদের পাঠকদের স্বার্থে করে থাকেন। স্ব-ক্ষেত্রে (প্রাইভেট) ব্যবহার বলতে আমি সেই যুক্তিপ্রয়োগের কথা বুঝি যা একজন সরকারি আমলা দায়িত্বপালনের জন্য করে থাকেন। জনস্বার্থে বহু কাজ সংঘটিত হয় যেগুলির পদ্ধতি অনেকটা যান্ত্রিক। কিছু কিছু ব্যক্তিকে সেসব কাজ, নিজেদের মধ্যে বিতর্ক না তুলে, শান্তভাবে করে যেতে হয়। এবংবিধ কাজ সরকার জনস্বার্থে করে থাকে এবং ঐ ব্যক্তিরা, কিছু না হোক, সরকারি উদ্দেশ্যসাধনে বাধা সৃষ্টি করে না। এক্ষেত্রে তর্কের কোনও স্থান নেই— নির্দেশপালনই করে যেতে হবে। কিন্তু ব্যক্তি-নাগরিক একই সঙ্গে উক্ত যান্ত্রিক পদ্ধতির অঙ্গ হতে পারে এবং অপরদিকে যখন সে জনসাধারণের (বা বৃহত্তর মানবজাতির) একজন তখন তার ভূমিকা হয় এক প্রবক্তার যে জনগণকে সম্বোধন ক'রে, যথার্থভাবে, তার লেখার মধ্যে দিয়ে কিছু বলছে। সাধারণ মানুষ হিসেবে সে যা-বলছে, কর্মক্ষেত্রে তার নীরবে-পালনীয়-কর্তব্যে সে-বক্তব্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে না। যেমন, কোনও অফিসার যদি উপরওয়ালার নির্দেশের উপযুক্ততা বা ব্যবহারযোগ্যতা নিয়ে তর্ক শুরু করেন তবে তাঁর সমূহ ক্ষতি হবে। তাঁর কাজ নির্দেশপালন করা। কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রাহ্য করা উচিত তাঁর চিন্তাশীল ব্যক্তি (স্কলার) হিসেবে মিলিটারী সার্ভিসের ভুলভ্রান্তিত্রুটি জনসাধারণের কাছে বিচারের জন্য পেশ করার অধিকারকে। নাগরিক সরকারকে খাজনা দিতে বাধ্য; বস্তুত খাজনার পরিমাণ নিয়ে তার বিক্ষোভ— অবমাননা (স্ক্যান্ডাল) হিসেবে শাস্তিযোগ্য হতে পারে (কারণ এর ফলে সাধারণভাবে অসন্তোষ দেখা দেওয়া সম্ভব)। কিন্তু সেই ব্যক্তিই নাগরিক হিসেবে অকর্তব্য করছেন না যখন তিনি পণ্ডিত (স্কলার) মানুষের মতো, প্রকাশ্যে, খাজনার পরিমাণ বা অসার্থকতা বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করছেন। সেরকমই ধর্মযাজক গীর্জায় তাঁর শিষ্যদের কাছে ধর্মমহিমা এবং ধর্ম-সমাবেশে গীর্জার প্রতি আনুগত্য প্রচার করতে বাধ্য কারণ তিনি ঐ শর্ত মেনে নিয়েই কাজে নেমেছেন। কিন্তু পণ্ডিত হিসেবে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, এমনকি দায়িত্বও আছে জনসাধারণের কাছে গীর্জার ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাশীল মতামত এবং সুষ্ঠু ধর্মপ্রচার ও ধর্মরক্ষার জন্য নিজস্ব সংশোধনী প্রস্তাব তুলে ধরার। এই কাজ তাঁর বিবেককে পীড়িত করবে না। গীর্জার একজন পদাধিকারী এবং কর্মী হিসেবে তিনি যা শেখাচ্ছেন সেখানে

নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্থান নেই, তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে অপর একজনের কথায় এবং নামে। তিনি বলবেন, 'আমাদের চার্চ নানাবিধ শিক্ষা দেয় ; ঐ তার সাক্ষ্যপ্রমাণ।' এইভাবে যাজক উপাসকমণ্ডলীর কাছে ধর্মনির্ধারিত ঘোষণাবলী পেশ করতে পারেন যদিও সেগুলিতে তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা না-থাকা সম্ভব। হয়তো ঐসব বাণীতে সত্য লুকানো থাকতেও পারে। যাই হোক না কেন, ঐ বাণীর সঙ্গে তাঁর অন্তরের বিশ্বাসের কোনও বিবাদ নেই। কারণ, তিনি যদি মনে করেন যে তেমন কোনও মৌলিক বিরোধ সত্যি সত্যি রয়েছে তবে তাঁর বিবেক তাকে বাধা দেবে ও তাঁকে কাজটা শেষ-পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হতে পারে। সুতরাং যাজক যখন উপাসকমণ্ডলীর সামনে ভাষণ দেন তখন তিনি যে-যুক্তিসমূহ ব্যবহার করেন তা নিতান্তই ব্যক্তিগত (প্রাইভেট) কারণ এই উপাসকমণ্ডলীর সমাবেশ একটি ঘরোয়া ব্যাপার (সংখ্যায় যত বড় হোক না কেন) ; এই উপাসকমণ্ডলীর সঙ্গে যাজকের সম্পর্ক স্বাধীন নয় এবং সে-সম্পর্ক স্বাধীন হতেও পারে না, কারণ যাজক আজ্ঞাবহ। কিন্তু পণ্ডিত (স্কলার) হিসেবে, যাঁর রচনাবলী জনসাধারণ তথা জগতকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয়, তিনি এক অখণ্ড স্বাধীনতার অধিকারী। তখন তিনি জনসমক্ষে নিজস্ব যুক্তি ব্যবহার করছেন এবং ব্যক্তি-মানুষ হিসেবেই নিজের বক্তব্য উপস্থিত করছেন। ধর্মমণ্ডলে যিনি শিষ্য-প্রশিষ্যের অভিভাবক তিনি নিজে এমন একটি কাজে অক্ষম এ এক অসম্ভব কথা এবং এর হাস্যকরতা সীমাহীন।

কিন্তু এমন কি ঘটতে পারে না যে এক শ্রেণীর যাজকদল, হয়তো কোনও ধর্মমণ্ডলী বা অতিসম্মানিত কোনও গুরুসমাবেশ [ডাচ্ জাতিতে যারা নিজেদের 'ক্লাসিস্' বলে পরিচয় দেন] নিজেরাই এক অপরিবর্তনীয় প্রতীকের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন যাতে প্রতিটি শিষ্যর উপর তাঁদের অখণ্ড অভিভাবকত্ব জন্মায় এবং ঐ সূত্রে অনন্ত কাল ধরে একটি জাতির উপরও ? আমার উত্তর হল, তা মোটেই সম্ভব নয়। ঐ জাতীয় কোনও বোঝাপড়া, যা একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বৃহত্তর মানবজাতির জ্ঞানদীপ্তি থেকে বঞ্চিত করবে, সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে-চুক্তি সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা সংসদ দ্বারা বা তুমুল ঢাকঢোল-বাজানো শান্তিপ্রস্তাবে সমর্থিত হয়ে থাকলেও। বিশেষ একটি যুগ, তার পরবর্তী সময়কে এমন কোনও শর্তে বাঁধতে পারে না বা তার ভাগ্য এমনভাবে নির্ধারিত করে দিতে পারে না যে নবাগত যুগ তার নিজের জ্ঞানক্ষেত্র (যত সামান্যই হোক না কেন) বাড়াতে পারবে না, নিজের কালের ভুলত্রুটি সংশোধন করতে পারবে না বা সার্মগ্রিক ভাবে জ্ঞানদীপ্তির পথে এগিয়ে যেতে পারবে না। তার এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করলে মানবপ্রকৃতির প্রতি অপরাধ করা হবে কারণ মানুষের এই আগুয়ান হওয়ার ভিতরই নিহিত আছে তার যথার্থ ভবিষ্যত। আগামীকালের প্রজন্ম যদি ভাবে যে পূর্বপুরুষদের নির্ধারিত অনুশাসনগুলি অপ্রয়োজনীয় এবং অসাধু উদ্দেশ্য সৃষ্ট হয়েছিল এবং সেগুলিকে বর্জন করা উচিত তবে তাদের সে-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত।

যা কিছু শেষপর্যন্ত জনগণের জন্য আইন বলে স্বীকৃত হবে তার মূল্যায়নের কষ্টিপাথর হল এই প্রশ্ন : জনগণ কি চায় সেই আইন তাদের উপর বলবৎ হোক ? এখন, ধর্মের ক্ষেত্রে, একটি সংক্ষিপ্ত এবং স্বল্পমেয়াদী চুক্তি তৈরি করা সম্ভব এই ভেবে যে ভবিষ্যতে এর মধ্যে দিয়ে আরও ভালো কিছু করা যাবে। প্রতিটি নাগরিককে, বিশেষত যাজকদের যাঁরা পণ্ডিতের (স্কলার) ভূমিকায় নেমেছেন তাঁদের, এমন স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব যে তাঁরা মুক্তভাবে জনসমক্ষে লেখা এবং বলায়, বর্তমান প্রতিষ্ঠানের দোষত্রুটির সমালোচনা করবেন। নবগঠিত শৃঙ্খলা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন না ঘটনাবলীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষণ সাধারণের স্তরে নেমে আসে এবং এতটা জনগ্রাহ্য হয় যে (মতবিভেদ সত্ত্বেও) **সম্মিলিত** কণ্ঠস্বর রাজসভায় দাবি জানাবে— যাঁরা ধর্মপ্রতিষ্ঠানে নতুন এবং উন্নততর চিন্তাভাবনার সঞ্চার করেছেন তাঁদের, যাঁরা রক্ষণশীল তাঁদের অসুবিধের সৃষ্টি না করে, আশ্রয় দেওয়া হোক। শুদ্ধু এক প্রজন্মের জন্যও এমন একটি চিরস্থায়ী যৌথ ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত যে-প্রতিষ্ঠান সকল সন্দেহের ঊর্ধে। যদি তা না হয় তবে মানবজাতির উন্নতির পথে সময় অপব্যয় হবে এবং আগামী প্রজন্মের ক্ষতি হবে। নিজের ক্ষেত্রে (কেবল স্বল্প সময়ের জন্য) কোনও ব্যক্তি জ্ঞানদীপ্তিকে সরিয়ে রাখতে পারে ; কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা, এবং আরও বিস্তৃতভাবে, পরবর্তী বংশধরদের জন্য তাকে সম্পূর্ণ নির্বাপিত করে দেওয়া, হবে মানবাধিকারের উপর আঘাত এবং পদদলন।

জনসাধারণ নিজেদের জন্য যে-আইন চায় না, রাজার পক্ষেও তাদের জন্য তেমন আইন প্রণয়ন অসম্ভব কারণ তাঁর আইনপ্রণয়নকারী অধিকার দাঁড়িয়ে আছে জনসমষ্টির সঙ্গে তাঁর নিজের ইচ্ছার মিলনে। রাজা যদি দেখেন যে যথার্থ উন্নয়ন এবং তথাকথিত প্রাগ্রসরতা নাগরিক শৃঙ্খলার সঙ্গে একত্র হয়েছে তবে জনসাধারণ তাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে যা মন চায় করুক। এ-নিয়ে তাঁর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। যদিও তাঁকে যতটা সম্ভব নজর রাখতে হবে যে একে অপরের ধর্মচর্চা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপর যেন জুলুম না করে। এসব ঘটনায় নাক গলালে রাজার সম্মানহানি হয় কারণ জনসাধারণের লিখিত আবেদন থেকেই তিনি নিজের শাসনকর্মের মূল্যায়ন করে নিতে পারেন। তিনি তখনই হস্তক্ষেপ করবেন যখন সমস্যাটা তিনি স্বয়ং গভীরভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং জানেন 'সীজারও বৈয়াকরণিকদের ঊর্ধে নন।'[১] তার পরই তিনি স্থির করবেন যে এবার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তার চেয়েও বড় কথা রাজা যদি নিজের রাজ্যে প্রজার উপর কিছু ধর্মীয় উৎপীড়কের অত্যাচারকে সমর্থন করেন তবে তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হবে।

আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, 'আমরা কি এখন এক **জ্ঞানদীপ্ত যুগে** বাস করছি ? তার

১. কথিত আছে 'ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট' ভলতেয়ারের এক বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই উক্তি করেছিলেন। কিন্তু তার আগে, ১৯১৪ সালে, অনুরূপ মনোভাব সম্রাট সিজিসমুন্দো প্রকাশ করেছিলেন কাউনসিল অফ কনস্টানস-এ।

উত্তর হবে, 'না'। কিন্তু আমরা এখন যে যুগে রয়েছি তা **জ্ঞানদীপ্তির যুগ**[১]। চারদিকে আজ যা ঘটছে তাতে বোঝা যায়, ধর্মীয় স্তরে মানুষের নিজস্ব এবং বাইরে থেকে নির্ধারিত নয় এমন বিচারবুদ্ধি সঠিকভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি আছে বা সহজেই সৃষ্ট হচ্ছে। অপরদিকে, আমরা পরিষ্কার লক্ষ করছি এমন একটি ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে এসব চিন্তা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে। সাধারণ জ্ঞানদীপ্তির পথের বাধা ক্রমে অপসারিত হচ্ছে এবং মানুষ স্বেচ্ছায় অপরের হাতে নিজের অভিভাবকত্ব তুলে-দেবার প্রবণতা থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হচ্ছে। সেই অর্থে এটি জ্ঞানদীপ্তির যুগ, ফ্রেডরিক-এর শতাব্দী।

যে-রাজপুত্র মনে করতে কুণ্ঠিত হন না যে ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর প্রজাদের কিছু বলার নেই এবং সে-বিষয়ে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন— তিনি এই মনোভাবকে 'সহনশীলতা'র মতো ভারিক্কি উপাধি দেননি। তিনি স্বয়ং আলোকপ্রাপ্ত। এখনকার লোকজনদের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন এইজন্য যে তিনিই প্রথম, অন্তত প্রশাসনিক ভাবে, জনসমষ্টিকে অপরের অভিভাবকত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন এবং প্রতিটি মানুষ, বিবেকের ক্ষেত্রে, স্বীয় যুক্তি খাটানোর স্বাধীনতা পেয়েছে। তাঁর সামনে, মাননীয় যাজকদল নিজেদের কর্তব্যকর্ম পালন করায় কোনও ত্রুটি না রেখে, পণ্ডিতদের মতো জনসমষ্টির কাছে তাঁদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি— যেগুলি কখনও কখনও প্রচলিত ধ্যানধারণার ব্যতিক্রম— পরীক্ষার জন্য উপস্থিত করেছেন। যাঁরা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত তাঁরা তো আরও স্বাধীনতা উপভোগ করেছেন। এই স্বাধীনতার উদ্দীপনা দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি অনেক স্থানে পৌঁছেছে যেখানে স্বাধীনতার সঙ্গে এমন সব প্রতিবন্ধকতার লড়াই চলছে যে-বাধাগুলি তাদের দেশের সরকার, নিজেদের স্বার্থ না বুঝেই তৈরি করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সরকার অকারণে ভাবতে পারে যে, স্বাধীনতা দেশের জনগণের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করবে। মানুষ, ক্রমে ক্রমে, তখনই, বর্বর যুগ অতিক্রম করতে পারে যখন তার সামনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বাধার সৃষ্টি না করা হয়।

আমি জ্ঞানদীপ্তির মূল সূত্রটি পেশ করলাম— মানুষের স্বেচ্ছানির্বাচিত পরনির্ভরতা থেকে মুক্তি— এবং এটি কার্যকর প্রধানত ধর্মীয় ক্ষেত্রে কারণ দেশশাসকদের শিল্প বা বিজ্ঞানের জগতে অভিভাবকের ভূমিকায় নামার কোনও উৎসাহ নেই। অধিকন্তু, অযোগ্যের হাতে ধর্মাধিকার শুধু যে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক তাই নয়— এটি চরম অবমাননাকরও বটে। কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানদীপ্তির প্রতি দেশশাসকের অনুকূল মনোভাবের প্রতিক্রিয়া আরও সুদূরপ্রসারী। তিনি লক্ষ করেন যে প্রজারা যদি সর্বসমক্ষে তাদের যুক্তিবিচার ব্যবহার করে এবং তাদের চিন্তাভাবনা লিখিতভাবে প্রকাশ করে তবে আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের কোনও ভয় নেই। বরঞ্চ বর্তমানকালের আইনকানুনের মুক্ত সমালোচনা হলেই ভবিষ্যতে আইনপ্রণয়নের মান আরও উন্নত হবে। জ্ঞানদীপ্ত

১. 'আমাদের যুগ, বিশেষভাবে, সমালোচনার যুগ (এজ অফ ক্রিটিসিজম) এবং সমস্ত কিছু সমালোচনার মুখাপেক্ষী'—'ক্রিটিক অফ পিওর রীজন'-এর ভূমিকা থেকে।

শাসকের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে আমাদের মাননীয় সম্রাটের চেয়ে এ-বিষয়ে আর কেউ উজ্জ্বলতর নন।

যিনি স্বয়ং জ্ঞানদীপ্ত তিনি আর ছায়াকে ভয় পান না। দেশে শান্তিরক্ষার জন্য তাঁর অগণ্য দক্ষ সৈন্য রয়েছে। তিনি বলতে পারেন, 'যত ইচ্ছে তর্ক করো, যে বিষয় নিয়ে ইচ্ছে তর্ক করো, কেবল আদেশপালন করো।' কোনও প্রজাতন্ত্র এ-কথা বলার সাহস পাবে না। এখানে দেখা যাচ্ছে মানবসমাজের ঘটন-অঘটনে এক অভাবনীয় ও বিস্ময়কর প্রবণতা যার ফলে, বিস্তৃতভাবে, সবকিছুই ধাঁধা বলে ঠেকবে। মনে হয় দেশবাসীর মানসিক মুক্তির পথে সাহায্যকারী বুঝি অধিকতর নাগরিক স্বাধীনতা। অথচ এর ফলে আরোপিত হয় অপরিহার্য সীমাবদ্ধতা ; কিছুটা কম নাগরিক স্বাধীনতা, অপরদিকে, মানবমনকে পূর্ণ বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়। প্রকৃতি যেমন শক্ত আবরণের ভিতর বীজকে সযত্নে পালন করে এবং পরে তাকে উন্মুক্ত করে, তেমনই স্বাধীন চিন্তা করার প্রবণতা ও আসক্তি ক্রমে জনগণের চরিত্রের উপর প্রভাব ছড়ায় এবং জনগণ স্বাধীনতার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত, এর ফলে সরকারি নীতিসমূহও প্রভাবান্বিত হয়। সরকার ক্রমে বুঝতে পারে যে মানুষ যন্ত্রের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু এবং সরকারি স্বার্থেই, নাগরিকদের সঙ্গে, তাদের যোগ্য মর্যাদা দিয়ে ব্যবহার করা, অধিকতর সুবিধাজনক।[১] □

অনুবাদক : উৎপলকুমার বসু

□ সংযোজন : একটি চিঠি □

হিশবার্গ
১৮. ৫. ৯৫

প্রিয় উৎপল,

এর চেয়ে আরো বিস্ময়কর সমাপতন আর কী হতে পারে : আপনারা যখন ঘাটশীলায় সম্মেলন করছিলেন, আমরাও এখানে, গ্রোস-সাক্সেনে, ইমানুয়েল কান্টের 'এনলাই-টেনমেন্ট কী : এই প্রশ্নের উত্তর' (Beantwortung der Frage : was ist Aufklärung ? / ১৭৮৩) নিয়ে পাঠচক্রে মেতে ছিলাম। আপনাদের মত অত ঋদ্ধ অ্যাকাডেমিক হয়তো ছিল না এই অনুষ্ঠান। অভিশ্রুতি বাদ দিলে 'aufklaren' শব্দটির প্রাথমিক একটি অভিধা — আকাশ পরিষ্কার হয়ে-আসা — মনে রেখে শুরুতেই 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' গানটি গাওয়া হয়। অতঃপর কান্টের পুরো কথিকাটি কোলাজের ছাঁচে অভিনয় করা গেল। বিশেষত তৃণমূল আন্দোলনের ছেলেমেয়েরা ও সবুজ-

১. আলোচ্য প্রশ্নটির মেণ্ডেলস্সোন প্রদত্ত উত্তর আজই আমি তেরই সেপ্টেম্বরের 'বুশিঙস্‌চে ভোখেনট্‌লিশে নাথরিথটেন'-এর 'বেরলিনিশে মোনাটস্ক্রিফট' প্রতিবেদনে পড়লাম। মূল লেখাটি আমার হাতে পৌঁছায়নি। যদি আগে জানতাম, তবে এই প্রবন্ধটি হয়তো প্রকাশ করতাম না। এখন করছি শুধু দেখার জন্য যে কতখানি মতের মিল দৈবক্রমে ঘটতে পারে। [মেণ্ডেলস্সোন-এর উত্তর ছিল এই যে বুদ্ধি (বা ইনটেলেক্ট)-এর পরিচর্যায় জ্ঞানদীপ্তি প্রকাশ পায় যা বাস্তব জগত থেকে আলাদা। কান্ট, তাঁর পরবর্তী তত্ত্ব ও ব্যবহার-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মতোই, এখানেও এই প্রভেদকে মৌলিক পার্থক্য বলে স্বীকৃতি দিতে নারাজ।]

পন্থীরা ঐ নাটকে অংশ নিয়েছিল। কান্টের বয়ানের মধ্যে যেখানেই উপরওয়ালা বা অবিবেকী অভিভাবকদের প্রস্তর উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, সে সব অংশ ঈষৎ বিনিয়ে, সময়োচিত কিছু প্রক্ষেপ থাকায়, পরিবেশিত হবার পর, আলোচনাচক্রে যে অপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল তার তুলনা নেই।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, ইয়োরোপেও, এই মুহূর্তে সমাজের মানুষকে অপ্রাপ্তবয়স্ক করে রেখে দেবার ঊর্ধ্বতন যে-প্রবর্তনা লক্ষ করা যাচ্ছে তার প্রেক্ষিতে কান্টের এই সন্দর্ভ ভগবদ্‌গীতার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্ববহ বলে মনে হয়। মৌলবাদের বিরুদ্ধে 'তোমার নিজের কাণ্ডজ্ঞানের পরিচর্যার সাহস পোষণ করো!' এইটেই হলো এনলাইটেনমেন্টের নির্বাচনী মন্ত্র।' এরকম উচ্চারণ এখুনি তো শ্লোগান হওয়া উচিত। অথবা 'খরচপত্তর করতে পারলে আমার আদৌ ভাবনাচিন্তার দরকার পড়ে না; অন্যেরাই আমার হয়ে ঐ বিষয় ব্যাপার সামলে দেবে', এই নির্ধারণের প্রযুক্ত নমুনা আমরা কি পথেঘাটেই অধুনা প্রত্যক্ষ করছি না? কি-পার্টির চাঁদার খাতা কি-গুরুবাদের পোষকতায় মনোহীন নাবালকত্বের পরিকল্পিত প্রযোজনা আমাদের স্বকীয় প্রতীতির সাহস (Zivilcourage) একরকম পরিলুপ্ত করে দিতে চলেছে।

কাইজারদের দিন কবেই চুকেবুকে গেছে। তবু কোন্ ফাঁকে উঠে এসেছে, কান্টেরই ভাষায়, 'কিছু যথেচ্ছাচারীর বুদ্ধিমত্তাপ্রসূত সার্বভৌমতা'র উপসর্গ। 'ব্যাকরণবেত্তাদের উপরে তো স্বয়ং কাইজারও নন' (Caesar non est supre grammaticos), কান্টের এই সাবধানবাণী তা সত্ত্বেও কেন আমরা এখনো সহজ সুরে আবৃত্তি করতে পারছি না? অথবা ধনতন্ত্রের সহযোগী পরিকল্পিত যন্ত্রায়নের দুলাল কম্পিউটারের দৌলতে যখন 'think small' (বাংলাটা কী করব উৎপল? অল্প ভাবো, না নিম্নস্তরে ভাবতে শেখো?) বিজ্ঞাপনের মুখরোচক বুলি হয়ে উঠেছে, কান্টপ্রেরিত যন্ত্রাতিশায়ী মানুষের প্রতি শাসকসংস্থার সসম্মান আচরণের প্রত্যাশা মন থেকে মুছে ফেলব?

সবচেয়ে বেশি মুশ্‌কিল বোধহয় আমাদেরই এখন, যারা শিল্পসাহিত্য নিয়ে কখনো-সখনো মাথা ঘামিয়ে থাকি। প্রায়শই আমরা ধরে নিই, নান্দনিকের এলাকায় ভাবের ঘরে চুরি করার মস্ত অবকাশ রয়ে গেছে। আমরা ভুলে যাই নন্দনতত্ত্বের মাধ্যাকর্ষ তথাকথিত সুন্দর নয়, সংবেদন। জানতে চাই না বোধশক্তি অসাড় করে দেওয়া অ্যানীস্থীসিয়া-র ঠিক অন্য মেরুর ঘটনা নন্দনবিবেক। এনলাইটেনমেন্টের অভিঘাতে বাউমগার্টেনের শিল্পশাস্ত্র তারি ফসল। সংগীতে বাখ্ থেকে মোৎসার্ট পর্যন্ত একই চৈতন্যের সম্পাত। ফরাসি সাহিত্যে সাহসিকতার উদ্বোধন ও সমীপবর্তী সংঘটন। আমরা আজ যারা ছবি আঁকছি বা কবিতা লিখছি তাদের কাছে ঐ আলোকপুঞ্জের উত্তরাধিকার শুধু অস্পষ্টই নয়, কেমন যেন হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে। আমরা যান্ত্রিক অনুশীলন ও বিধিবদ্ধ অভ্যাসের ক্রীতদাস্যে অগাধ স্বস্তির সামিল হয়েছি এখন। কান্ট তাঁর এই রচনায় কি আমাদেরই প্রফুল্ল নির্বেদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান নি?

অলোকরঞ্জন

[বর্তমান সংখ্যার প্রস্তুতি চলাকালীন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত উৎপলকুমার বসুকে চিঠিটি লেখেন। —যোগসূত্র]

বিমূর্তায়নের প্রক্রিয়া : জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ

শিবাজীপ্রতিম বসু

সূত্রপাত

'বিমূর্ততা' বা 'বিমূর্তায়ন'— কথাগুলো যতই গম্ভীর-দার্শনিক শোনাক এবং তার মধ্যে গ্রীক, জার্মান, বা ভারতীয় ভাববাদের যত অনুষঙ্গই থাকুক না কেন— আমাদের আটপৌরে জীবনের সর্বস্তরে চলেছে তার নিরন্তর ব্যবহার। একটু অন্যভাবে বলা যায় বিমূর্তায়নের হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই।

(ক) আদিম যুগ থেকে সভ্যতার যত বিবর্তন ঘটছে, ততই মানুষ এগিয়ে চলেছে নূতনতর এবং জটিলতর বিমূর্তায়নের দিকে। দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি— সর্বত্র চলেছে এই প্রক্রিয়া— যা কিছু নির্দিষ্ট/বিশেষ তাকে ক্রমশ গ্রাস করছে নির্বিশেষ বা বিমূর্ত।

(খ) সব ধরনের বিমূর্ততাই ক্রমোচ্চগামী। অর্থাৎ যত ক্ষুদ্র পরিসরের বিমূর্ততাই হোক তার প্রবণতা থাকে— যাকে 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা'-ও বলা যায়— ক্রমশ সার্বজনীন (universal) হয়ে ওঠার এবং একটা 'grand narrative' রচনা করার। যেমন,

সন্তানের প্রতি মায়ের যে স্নেহ-উৎকণ্ঠা-ত্যাগ স্বীকার তার সাধারণ পরিচয় মেলে 'মাতৃত্ব' ধারণাটিতে। কিন্তু ক্রমে 'মাতা' হয়ে ওঠেন 'দেশমাতা'/'বিশ্বমাতা'/'ঈশ্বরী-মাতা'। তখন মাতৃত্বের অর্থ ও ক্ষেত্রও ব্যাপক হয়ে পড়ে এবং শেষ অবধি তা এমন এক জগজ্জনীন মাতৃত্বের ধারণায় পৌঁছায়, যা জগতের সৃষ্টি-ধ্বংস-সারাৎসারের একক নিয়ন্তা। তাকে উপলব্ধি করতে হলে অনুসরণ করতে হবে 'মাতৃতন্ত্র'-এর পথ। তেমনি, পিতা/পিতৃত্ব থেকে 'জগৎপিতা' বা 'পরমপিতা', 'পুরুষ' থেকে জন্ম নিয়েছেন 'পরমপুরুষ'।

(গ) বিমূর্ত ধারণা কখনোই 'প্রকৃত বাস্তব' (real concrete) নয়। তবু সামাজিক ক্ষেত্রে, আমরা কখনোই তাকে 'ভ্রান্ত চেতনা' (false consciousness) বলে নস্যাৎ করতে পারি না। সমাজমানসে, আচরণে তারও রয়েছে একটি গাঠনিক অস্তিত্ব। অথচ তার গঠন প্রকৃত বস্তু জগতের গঠনের চেয়ে ভিন্নরূপ। কথাটি নানা কারণে ভেবে দেখা দরকার। ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি বহু যুক্তিবাদী (মার্ক্সবাদী ?) অথবা বুদ্ধিজীবী আন্দোলনকারীরা সমাজের বহু কুসংস্কারাচ্ছন্ন, প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মীয়, মৌলবাদী এমনকি জাতীয়তাবাদী ধারণা বা বিশ্বাসকে 'ভ্রান্ত চেতনা' বলে উড়িয়ে দিতে চান। ফলে উপেক্ষিত থাকে ঐসব ধারণা ও বিশ্বাসের গাঠনিক দিকগুলি নিয়ে সমীক্ষা, আলোচনা ও উপলব্ধি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু অগভীর সমালোচনা করে তাঁরা কর্তব্য সমাধা করেন। সমস্যাগুলির মর্মভেদ করা হয় না— মোকাবিলা তো নয়ই।

(ঘ) বিমূর্ততা যেমন মূর্তকে বা নির্দিষ্টকে ক্রমশ গ্রাস করে বিমূর্ততার এক বিশ্বব্যবস্থা (একদিক থেকে দেখলে যা metaphysics) কায়েম করতে চাইছে, তেমনি মূর্ত বা নির্দিষ্ট, ক্ষুদ্রও (সাম্প্রতিক তত্ত্বচর্চা অনুসরণ করে যাকে আমরা 'fragments'-ও বলতে পারি) সংগ্রাম করে চলেছে বিমূর্তব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কখনো নিচু গলায়, কখনো সোচ্চারে তারা নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

আধুনিক সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের অতি পরিচিত বিমূর্ত বর্গীকরণ : জাতি (nation), জাতীয়তা (nationality) ও জাতীয়তাবাদ (nationalism) সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় ঐ কথাগুলো মনে রাখার প্রয়োজন আছে।

॥ এক ॥

আজকের দিনে 'জাতি' বা 'জাতীয়তা' কথাগুলোর গুরুত্ব ও ব্যঞ্জনা যে কতখানি— তা কারো অজানা নয়। বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা অন্যতম নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত এই দশকে, যখন সমাজতন্ত্রের 'আন্তর্জাতিক' আকাশ খান খান হয়ে জেগে উঠেছে প্রাচীন/অর্বাচীন, বিস্মৃত/নবলব্ধ জাতিসত্তার অসংখ্য স্বতন্ত্র নভোমণ্ডল, আবার রাষ্ট্রীয় বিচ্ছেদের 'প্রাচীর' ভেঙে 'খণ্ডিত' জাতিসত্তা হয়ে উঠেছে 'অখণ্ড'।

কেবল রাজনীতির আঙিনায় নয়, ব্যক্তিগত জীবনের নানা পর্যায়ে : পরীক্ষা ও কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে বিদেশগমনের স্তরে, মায় ভোটদান এমনকি ঋণপ্রাপ্তি পর্যন্ত—

সর্বক্ষেত্রেই কবুল করতে হবে আমাদের জাতীয় 'পরিচয়' (identity) বা জাতীয়তার কথা। এ যেন কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতোই আমাদের চিরজন্মের সাথী হয়ে রইল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই জাতীয় পরিচয় আমাদের বংশগত পদবীর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। আসলে 'জাতীয়তা' হল একটা গোষ্ঠী পরিচয়— যে গোষ্ঠীর নাম বলা বাহুল্য, 'জাতি'। ঐ গোষ্ঠী, প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রাথমিক গোষ্ঠীর পরিচয়কে অতিক্রম করে, একটি বা কয়েকটি বিমূর্ত ঐক্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ঐক্যবোধ বা ভাব যখন অন্য জাতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জাহির করে তখন তাকেই বলে 'জাতীয়তাবাদ'। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে যুদ্ধের সময় বা আন্তর্জাতিক খেলার মাঠে— এই অনুভূতির পরিচয় প্রতিনিয়ত পাওয়া যায়। এর ফলেই বোধ করি, যারা কোনোদিন ব্যাট-বল স্পর্শও করেনি, তারাও চায়ের আসরে বলতে ছাড়ে না, '**আমরা** আজ কী দারুণ খেললাম!' বা 'পাকিস্তানকে কেমন জব্দ **করলাম**!'

এখানে বাস্তব 'আমরা' বা নির্দিষ্ট 'আমরা' বিমূর্ত '**আমাদের**' মধ্যে নিজেদের চিহ্নিত করলাম।

উক্ত প্রক্রিয়াটি এতই স্বাভাবিক যে মনে হয়, এই ভাবটি যেন গোষ্ঠীজীবন যাপনের শুরু থেকেই আমাদের মধ্যে সক্রিয় ছিল। সত্যি সত্যি একদল মানুষ, (যাদের মধ্যে তাত্ত্বিকরাও আছেন) মনে করেন 'জাতি' ও 'জাতীয়তাবাদ'-এর উৎস অতি প্রাচীন। কেবল জাতীয়তাবাদী তাত্ত্বিকরাই নন, ফরাসী স্ট্রাকচারাল-মার্ক্সবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক নিকো পোলানৎজাসও মনে করেন যে 'জাতি'গুলির আছে 'ইতিহাস [ঐতিহাসিক কাল] উত্তীর্ণ অ-সংকোচন যোগ্যতা'। অর্থাৎ বিভিন্ন ঐতিহাসিক কাল উত্তীর্ণ হয়ে প্রবাহিত হয়ে জাতিসত্তা/মনোভাব, যা প্রায় অবিনাশী।

তথ্যের ভিত্তিতে দেখলে অবশ্য এই দাবি নেহাতই অমূলক মনে হবে। এমনকি বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধানের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে' (১৭৭৬) 'নেশন' বা 'জাতি' কথাটি ছিল না, ছিল 'পিপল' বা 'জনগণ', পরে ১৭৮৯ সালের সংবিধানে 'পিপল'কে প্রতিস্থাপন করে 'নেশন'।

তার মানে এই নয় যে, নরগোষ্ঠী, জন্মভূমি, সাম্রাজ্য এবং ধর্ম বা শ্রেণীভিত্তিক কোনো 'যৌথ' ঐক্যের ধারণা আগে ছিল না। কিন্তু 'নেশন'-এর ধারণা (আমরা যে অর্থে আজ তাকে জানি) তার জন্ম হয় ইয়োরোপে অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে— ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতার যুগে। একটু ভালভাবে বলতে গেলে 'জ্ঞানদীপ্তি'র (enlightenment) পরবর্তীকালে, সেটা ছিল 'যুক্তিবাদ'-এর (rationalism) যুগ, যুক্তির আলোকে সব কিছু চিনে নেবার যুগ। অর্থাৎ, মনে করা হত, যুক্তির একটি সাধারণ ও সর্বগ্রাহ্য মাপকাঠি/দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা সম্ভব— যার অজানা, অগম্য কিছুই নেই— যা খুব ন্যায়সংগতভাবে একটি সার্বজনীন সত্য অনুসন্ধান করবে বা একটি বিশ্ববীক্ষা রচনা করবে।

জ্ঞানদীপ্তির প্রভাবে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শাস্ত্র গড়ে উঠতে থাকে যা বিশ্বের এ-তাবৎ অজানা বিষয়গুলির ক্ষেত্রে 'systematic' জ্ঞানচর্চা শুরু করে, বা বলা যেতে পারে সমস্ত বিষয়, বস্তু বা ইতিহাসকেই একটি 'system of knowledge'-এর আওতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয়— যে 'ব্যবস্থা' (system) গড়ে উঠেছে উত্তর-জ্ঞানদীপ্তি পর্যায়ে ইয়োরোপীয় জ্ঞানচর্চার আদর্শগুলিকে কেন্দ্র করে— যেখানে ইয়োরোপ হল 'Knower' বা 'Subject' এবং (ইয়োরোপ বহির্ভূত) **অন্যান্য** বিষয়, বস্তু বা বিশেষ করে ইতিহাস ও সংস্কৃতি হল জ্ঞানলাভের বিষয় বা 'Object'. আরো পরিশীলিত পরিভাষায় বলতে গেলে, সংস্কৃতি ও ইতিহাসমূলক জ্ঞানচর্চার এ-হেন কাণ্ডে ইয়োরোপ হল **'আত্ম'** (Self) — অন্যরা **'পর'** (Other)। এডওয়ার্ড সাইদ-এর বুদ্ধিদীপ্ত, বিশ্লেষণাত্মক রচনাসমূহ প্রকাশ হওয়ার পর আজ বিষয়টি সুধীসমাজেও বহুল আলোচিত বিষয়।

ইয়োরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির এই পর্যায়ে জাতীয়তাবাদের জন্ম। তাই তার মধ্যে আমরা 'জ্ঞানদীপ্তি'-র নানা জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রবণতা ও মতাদর্শ লক্ষ করি। যেমন, একদিকে 'সার্বজনীনতা'র প্রবণতা, আবার অন্যদিকে চলে 'আত্ম' ও 'পর'-এর বিভাজন ক্রিয়া। বস্তুত, জাতীয়তাবাদের প্রস্তুতিকালীন পর্যায়ে এই দ্বিতীয় প্রবণতা— অর্থাৎ 'আত্ম' ও 'পর'-এর বিভাজনই প্রাবল্য পায়। ফলে, অনেক সময় মনে হয় যে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্তি ও যুক্তিবাদ উৎসারিত বিশ্বজনীনতার একটা বিরোধ আছে বা অন্যভাষায় (যেমন, এলি কেডোরি বলেছেন) জাতীয়তাবাদ হল অযৌক্তিক ও ধ্বংসাত্মক। কিন্তু আমরা দেখব, কীভাবে 'পরিণত' জাতীয়তাবাদে এই বিরোধের ('বিশ্বজনীনতা বনাম 'আমাদের' স্বাতন্ত্র্যের) 'প্রায়' নিষ্পত্তি ঘটে। তবে তার আগে দেখতে হবে জাতীয়তাবাদী বিমূর্তায়নের নানা প্রক্রিয়া।

॥ দুই ॥

জাতীয়তাবাদী বিমূর্ততার মধ্যে রয়েছে সার্বজনীনতার দুটি স্তর। একটি বিশ্বজনীন সার্বজনীনতা, অপরটি জাতীয়ক্ষেত্রের সার্বজনীনতা।

বিশ্বজনীন সার্বজনীনতা গড়ে ওঠে 'সার্বজনীন' ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কারিগরী এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের ধ্যানধারণা থেকে। জাতীয়তাবাদের যুগেই ইতিহাসচর্চা সার্বজনীন হয়ে ওঠে বা বলা চলে, এই সময়েই এ বিশ্বাস জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে যে মনুষ্যসমাজের একটি সার্বজনীন ও সর্বব্যাপী ইতিহাস আছে। জাতীয়তাবাদবিষয়ক পুরনো তত্ত্বকারদের চোখেও এ বৈশিষ্ট্য এড়ায়নি। যেমন Hans Kohn এর কথায় :

'The age of nationalism represents the first period of *universal* history, what preceded it was a long era of separate civilizations and continents among which little, if any, inter-course or contact existed.'

বলা বাহুল্য এই 'universal history' বিভিন্ন অ-পশ্চিমী দেশগুলির ইতিহাস বিচার বা ব্যাখ্যা করার কিছু 'সাধারণ পরিমাপক' (standard yardstick) ব্যবহার শুরু করে। যেমন, গত শতকের গোড়ায়, যখন পশ্চিমী যুক্তিবাদ ও জাতীয়তাবাদ এদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি, সেই সময় বাঙলায় লেখা প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'রাজাবলী'র লিখনশৈলী, তথ্য উপস্থাপন সবকিছুই 'পুরাণ' নির্ভর— অর্থাৎ তথ্যের বস্তুগত বিশ্বাসযোগ্যতা ও পারম্পর্যরক্ষা প্রভৃতি যে সব উপাদান আধুনিক ইতিহাসচর্চার প্রাথমিক শর্ত বলে বিবেচিত হয়— এ যেন তার বাইরে কোনো 'অ-যৌক্তিক', 'অনৈতিহাসিক' কাহিনী। কিন্তু এই গ্রন্থের অর্ধশতাব্দী পর যখন ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাব এদেশের জ্ঞানচর্চায় প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং যখন দেশীয় এলিটের চেতনায় জাতীয়তাবাদ আসি-আসি করছে, তখনকার ইতিহাস গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রে, শৈলী, পদ্ধতি, তথ্যচয়ন এমনকি বর্ণনা— সবকিছুর মধ্যে সেই ঘরানার ছাপ অতি স্পষ্ট। উক্ত ঘরানা গড়ে উঠেছিল ইয়োরোপীয় 'সার্বজনীন' ইতিহাসচর্চার দ্বারা।

অন্য এক প্রক্রিয়ায় জাতীয়তাবাদ 'জাতীয়' ক্ষেত্রের সার্বজনীনতা— যা তার অস্তিত্বের প্রধান যুক্তিপ্রদায়িনী— গড়ে তোলে এবং তাকে অন্য জাতীয়তার বিপরীতে স্থাপন করে— অর্থাৎ, এখানেও দুটি স্তরে বিমূর্ততা ক্রিয়া করে একটি 'জাতীয়-আত্ম'-এর স্তর এবং অন্যটি 'অপর-জাতীয়তা'র স্তর। এ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ একটি বা কয়েকটি সাংস্কৃতিক/রাজনৈতিক উপাদান বেছে নিয়ে একটি জনসমাজের সমস্ত অংশের ওপর বিমূর্তভাবে প্রয়োগ করে।

এই উপাদানগুলির কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই, তবে সাধারণত ভাষা, ধর্ম, আঞ্চলিকতা, অতীত গৌরব, বিদেশী জাতির বিরোধিতা প্রভৃতি যে কোনো একটি/কয়েকটি/সবকটি উপাদান কাজে লাগিয়ে বিমূর্ত ঐক্য গড়ে তোলা হয়। এই প্রক্রিয়ায়, স্বাভাবিকভাবেই, ব্যক্তিকে তার নির্দিষ্ট আঞ্চলিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে উৎপাটিত করে প্রতিষ্ঠিত করা হয় একটি বা কয়েকটি বিমূর্ত ঐক্যবিন্দুর ওপর। যেমন, যে ফরাসী ভাষা ফরাসী জাতীয়তাবাদের অন্যতম ভিত্তি— তা গড়ে উঠেছিল বিপ্লব-পরবর্তী ফ্রান্সে বহু আঞ্চলিক ভাষাকে আত্মসাৎ করে বা প্রান্তে ঠেলে দিয়ে। আবার বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন দেখিয়েছেন কীভাবে print-capitalism-এর যুগে রুশ ভাষার আগ্রাসনে রুশ জাতির জন্ম হয়েছিল, এমনকি, স্বামী বিবেকানন্দ 'তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' সম্বন্ধীয় আলোচনায় জানিয়েছেন কীভাবে ও কেন বাঁকুড়া, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য আঞ্চলিক বাঙলাকে পরাস্ত করে 'কলকাতার ভাষা'ই বাঙলার মূলস্রোত হিসেবে গণ্য হবে।

অনেক সময় কোনো একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক/ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকেও আরোপ করা হয় 'অন্য' অঞ্চলগুলির ওপর। তখন পরিচয়ে, বর্ণনায়, গাথায়, গানে ঐ বিশেষ অঞ্চলটিই হয়ে ওঠে জাতি-প্রতিম— যেমন ইংল্যান্ড, ওয়েলশ ও স্কটল্যান্ডের মধ্যে ইংল্যান্ডই গোটা 'ইউনাইটেড কিংডম'-এর জাতীয়তার প্রতীক। আজ আমাদের দেশের হিন্দিবলয়ের সংস্কৃতিকেই গোটা জাতির সংস্কৃতি বলে চালানোর অপচেষ্টাকে আমরা

যতই ধিকৃত করি না কেন, ভুলে গেলে চলবে না এ প্রচেষ্টাও নতুন নয়। উনিশ শতকের বাঙালি মনীষীরাও প্রায় তা-ই করেছিলেন। নতুবা, 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং— যা আসলে বাঙলার ভূ-প্রাকৃতিক ('কাল্পনিক'?) বিবরণ, তার সঙ্গে থর মরুভূমির অঙ্কে পালিত জনগোষ্ঠী কোন্ মন্ত্রে একাত্ম বোধ করবে? অথবা, গ্রাম বাঙলার (পোশাক, পরিধান শৈলী, মুখাবয়বে এই পরিচয় স্পষ্ট) বিধবা স্নেহময়ী 'জননী'র প্রতিকৃতিকে বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা 'ভারতমাতা' আখ্যা দিলেও অরুণাচল প্রদেশের 'সন্তান'দল তাঁকে প্রথম দেখায় 'মা' বলে চিনবে কি? আমার ধারণা, 'বিশ্বমাতা'র ছবি আঁকতে দিলেও বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরা একই জিনিস আঁকতেন।

।। তিন ।।

সুতরাং, আমরা দেখলাম, জাতীয়তাবাদ— যার তাত্ত্বিক উৎস ইয়োরোপীয় জ্ঞানদীপ্তি— দু ধরনের সার্বজনীন-বিমূর্ত সত্তার জন্ম দেয়: একটি 'আমরা' বা 'আমাদের' সত্তা এবং একটি 'তারা' বা 'তাদের' সত্তা। বস্তুত, 'তারা' আছে বলেই বিপরীতে 'আমরা' আছি।

এখন মনে হতে পারে, এই 'আমাদের'-'তাদের' জাতীয় বিমূর্ত বিভাজন— জ্ঞানদীপ্ত উৎসারিত বিশ্বজনীন যুক্তিবাদেরও বিরোধী। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট রাষ্ট্রতত্ত্বকার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কিছু আলোচনা অবশ্য-উল্লেখ্য। তাঁর মতে, আঠারো শতকের যুক্তিবাদের যেমন ছিল বিশ্বজনীন বাসনা— অর্থাৎ সমগ্র জীবন ও জগতকে কিছু সাধারণ বিচারপদ্ধতি, রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ করার ইচ্ছা, আরেকটি উপাদানেরও তেমনি জন্মলগ্ন থেকেই রয়েছে বিশ্বজনীন বাসনা— বলা বাহুল্য এই উপাদানটি হল পুঁজি বা capital— যা যুক্তিবাদের মতোই, বা বলা ভালো যুক্তিবাদকে কাজে লাগিয়ে চেয়েছে তার বিশ্বজনীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে। যুক্তিবাদীর মতোই সে দাবি করে, বিকাশের একটি মাত্র সার্বজনীন পথ আছে— যার নিয়ন্তা পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। কিন্তু, যা অনেক সময় অনুক্ত থাকে, তা হল 'পশ্চিমী' বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চা করা সম্ভব শেষপর্যন্ত শ্রমের চূড়ান্ত সামাজিক বিভাজন ঘটিয়ে এবং আমরা জানি, সামাজিক শ্রম বিভাজনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে পুঁজি। এই দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়, যুক্তিবাদ সমর্থিত পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর বিকাশ এবং পুঁজিবাদী বিকাশ জ্ঞানতত্ত্বগত-ভাবে একে অন্যের পরিপূরক।

অনেক সময় মনে হতে পারে একটি 'জাতীয়' ঐক্যের তত্ত্ব, (বিশেষত ঔপনিবেশিক দেশগুলির ক্ষেত্রে), হয়তো একটি বিশ্বজনীন-বিমূর্ত বিকাশের ধারণার অর্থাৎ বিকাশের পশ্চিমী মডেলের বিরোধিতা করে। তাকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং তাকে রুখে দেয়। যেমন, ভারতে গান্ধীবাদী জাতীয়তাবাদ কেবল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতাই করেনি— তা বিকাশের পশ্চিমী তত্ত্বটিকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। তাই, 'চরকা'

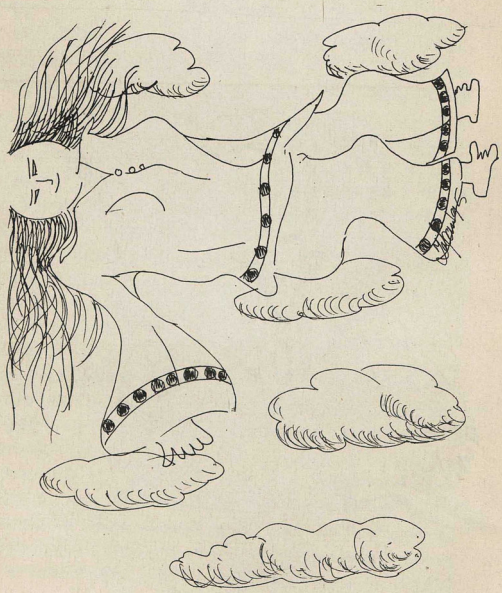

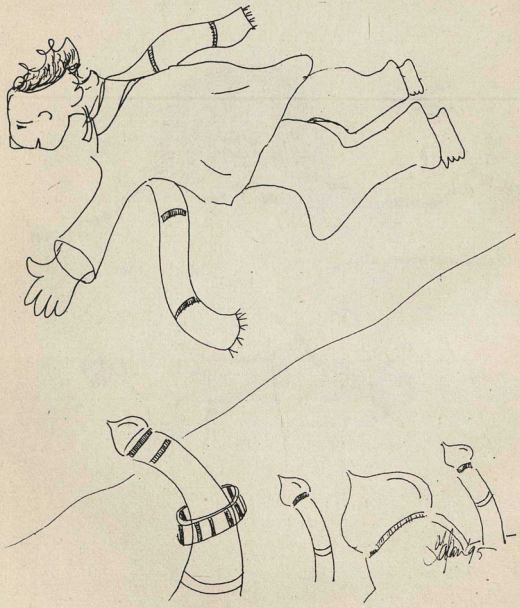

গান্ধীর কাছে নিছক সুতো-কাটার যন্ত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে (অসহযোগপর্বে) তাঁর বিখ্যাত বিতর্কে গান্ধী জানিয়েছিলেন 'চরকা হল ভারতের আর্থিক মুক্তির একমাত্র সার্বজনীন পথ।' কারণ, অন্যত্র জানিয়েছেন তিনি, চরকা হল গ্রামীণ সারল্যের (যা পশ্চিমী জটিল যন্ত্র সভ্যতার বিপরীত) **প্রতীক**।

কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, ঔপনিবেশিক-জাতীয়তাবাদের আছে এক জন্মগত দো-টানা— একদিকে বিশ্বজনীন মুক্তি/বিকাশ/প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার; অন্যদিকে এই বিশ্বজনীন গ্রাসের মধ্যে, [কল্পিত] 'আমাদের' স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা। ঔপনিবেশিক-প্রস্তুতিকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোনো বিশেষ পর্যায়ে বিকাশের 'পশ্চিমী' মডেলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 'আমাদের' ভুবন (সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্র) তৈরির চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এই ভিন্ন ভুবন, জ্ঞানতত্ত্বগতভাবে, পশ্চিমী মডেল-কে রুখে দিতে পারেনি। কারণ, জ্ঞানদীপ্তির সন্তান হিসেবে প্রতিটি জাতীয়তাবাদ শেষ বিচারে (অর্থাৎ 'জাতীয়-রাষ্ট্র' হয়ে ওঠার পর্যায়ে) বিকাশমুখী এবং এই বিকাশের মাত্রা অবশ্যই পশ্চিমী মাপকাঠিতেই বিচার্য।

তাই প্রতীক বদলে যায়, মীথ বদলে যায়— অনেকটা সতীনাথ ভাদুড়ির উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর 'গানহী বাওয়া'র মতো। তাৎমাটুলির তাৎমাদের সরল বিশ্বাসে গানহী বাওয়া একদিন বিলিতি কুমড়োর খোসায় 'মূরত ধরে' দেখা দিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন পর, তাৎমারা ঠাহর করতে পারে না কী করে, 'গানহী মহারাজ, পুরোন গানহী বাওয়া হঠাৎ কবে থেকে মহাৎমাজী হয়ে গিয়েছেন'।

কিন্তু আমাদের গল্পের এখানেই শেষ নয়। ঔপনিবেশিক-জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে মীথ-এর আরো বদল হয়— নেতৃত্ব, আদর্শ সব পালটে যায়: সর্বশক্তিমান নেতা তাঁর জীবদ্দশাতেই পরিণত হন ঔপাচারিক রবার স্ট্যাম্প-এ। তাই প্রাক-জাতীয়রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভারতের চরকা, শিল্পযন্ত্রের বিরোধিতায় বিশেষ গুরুত্ব পেলেও স্বাধীন ভারতে পশ্চিমী অর্থে শিল্পোন্নয়নই হয়ে ওঠে গুরুত্বের কেন্দ্রভূমি। গান্ধী তাঁর দর্শনসমেত হারিয়ে যান। উঠে আসেন নেহরু।

আপাতবিরোধী মনে হলেও এইভাবে জাতীয়তাবাদী বিমূর্ততা একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে ও যুক্ত করে। রাজনৈতিক স্তরে সে অন্যান্য জাতির থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে। আবার বিকাশের প্রশ্নে সে আত্মসমর্পণ করে পুঁজিবাদ-উৎসারিত সার্বজনীনতার কাছে। হয়তো এই প্রক্রিয়া অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু তা বলে জাতীয়তাবাদের স্বস্তি নেই। টিভি-র পর্দায় রুপোলি নায়কের সঙ্গে গলা ফাটিয়ে 'মিলে সুর মেরা তুম্হারা' গাইলেও মাঝে মাঝেই সুর কেটে যায় এখানে সেখানে। মেট্রোপলিটান এলিট সংস্কৃতির ফাটল চুঁইয়ে ভেসে আসে লোকায়ত সংস্কৃতির শব্দ ও গন্ধ। বনাঞ্চলের মানুষ, পাহাড়ী মানুষ, ব্রাত্যমানুষের ক্রোধ ফেটে পড়ে এদিক-সেদিক। ফরাক্কা বাঁধের অপার আলোকসজ্জাকে ব্যঙ্গ করে চারপাশের ঘন অন্ধকার। এখনো ঠুনঠুন রিক্সাওয়ালাকে 'দেশ' কোথায় জিজ্ঞেস করলে, সহাস্য উত্তর মেলে, 'ছাপরা জিলা'। □

বিমূর্ততা : ইতিহাসের বন্ধন ও মুক্তি

শ্যামলী সুর

যদিও ইতিহাস ও বিমূর্ততা, ইতিহাস ও তত্ত্বের সম্পর্ক বহুদিনের—এই সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থেকেছে দার্শনিকের চিন্তাপ্রক্রিয়ায় ও ইতিহাসবিদ্যার প্রাঙ্গণে। ইতিহাসের দর্শন থেকে গিয়েছে নিতান্ত অবহেলিত বা সুদূর।

প্রশ্ন হল আমরা প্রাত্যহিক ইতিহাস পঠন-পাঠনে বিমূর্তায়নকে কোন্ কাজে লাগাই? বন্ধনের না মুক্তির? কালানুক্রমের বন্ধন—বিষয়ানুগতার বন্ধন-এ বাঁধা পড়ে থাকে ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসের যে-বিষয়ীগত রূপ সাহিত্যিকের, শিল্পীর ও ভাবুকের বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত তার সঙ্গে আমাদের প্রথাগত ইতিহাসের বড় একটা সম্পর্ক নেই। আমাদের প্রশ্ন এই যে কালচেতনার বহুমাত্রিক, জটিল ও বিচিত্র যাত্রা কি প্রথানুগ ইতিহাসের ক্ষেত্রে একেবারে অপাংক্তেয় হয়েই থাকবে?

প্রচলিত ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বিমূর্তায়নের দু / এক ধরনের ব্যবহার আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমেই ধরা যাক কালানুক্রমের বিষয়টি। ইতিহাস পড়াতে গেলে আমাদের

বেছে নিতে হয় একটি বিশেষ কালপর্বকে। কিন্তু এই কালপর্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একটি বিমূর্তায়ন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। শুরুতে আমরা ইতিহাস সম্পর্কে একটি সাধারণ বা বিশেষ ধারণা দাঁড় করাই। তারপর সেই নকশাকে ঐতিহাসিক ঘটনা-পঞ্জীর ওপর চাপিয়ে দিই। এক্ষেত্রে আবার পশ্চিমী কালানুক্রমের ধারণাকেই আমরা কম / বেশি অনুসরণ করে চলেছি। ইংরেজ আমলে ঔপনিবেশিক ইতিহাসতত্ত্বে শাসকদের ধর্ম অনুসারে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিভক্ত হয়েছিল তিনটি যুগে : হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ এবং ব্রিটিশ যুগ। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরেও এই ধর্মভিত্তিক পর্ববিভাজন নাম পাল্টে থেকে গেল। এক্ষেত্রেও ইতিহাসের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ সংক্রান্ত পাশ্চাত্য ধারণাগুলিকেই আমরা গ্রহণ করেছি, যদিও পাশ্চাত্য পর্ববিভাজন তথা পাশ্চাত্য সমাজ-বাস্তব কোনোমতেই আমাদের দেশীয় সমাজ-বাস্তবের সঙ্গে মেলে না।

অধুনা যখন 'আধুনিকতা'র সংজ্ঞাটির সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই নানান প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে, তখন এই আধুনিকতায় উত্তরণ অগ্রগমন না পশ্চাদ্‌গমন তাও ভেবে দেখা দরকার।

অন্য একটি প্রবণতা হল বিষয়-কেন্দ্রিক ইতিহাস আলোচনা— অর্থাৎ অর্থনৈতিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস বা সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রভৃতি এক একটি বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত ইতিহাস। এক্ষেত্রেও আবার মানুষকে একমাত্রিক জীব হিসেবে ধরে নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করা হয়। হয় সে অর্থনৈতিক প্রাণী, নয় সে সামাজিক প্রাণী। মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্বকে এক বিমূর্তায়নের প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট খণ্ডে ভেঙে ফেলা হয়।

কিন্তু মানুষ তো বিচিত্র প্রাণী। তার বাঁচার নানান মাত্রা।

আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ্যার প্রভাবে যুক্তিবাদ তথা জ্ঞানদীপ্তি-শিল্পায়ন-আধুনিকতার সর্বজনীন মাপকাঠিতে সারা পৃথিবীর ইতিহাসকে বিমূর্ত ছকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা চলে আসছে। ইতিহাস অনন্ত প্রগতির ইতিহাস— তা যেন এক একমাত্রিক সরলরেখার বিবর্তনমাত্র। মাঝে মাঝে পাশ্চাত্য ইতিহাসের চৌহদ্দির মধ্যেই এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটেছিল যা এই প্রগতির ধারণার পক্ষে অন্তরায়— যেমন সাম্রাজ্যবাদ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, নাৎসীবাদের উত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং শেষত যুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডালড়াই। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনাপ্রবাহের বিকৃতিকে সাময়িক ত্রুটি বলে পাশ কাটিয়ে একদিকে কম্যুনিস্ট বিপ্লবগুলি এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীকে প্রগতির পথে যাত্রা বলে মনে করা হয়েছিল। আর এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নতিশীল দেশগুলির ইতিহাস রয়ে গেল মূল চৌহদ্দির বাইরে। সেই দেশগুলির ইতিহাস হল পাশ্চাত্য প্রগতির বিকৃত বা পিছিয়ে-পড়া রূপ। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাইরের যে-কোনও সভ্যতাই হল নৃতত্ত্বের বিষয়। পাশ্চাত্য : বিষয়ী, প্রাচ্য : বিষয় — পাশ্চাত্য : আত্ম, প্রাচ্য : পর।

একবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে ইতিহাসের এই সর্বজনীন কাঠামোকে নানান ধরনের

সমালোচনা ও আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফলে বিভিন্ন সমালোচনার দিক থেকে ইতিহাসচর্চার কতকগুলি বিকল্প রূপও ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

লুসিয়েন ফেভ্‌রে (Lucien Febvre : 1878-1956) এবং মার্ক ব্লখ্‌ (Marc Bloch: 1886-1944) মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের বিচিত্ররূপকে প্রথম ধরতে চাইলেন ইতিহাসের সীমায়। ভূগোল ও সামাজিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা ইতিহাসের ব্যাপকতর বিশ্লেষণ করতে অগ্রসর হলেন। তাঁরা সাহায্য নিলেন জ্ঞানতত্ত্বের বহু বিচিত্র শাখার গবেষক ও তাঁদের উত্তরসূরী ফার্নান্দ ব্রদেল-এর (Fernand Braudel : 1902-83)। সামাজিক কাঠামোকে একদিকে কালের দীর্ঘস্থায়ী বা চিরন্তন এককে এবং অন্যদিকে তার দ্রুতগতিসম্পন্ন একক ও সেই এককের পরিবর্তমানতাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন এঁরা।

পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের ইতিহাসের গর্ভেই জ্ঞানদীপ্তির যে সমালোচনা নিহিত ছিল, তা আজকের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে নীটৎসে-কে (Nitzsche, Karl Wilhelm : 1818-80) একদিন ফ্যাসিবাদের বৌদ্ধিক জন্মদাতা বলে অভিযোগ উঠেছিল তাঁকেই এখন গভীরতর চর্চার বিষয় বলে ভাবা হচ্ছে। যুক্তির গঠিত যাত্রাপথই নয়। অযুক্তির পথও একটা পথ। এই বিকল্প গমন ধরেও অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। জ্ঞানতত্ত্বকে ক্ষমতার হাতিয়ার রূপে উপস্থাপিত করেছেন মিশেল ফুকো (Michel Foucault : 1926-85)। সংক্ষেপে, তাঁর অন্যতম প্রধান বক্তব্য হল জ্ঞানচর্চা তথা ইতিহাসচর্চা ক্ষমতা বিস্তার এবং ক্ষমতা সংহতিকরণের হাতিয়ার রূপেই কাজ করেছিল। জ্ঞান ও সভ্যতা মানুষকে তাঁর আদিম প্রকৃতি ও চরিত্র থেকে বিযুক্ত করে ক্রমশ বিকৃতির দিকে ঠেলে দেয়।

ক্ষমতার দিক থেকে, ক্ষমতাবানের দিক থেকে না দেখে ইতিহাসকে দেখা যাক নীরব ব্রাত্যজনের দিক থেকে, অবহেলিতা নারীর দিক থেকে, শোষিত নিম্নবর্গের দিক থেকে। দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চার কেন্দ্র পরিবর্তিত হওয়ার ফলে সম্প্রতি ইতিহাসে অনেক নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনও ইতিহাসের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক, আমাদের রন্ধনবিদ্যা, আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার সবই আজ ইতিহাস-আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

মানুষের সচেতন মনের গভীরে যে অজানা, অদেখা জগত পড়ে আছে— যেখানে হয়তো গুঁড়ি মেরে বসে আছে অনেক অন্ধবিশ্বাস ও আদিমতা, সেখানেও আজ ঐতিহাসিক হাত বাড়িয়েছেন। শিক্ষা-দীক্ষায় প্রচণ্ড আধুনিক যুক্তিবাদীর মনের গোপনে নিহিত থাকতে পারে আদিম প্রবণতা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আসক্তি। সেই চরিত্র হঠাৎ-ই কোনো সূক্ষ্মস্পর্শে অণুরণিত হয়ে ওঠে। কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের বিচরণের জগত আজ ঐতিহাসিকেরও পদধূলিতে সরব।

এর সঙ্গেই প্রসঙ্গত জড়িয়ে আছে মনোভঙ্গির ইতিহাস (History of mentalite)।

আগেকার বুদ্ধি-কেন্দ্রিক ইতিহাস বা চিন্তার ইতিহাসে প্রধানত প্রথাগত চিন্তাপ্রণালী বা চিন্তা-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা হত। আজ মনোভঙ্গির ইতিহাসে অর্ধশিক্ষিত বা নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মনোভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রগুলিও চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে বিচিত্র নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। যেমন, ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফরাসী জনগণের মনোভঙ্গি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে দেশবাসীর মনোভঙ্গির পরিবর্তন হতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। অনেক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল বিপ্লবের বার্তা এসেছিল পুরাতনতান্ত্রিক প্রতীক ও বিশ্বাসের মাধ্যমে, ধর্মীয় প্রচারের মাধ্যমে এবং ভাষা ও প্রবাদের মাধ্যমে।

সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদীরা দাবি করেছেন— শুদ্ধ পাশ্চাত্য উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠান-গুলির দিক থেকে নয়, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দিক থেকে, কৌমজীবন ও কৌমচেতনার দিক থেকেও ইতিহাসকে ভেবে দেখা উচিত। তবেই জ্ঞানদীপ্তি তথা আধুনিকতার একমাত্রিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে বহুরঞ্জিত এক বর্ণোজ্জ্বল ছবি জেগে উঠবে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং ইতিহাসের অস্তিত্ব নিয়েই মৌলিক প্রশ্ন উঠেছে। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে-পড়ার ফলে এবং ঠাণ্ডা লড়াই-এর পরিসমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে মতাদর্শগত বিরোধ তথা মতাদর্শগত আন্দোলনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তার সঙ্গে ফুরিয়েছে ইতিহাসের প্রয়োজনও। এখন ভোগবাদী মানুষের প্রয়োজন কেবল প্রযুক্তিগত ও ব্যবহারগত সুযোগ-সুবিধাগুলি। ইতিহাস এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে সংরক্ষণশালার ঠাণ্ডা যাদুঘরে।

অর্থাৎ প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ ইতিহাসকে এই যুগে বহুমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যেমন, সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদের দিক থেকে, জ্ঞানদীপ্তির বিরুদ্ধ-সমালোচনার দিক থেকে, ক্ষমতার দর্শনের দিক থেকে, নিম্নবর্গের দিক থেকে, ব্রাত্যজনের দিক থেকে, নিতান্ত ব্যক্তিগত দিক থেকে এবং ইতিহাস-বিরোধিতার দিক থেকে। এখন প্রশ্ন হল ইতিহাস পঠন-পাঠন কি পূর্ব নির্ধারিত বিমূর্ততার ছকেই আটকে থাকবে, নাকি তাকে সরাসরি বিমূর্ততার বিভিন্ন মাত্রার সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যুক্ত হতে হবে জ্ঞানের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের সঙ্গে? উত্তর এই যে তথ্যনির্ভর, দলিল-দস্তাবেজ বিশ্লেষণকারী যে-ইতিহাসকে আমরা এতদিন সম্মান করে এসেছি, তাকে ক্রমে মানবজীবনের বহু সূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্নের কথা ভেবে দেখতে হবে। □

বিমূর্ততা—একটি স্বাধীন অবস্থান

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

বিমূর্ততা একটা ধারণা এবং একটা অবস্থান।
বিমূর্ততা একটা সামগ্রিকতা, একটা অখণ্ডতা।
বিমূর্ততা একটা রচনা। এর নির্মাণের কোনো প্রকাশিত বিধি এবং বিধান নেই।
পৃথিবী জীবনের আধার। জীবনের জন্ম ও বিকাশ পৃথিবীর পরিমণ্ডলে। জীবনের রূপ মানুষ ও প্রকৃতি। মানুষের জন্ম ও বিকাশ হয়। প্রকৃতিরও জন্ম ও বিকাশ হয়। মানুষ ও প্রকৃতি মিলে জীবন জগৎ।
জীবন জগৎ ও পৃথিবী পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত। জীবন জগতে মানুষ ও প্রকৃতি এই দুই উপাদান সম্বন্ধযুক্ত। এই সম্বন্ধের আদিম ও পরিশুদ্ধ রূপ বিমূর্ত।
জীবন জগতের যাত্রায় মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ রূপান্তরিত। সম্বন্ধের ধারণা পরিবর্তিত।
সময়কালে এই সম্বন্ধ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রয়োজন দ্বারা স্বার্থ দ্বারা নির্ধারিত এবং আকার প্রাপ্ত।

উদ্দেশ্য প্রয়োজন স্বার্থ ক্ষমতার বিষয়।
ক্ষমতার বিমূর্ততায় সমস্যা, মূর্ততায় ভিত্তি।
মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধের মূর্তধারণা নির্মাণে ক্ষমতার বিন্যাস। মূর্ততা একটি প্রকাশিত নির্মাণ। বর্গ প্রকাশিত নির্মাণের আকার। বর্গ অখণ্ডতাকে খণ্ডীকরণ। বর্গ-এ সম্বন্ধের বিভাজ্যতায় ক্ষমতার স্থিতি।
যেমন প্রকৃতির খণ্ডরূপ নির্মাণ
অরণ্য, বৃক্ষ, উদ্ভিদ, শস্য, খাদ্যশস্য, ভেষজ,
প্রয়োজনীয় অরণ্য, প্রয়োজনীয় বৃক্ষ
শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অরণ্য, প্রয়োজনীয় বৃক্ষ
শিল্প উন্নত দেশের শিল্পের স্বার্থ অনুযায়ী অরণ্য, স্বার্থ অনুযায়ী বৃক্ষ।
শিল্প উন্নত দেশের উচ্চাবিত্ত মানুষের স্বাদ অনুযায়ী উদ্ভিদ
শিল্প উন্নত দেশের উচ্চাবিত্ত মানুষের স্বাস্থ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্ভিদ
শিল্প উন্নত দেশের নির্দিষ্টকালীন প্রয়োজন অনুযায়ী বৃক্ষ
একটি দেশের নীতি অনুযায়ী অরণ্য
একটি দেশের একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী অরণ্য।
এই স্বার্থ, প্রয়োজন, নীতি, পরিকল্পনা খণ্ডিত ধারণা।
ক্ষমতা নির্ধারিত মূর্ত বিষয়। মানুষ প্রকৃতি সম্বন্ধের সামগ্রিকতা সেখানে অনুপস্থিত। সেখানে মানুষের সামগ্রিক ধারণা মানব সমাজ অস্বীকৃত। সেখানে অরণ্য, বৃক্ষ, উদ্ভিদ, শস্যের সামগ্রিক ধারণা প্রকৃতি অস্বীকৃত।
সামগ্রিক ধারণার অস্বীকৃতিতে মানব সমাজের পরাধীনতা প্রকৃতির পরাধীনতা।
বিমূর্ততা থেকে মূর্তার যাত্রা, সামগ্রিকতা থেকে খণ্ডতর যাত্রা এখন অবাধ। এখন প্রয়োজন উদ্দেশ্য স্বার্থর প্রাধান্য।
এই প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার নিয়ম, নীতি, বিধান বিধি নির্মিত। এই নির্মাণ লিখিত, স্থায়ী, কাঠামোগত, ব্যবহারিক, প্রায়োগিক।
অরণ্য আইন, জল ব্যবস্থা, বৃক্ষনীতি, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, রপ্তানিযোগ্য খাদ্যশস্য এই সব নির্মাণ, ক্ষমতার নির্মাণ।
মানুষ প্রকৃতি সম্বন্ধ রাষ্ট্রীয় বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ।
প্রকৃতি মানুষ সম্বন্ধে ক্ষমতার রূপ রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ। প্রকৃতি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে গ্রাহ্য। মানুষ রাষ্ট্রীয় বিষয় হিসাবে গৃহীত।
মানুষের বর্গীকরণ, আদিবাসী, উপজাতি, রাষ্ট্রতালিকাভুক্ত, কৃষিজীবি, পার্বত্য অধিবাসী ইত্যাদি।
এবং এই বর্গীকরণ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী।
এই বর্গীকরণে বিভাজ্য খণ্ডিত মানব সমাজের নির্দিষ্টতা অনুযায়ী প্রকৃতি সম্বন্ধ নির্ধারিত। এই নির্ধারণ মূর্ত এবং প্রায়োগিক।

বর্গীকৃত প্রকৃতি ও বর্গীকৃত মানুষের ক্ষমতা নির্ধারিত সম্বন্ধে মানুষ পরাধীন, মানুষ প্রকৃতি সম্বন্ধ পরাধীন।
বিমূর্ততা থেকে মূর্ততায় যাত্রায়, মূর্ততার অবস্থানে পরাধীনতা, বিপরীতে বিমূর্ততায় স্বাধীনতা।
বিমূর্ততায় ক্ষমতার অস্তিত্ব। বর্গ নেই, আকার নেই। খণ্ড নেই, চিহ্ন নেই। ভিত্তিহীনতায় ক্ষমতা অবলম্বনহীন, ক্ষমতার অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতা।
মূর্ততা থেকে বিমূর্ততায় যাত্রা, পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতায় যাত্রা মানব সমাজের আকাঙ্ক্ষিত প্রকল্প।
মানুষ প্রকৃতি সম্বন্ধের বিমূর্ততায় মানব গোষ্ঠী স্রষ্টা, সৃষ্টি আনন্দময়, সৌন্দর্যময়। জ্ঞান গোষ্ঠীর সঞ্চয়, বিকাশ মানব সমাজের।
মূর্ততায় ব্যক্তি অথবা সংস্থা স্রষ্টা, সৃষ্টি স্বার্থযুক্ত, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য প্রণোদিত, আনন্দহীন, সৌন্দর্যহীন, জ্ঞান ব্যক্তি অথবা সংস্থার সম্পত্তি। বিকাশ সীমাবদ্ধ বর্ণের।
বিমূর্ততা একটি স্বতঃস্ফূর্ত অপরিকল্পিত অবস্থান। একটি সাময়িক স্থানিক কালিক নির্মাণ। সেখানে দৃশ্যমান পরিকল্পিত বাস্তবতাকে অস্বীকার।
বাস্তবতা ক্ষমতার স্বার্থ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী আকারপ্রাপ্ত বহিরাগত।
বিমূর্ততায় কল্পিত বাস্তবতার তাৎক্ষণিক নির্মাণ ও বিসর্জন। বাস্তবতা অন্তস্থ আন্তরিক।
মানুষ প্রকৃতি সম্বন্ধের বিমূর্ততায় নির্মাণের ও বিসর্জনের স্বাধীনতা।
বিমূর্ততা এক স্বাধীন অবস্থান।
বিমূর্ততা এক অসীম ধারণা। □

দ্বীপান্তরী অভিরাম

অরুণ নাগ

ঘটনাটি সকলের জানা, স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য সংক্ষেপে বলা যাক।

১৯০৪ সালে কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন কিংসফোর্ড। উগ্র সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের কঠোর শাস্তিদানের কারণে তিনি বিপ্লবীদের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। খবর পেয়ে গোয়েন্দা বিভাগ সরকারকে সতর্ক করে দেয়। ইতিমধ্যে বইয়ের ভিতর বোমা পাঠিয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যার একটি চেষ্টা নিষ্ফল হয়। নিরাপত্তার কারণে সরকার তাঁকে বদলি করে ও ১৯০৮ সালের ২৮শে মার্চ কিংসফোর্ড মজঃফরপুরের জেলা ও সেসন জজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিপ্লবীরা হাল ছাড়েননি, কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশে সংগঠনের নির্দেশে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে যান। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল রাত্রে যে ঘোড়ার গাড়ির ওপর তাঁরা বোমা ছোঁড়েন, তাতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, ছিলেন মিস ও মিসেস কেনেডি। একজনের তখনি মৃত্যু ঘটে, অপরজন মারা যান হাসপাতালে। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল দুজনে দুদিকে পালান। পথশ্রান্ত অবস্থায়, পরদিন,

১লা মে সকালে রিভলবার সমেত ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন ওয়াইনি স্টেশনের কাছে, অপরদিকে গ্রেপ্তার অনিবার্য দেখে সেইদিন মোকামাঘাটে প্রফুল্ল রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরামের মামলা শুরু হয় ২১শে মে, তিনি অভিযোগ স্বীকার করেন। মামলা দায়রায় সোপর্দ হয় ২৫শে মে, ১৩ই জুন রায় বার হয়, প্রাণদণ্ড। হাইকোর্টে আপিলের তারিখ ৬ই জুলাই, দণ্ডাদেশ বহালের রায় বার হয় ১৩ই জুলাই। ১১ই আগস্ট, ভোর ছ'টায় মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির অব্যবহিত পরে একাধিক গান রচিত হয়, তার একটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে, 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। ব্রিটিশ সরকার গানটি হুকুম জারি করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল কিনা জানা নেই, তবে ১৯৪৭ সালের আগে প্রকাশ্য মুদ্রণেরও কোনো উদাহরণ নেই। গানটির নিষিদ্ধকরণ, রচনার কাল ও জনপ্রিয়তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় অন্য একটি খবর থেকে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর এক রকম স্বদেশী ধুতি বাজারে বেরোয় যার পাড়ে বুনে লেখা থাকত 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। ১৯১০ সালের ১২ই মার্চ সরকারি আদেশে এই ধুতির পাড় নিষিদ্ধ করা হয়।[১]

বাংলা ভাষাভাষী সমস্ত অঞ্চলে গানটি জনপ্রিয় হয় মূলত শহীদ-গীতি (martyrs' song) রূপে, যা আজও অব্যাহত, এবং যে রূপে অবাঙালি সংগ্রামীরাও একে গ্রহণ করেছেন।[২] পরবর্তীকালে বাঙালি ঐতিহাসিক, যাঁরা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেছেন, গানটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় মানসিকতার রূপ বোঝাতে এর উল্লেখ করেছেন।[৩]

গানটির আদি পাঠ কী ছিল, তা আজ নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় নেই। মুদ্রিত পাঠের অনুপস্থিতি, অপরদিকে লোকমুখে বিস্তার— ফলে প্রচুর সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেছে, এবং সে জন্য যতগুলি মুদ্রিত পাঠ আজ লভ্য, তার একটির সঙ্গে অপরটি হুবহু মেলে না। গানটির উপজীব্য একটি বাস্তব ঘটনা। গানের প্রথমাংশে সেই ঘটনার বর্ণনায় কোনো পাঠে 'ভুল' তথ্য বেশি, কোনো পাঠে তার বিপরীত। কেন এমন ঘটেছে তার কারণ অনুমানের চেষ্টা করা হয়েছে। গানের দ্বিতীয়াংশে পুনর্জন্মের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি, তার যুক্তি ভিন্নতর হলেও অঙ্গাঙ্গী হওয়ার কারণে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। সকল পাঠের উল্লেখ স্থানাভাবে অসম্ভব, তাছাড়া প্রয়োজনও নেই। প্রতিপাদ্য প্রমাণের জন্য আমরা চারটি পাঠ ব্যবহার করব, প্রথমটি গ্রামোফোন রেকর্ডের, প্রকাশকাল নভেম্বর, ১৯৪৭,[৪] দ্বিতীয়টি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের।[৫] ১৯৪৭ সালে, ভারতের স্বাধীনতালাভের বছর, রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা দূর হওয়াতে প্রথম সুযোগেই বহু পুস্তক-পত্রিকায় বিভিন্ন পাঠে গানটি প্রকাশিত হয়।

(প্রথম)

এবার বিদায় দে মা ঘুরে' আসি ॥
হাসি' হাসি' পরবো ফাঁসি
দেখবে জগৎবাসী ॥

ওমা কলের বোমা তৈরী করে'
বসেছিলাম লাইনের ধারে
লাট ম'লোনা বিফল হোলো
ম'লো ভারতবাসী ॥

হাতে যদি থাকতো ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পড়তো ধরা (মা গো)
আমি রক্তমাংস এক করিতাম
দেখতো ইংলন্ডবাসী ॥

ওমা শনিবার দিন বেলা দুটোতে
লোক ধরে না হাইকোর্টেতে
অভিরামের দ্বীপ দ্বীপান্তর মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ॥

ওমা, দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নেব মাসির ঘরে
চিন্‌তে যদি না পারিস্‌ মা
দেখবি গলার ফাঁসি ॥

(দ্বিতীয়)

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
শনিবার দিন ১০টা বেলা
হাইকোর্টেতে গেল জানা
(ওমা) অভিরামের দ্বীপ চালনা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি।

(ওমা) কলের বোমা তৈরী করে
দাঁড়িয়েছিলাম লাইনের ধারে
(ওমা) বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ভারতবাসী।

হাতে যদি থাকতো ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পড়ত ধরা
(ওমা) রক্তমাংসে এক করিতাম
দেখতো ইংলন্ডবাসী ॥

থাকতো যদি মা টাট্টু ঘোড়া
ক্ষুদিরাম কি পড়তো ধরা
(ওমা) এক চাবুকে চলে যেতাম
গয়া গঙ্গা কাশী।

বেলা ১০টা বেজে গেল
ফাঁসির হুকুম জারি হোল
(ওমা) হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখুক ভারতবাসী।

১০ মাস ১০ দিন পরে
জন্ম নিব খুড়ির ঘরে
চিনতে যদি না পারিস্‌ মা
গলায় দেখিস ফাঁসি।

(ওমা) মনের দুঃখ মনে রইল
আমার হোল না স্বদেশী।
কাচের বাসন কাচের চুড়ি
প'রনা মা বিলাতি শাড়ী
এ মিনতি করি মাগো
ভুলো না স্বদেশী।

বিবৃত ঘটনাগুলিকে যে ক্রমে সাজানো যায়, ক) বোমা তৈরি, হত্যার চেষ্টা ও বিফল হওয়া, খ) অস্ত্রের অভাবে গ্রেপ্তার হওয়া, গ) দণ্ডাদেশ ও ঘ) পুনর্জন্মের প্রতিশ্রুতি। দ্বিতীয় পাঠের ঘটনাপরম্পরা একটু এলোমেলো, প্রথমেই দণ্ডাদেশ যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে পঞ্চম স্তবকে, ধৃত হওয়ার কারণ অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছে— অস্ত্রের অভাবের সঙ্গে যোগ হয়েছে বাহনের অভাব। বিদেশী পণ্য বর্জনের আহ্বান স্থান পেয়েছে শেষ স্তবকে। দ্বিতীয় পাঠ আকারেও বড়, অবশ্য রেকর্ডের সময়সীমা প্রথম গানটিকে সংক্ষিপ্ত করে থাকতে পারে। হাল আমলে 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' চলচ্চিত্রে যে গানটি ব্যবহৃত, তারও পাঁচটি স্তবক। একটি সামান্য হেরফের (শনিবার স্থলে 'শনিবারের') ও কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ ব্যতীত হুবহু একই পাঠ বিনা সূত্র-নির্দেশে আরও সাম্প্রতিক একটি সংগীত-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৬]

(তৃতীয়)

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
(আমি) হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী ॥

কলের বোমা তৈরি করে
দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে (মা গো)
বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম
আর এক ইংলন্ডবাসী ॥

শনিবার বেলা দশটার পরে
জজ কোর্টেতে লোক না ধরে (মা গো)
হলো অভিরামের দ্বীপচালান মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ॥

বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি
রইল মা তোর ব্যাটা-বেটি (মা গো)
তাদের নিয়ে ঘর করিস মা
বৌদের করিস দাসী ॥

দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নিব মাসির ঘরে (মা গো)
ও মা তখন যদি না চিনতে পারিস
দেখবি গলায় ফাঁসি ॥

বিভিন্ন পাঠে প্রদত্ত তথ্যগুলির সত্যাসত্য ও তাৎপর্য বিচার করে দেখা যেতে পারে। তিনটি পাঠেই আছে 'কলের বোমা', আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দের তৎকালীন গুরুত্ব বোঝা শক্ত। ব্রিটিশ রাজপুরুষ হত্যার উদ্দেশে বোমার ব্যবহার বাঙালি

বিপ্লবীরাই প্রথম শুরু করে, তা ট্রেন ধ্বংসকারী বিস্ফোরক হিসাবেই হোক বা হাতবোমা হিসাবেই হোক। কার্যকরী ক্ষেত্রে হাতবোমা রূপে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লের দ্বারাই তার প্রথম প্রয়োগ। অচিরে এই অস্ত্রের ব্যবহার এমন বিশিষ্টতা অর্জন করে যে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ও বোমা প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রশক্তি-বিরোধী আন্দোলন ও তাতে প্রধান-ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রায়শ একীকরণ ঘটে, যেমন আজকের 'সন্ত্রাসবাদ' ও এ-কে সাতচল্লিশ। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগ তাই 'বোমার যুগ', বা সরকার-বিরোধী ষড়যন্ত্র মামলাগুলি 'বোমার মামলা' নামে অভিহিত।[৭]

বোমা ব্যবহারে অসফলতার হার ও তার সীমিত শক্তি দেখে পরবর্তীকালে বাঙালি বিপ্লবীরা একে বর্জন করেন অথচ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তখনও এই অস্ত্র সম্বন্ধে এতই সম্মোহন, যে তাঁরা অন্য অস্ত্রের কথা ভাবতেই পারছিলেন না। বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন,

> "বোমার কথা। বোমার কি বিমোহিনী শক্তি! রুশদেশের নিহিলিস্টদের কর্মতৎপরতার অনুকরণে এদেশে বোমা আমদানি হয়··· এদেশের অভিজ্ঞতা কিন্তু বোমা-নিক্ষেপে বোমার শিকার প্রায়ই অক্ষত থেকে গেছে। শিকারী স্বয়ং বা অপর নিরপরাধী লোক শাস্তি ভোগ করেছে। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আমাদের বিপ্লবী অভিযানে এটিকে বর্জন করা হবে। এই সিদ্ধান্তে আমরা দৃঢ়ভাবে স্থির ছিলাম। কিন্তু বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের প্রতিনিধিরা বোমা পাওয়া যাবে না জেনে বিমর্ষ হন। কারণটা জানিয়ে দেওয়ায় তাঁদের মন তখনই ভরল না। তাঁরা প্রতিবাদে জানালেন— বাংলার বোমার নামে এত আকর্ষণী শক্তি যে, বাংলায় আমরা তা আন্দাজ করতে পারি না বা পারছি না। আমরা তাঁদের 'মশার পিস্তল' দিতে চাইলেও রডার লুণ্ঠিত মালের আকাশ-ফাটা নাম তাঁদের মনে রেখাপাত করতে পারছিল না।"[৮]

ইতিপূর্বে যে একীকরণের কথা বলেছি দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন ও বোমা তার একটি ক্লাসিক উদাহরণ। অন্যান্য প্রদেশবাসীর কাছে হত্যা-প্রচেষ্টার সাফল্য গৌণ হয়ে বোমার ব্যবহারই মুখ্য হয়ে উঠেছে কারণ, তাঁদের ধারণা, ব্রিটিশ-বিরোধী হিংসাত্মক আন্দোলনের তাঁদের দেশে সূচনা হবে কেবলমাত্র বোমার ব্যবহারেই। বোমা প্রায়ম্ভেই প্রাতিষ্ঠানিক তাৎপর্য অর্জন করে, বালগঙ্গাধর তিলক 'কেশরী' পত্রিকার ১৯০৮, ২৬শে মে'র সংখ্যায় লিখলেন 'Philosophy of the Bomb', বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরে বিপিনচন্দ্র পাল ইংলন্ডে গিয়ে লিখলেন 'Etiology of Bomb'।[৯]

তৎকালে ভারতীয়রা সাধারণভাবে যে সব অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিল, এই বোমা ছিল তার থেকে আলাদা। ধাতব খোলে বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহৃত হত পিকরিক অ্যাসিড। বোমাকে 'কলের' এইজন্যই বলা হয়েছে।

দুটি পাঠে বলা হয়েছে ক্ষুদিরাম অপেক্ষা করেছিলেন 'লাইনের ধারে', 'লাইন' নিঃসন্দেহে রেললাইন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যখন পথের ধারে অপেক্ষা করেছিলেন,

তখন 'লাইন'-এর প্রসঙ্গ এল কেন? কিংসফোর্ড-হত্যাপ্রচেষ্টার মাত্র মাস পাঁচেক আগে ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর স্পেশাল ট্রেনে বেঙ্গল-নাগপুর লাইনে যাচ্ছিলেন লেফটেনান্ট গভর্নর। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের দলের উদ্যোগে মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে রাত প্রায় তিনটের সময় প্রবল বিস্ফোরণে লাইন উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং গাড়ি লাইনচ্যুত হওয়া থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পায়। সংবাদপত্রে ও লোকমুখে বহুল প্রচারিত এই ঘটনার স্মৃতিই সম্ভবত অনুপ্রাণিত করেছে 'পথ'কে 'লাইন'-এ পরিবর্তিত করতে। অর্থাৎ এই ঘটনার ফলে একটা বিশ্বাসের ছবি তৈরি হয়েছে যে বিপ্লবীদের দ্বারা লাটসাহেবদের হত্যা-চেষ্টার ঘটনাস্থল হবে রেললাইন।

ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লের আক্রমণের লক্ষ্য বলা হয়েছে 'লাট' কিংবা 'বড়লাট' অথচ কিংসফোর্ড ছিলেন জেলা ও দায়রা বিচারপতি। ভ্রমবশত যাঁদের মৃত্যু ঘটল তাঁদের পূর্বতন দুটি পাঠে বলা হয়েছে 'ভারতবাসী', আধুনিক পাঠে 'ইংলন্ডবাসী'। 'ভারতবাসী' অবশ্যই ভুল, কিন্তু তাতে যদি কেউ সহানুভূতির রেশ পান, তাঁকে মনে রাখতে হবে এঁরা মহিলা, যাঁরা বিপ্লবীদের কাছে অবধ্য, তারও কোনো উল্লেখ নেই।

ক্ষুদিরাম যখন গ্রেপ্তার হন তখন তাঁর কাছে রিভলবার ছিল কিন্তু তা ব্যবহারের সুযোগ তিনি পাননি। অথচ দুটি পাঠে অস্ত্রের অভাবই তাঁর ধরা পড়ার কারণ, এবং সামান্যতম অস্ত্র থাকলেও তিনি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হতেন না এমন বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বাহনের অভাব। কলকাতায় আধুনিক বাইসাইকেলের আবির্ভাব ১৮৮৯ সালে, তবু লক্ষণীয়, বাহন হিসাবে ঘোড়ার কথাই বলা হয়েছে।

মামলার রায় দেওয়ার দিন নিয়ে তিনটি পাঠে মতভেদ নেই, শনিবার, কিন্তু হাইকোর্ট না জজকোর্ট তা নিয়ে সংশয় আছে, যেমন সংশয় আছে বেলা দশটা না দুটো? ক্ষুদিরামের দায়রা কোর্টের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়, দেখা যাচ্ছে গীতিকার হাইকোর্টের রায়ের দিনটিকে গুরুত্ব দেননি। কারণ, দায়রা আদালতের রায় বার বার হয় ১৯০৮, ১৩ই জুন, শনিবার, এবং হাইকোর্টে দণ্ডাদেশ বহাল থাকার রায় বার বার হয় ১৯০৮, ১৩ই জুলাই, সোমবার। শনিবার হিন্দু সংস্কারে অশুভ বার, এবং সেই বারে দ্বিপ্রহরের পর বারবেলা, অমঙ্গলজনক কাল, সে কারণেও শনিবার বেলা দুটোর কথা বলা হয়ে থাকতে পারে।

তিনটি পাঠেই অভিরাম প্রসঙ্গ আছে, এই গানের সর্বাপেক্ষা অলীক অংশ। বলা বাহুল্য অভিরাম নামে কোনো চরিত্র এই ঘটনায় অংশ নেয়নি, এমনকি অন্য কোনো অভিযুক্ত বা সাক্ষীর নামও অভিরাম নয়, ক্ষুদিরামের সহযোগীর নাম প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশ চন্দ্র রায়, তাঁরও স্বীপান্তর দণ্ড হয়নি, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

মনে রাখা দরকার ১৯০৮, ৩০শে এপ্রিল থেকে ১১ই আগস্টের ঘটনাবলী ভারতের অধিকাংশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে বিস্তারিত খবর ছাপা হয় পূর্ব ভারতের কাগজগুলিতে। ক্ষুদিরাম ও মামলা সংক্রান্ত খবর তো বটেই, এমনকি ক্ষুদিরামের সহযোগী, যাঁর মৃতদেহের ছবি দেখে ক্ষুদিরাম শনাক্ত করেন দীনেশ চন্দ্র

রায় বলে, যাঁর আসল পরিচয় পুলিস আঁচরেই জানতে পারে, সেই প্রফুল্ল চাকীর স্বনাম ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী অমৃতবাজার পত্রিকার ১৯০৮, ৩০শে মে'র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

তাহলে কেন এই অলীক তথ্যের সমাবেশ? প্রথম সওয়াল, গীতিকার সঠিক ঘটনা জানতেন না। এ-যাবৎ কাল সর্বত্র লেখা হয়েছে গীতিকার অজ্ঞাত, তবে তিনি পল্লীকবি বা লোকগীতিকার, এমন মন্তব্য কেউ কেউ করেছেন। নামোল্লেখের উদাহরণ মাত্র একটি, সাম্প্রতিক কালে লোকসংগীত-সংগ্রাহক ও গবেষক রণজিৎ সিংহ বাঁকুড়ার বাউল নিতাই দাসের আখড়ায় বাউল দীনবন্ধু দাসের এক সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে বলেছেন,

"ক্ষুদিরামের ফাঁসির ঘটনা সমস্ত দেশকে তোলপাড় করেছিল। লোককবি সে ঘটনাকে কাব্যের বিষয় মনে করলেন। বাঁকুড়ার পীতাম্বর দাস লিখলেন সেই অবিস্মরণীয় গান :

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

প্রশ্ন উঠল, সুরটা কিরকম হবে? সবাই বললেন, দেশী সুর হওয়া চাই। মাটির সুর হওয়া চাই। তখন বাউলদের গৌরচন্দ্রিকা, একবার এস গৌর দিনমণি, গানের সুর তাতে বসিয়ে দেওয়া হল।"[১০]

সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এমনকি হুজুক, গুজব নিয়ে গান রচনার রীতি বেশ পুরনো।[১১] গায়ক-ভিক্ষুক, লোকসঙ্গীত গায়ক প্রভৃতির মাধ্যমে এই গানগুলি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত। এখনও এই রীতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। যেহেতু পুরোপুরি মৌখিক-মাধ্যমে গানগুলির প্রচার ঘটে, সেজন্য একই গানের একাধিক পাঠের সন্ধান মেলে।

ক্ষুদিরামের গানের রচয়িতা একজন পল্লীকবি, যে কারণেই হোক না কেন, সম্পূর্ণ তথ্য তাঁর কাছে পৌঁছয়নি— এই সব অনুমান আলোচনার খাতিরে আপাতত স্বীকার করে নিলেও একটি প্রশ্ন অনুত্তর থেকে যায়, গীতিকারের কল্পিত কাহিনী কেন ওই বিশেষ রূপটি নিল?

পরা-আখ্যান বা মেটা-ন্যারেটিভের কতকগুলি ছক থাকে, দেশজ, ঐতিহ্যগত উপাখ্যান-গুলি একাধারে তার উপাদান ও প্রমাণ। অতিকথা বা মীথের অন্যতম বড় নিয়ন্ত্রক উদ্দেশ্য, তথাপি তার নির্মিতি ওই ছকগুলির বাইরে যেতে পারে না। ক্ষুদিরামের গানের বক্তব্য যদি এই আদলে দেখি, দাঁড়ায়— ক্ষুদিরাম কিশোর বালক, সে মারতে যাচ্ছে দুষ্টদের প্রধানকে। প্রধানই অন্যায়কারীর শক্তির চূড়ান্ত রূপ, বিপক্ষে অত্যাচারিতরা দুর্বল তাই তাদের প্রতিনিধি নিঃসহায় কিশোর। ডেভিড ও গোলিয়াথ, বালক কৃষ্ণ ও কংস। বৈপরীত্যের চরম রূপ ফোটাতেই শকটারোহী বড়লাট আর পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা দুই কিশোর। কেমন করে এমন শক্তিমান শত্রু নিধন করতে পারে তারা? তাই মামুলি অস্ত্রের বদলে অজানিত-শক্তি সম্পন্ন নতুন অস্ত্র থাকে তাদের হাতে, কলের বোমা। তাদের প্রচেষ্টা বিফল হয়, লক্ষণীয়, অস্ত্র ব্যর্থ

হয় না। কিন্তু শত্রু বেঁচে যায়। এ ঘটনাও নতুন নয়, মেঘের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে, নিদ্রাবাণ নিক্ষেপ করে, মায়াজাল বিস্তার করে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে শত্রুদের আমরা বার বার বাঁচতে দেখেছি। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ত না, যদি তার কাছে অস্ত্র থাকত। রূপকথার রাজকুমারকে বাঁচায় তার পক্ষীরাজ ঘোড়া, রাণা প্রতাপকে প্রাণ দিয়ে বাঁচায় প্রভুভক্ত চৈতক। হায়, তার বাহনও ছিল না। এবারে বিচারের পালা। ক্ষুদিরাম ও তার সহযোগী অভিরাম অভিযুক্ত। অতিকথায় যুগল-নায়করা আমাদের অপরিচিত নয়, তাদের আর্কেটাইপাল ইমেজ ঘুরে ফিরে আসে। তাই কানাই-বলাই, নিমাই-নিতাই, জগাই-মাধাইয়ের মতো ক্ষুদিরামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে তার নাম রাখা হয়, অভিরাম। শনিবারের মতো অশুভ, অমঙ্গলকর দিনে দণ্ডাদেশ হয়। যুগল নায়কত্ব হলেও দুজনের গুরুত্ব সমান হয় না, কৃষ্ণ-বলরামের কৃষ্ণের মতো একজন হয় মূল নায়ক। ক্ষুদিরামই এখানে মূল নায়ক, তাই সবথেকে গৌরবজনক, সর্বত্যাগী আত্মোৎসর্গের দণ্ড জোটে তার ভাগ্যে, অভিরাম অপ্রধান নায়ক, তাই তার হয় দ্বীপান্তর।

অতিবৃত্তান্ত কথন এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু তাহলে নির্দিষ্ট সমাপ্তি ঘটে না, বা বলা উচিত বৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই ক্ষুদিরাম বলে যায় সে আবার জন্মগ্রহণ করবে। ধর্মীয় নেতৃত্বের উত্তরাধিকারীর মতো, অবতার পুরুষের মতো সে বহন করবে দৈহিক চিহ্ন, ফাঁসির দাগ, যা দেখে শনাক্ত করা যাবে তাকে। কিন্তু কেন ফিরে আসবে সে? কারণ তার ঈপ্সিত কাজ শেষ হয়নি, দুষ্টদলন, শত্রুনিধন যে এখনও বাকি।

একেবারে শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বিদেশী পণ্য বর্জনের আহ্বান। তাকে শুধুমাত্র শহীদ কিশোরের শেষ অনুরোধ ভাবা ভুল হবে। এতক্ষণে ক্ষুদিরাম লৌকিক স্তর থেকে উত্তীর্ণ, তার মিনতিরও অনুরোধের স্তর থেকে উত্তরণ ঘটেছে, তাকে লঙ্ঘন করার সাধ্য কারোর নেই। অনিবার্য ফলদায়ী জেনেই এই প্রচারের অবতারণা।

নিকট-অতীতের ঘটনা কেমন করে পুরাকথার বুনোটে বোনা হয়, বাস্তব ঘটনার বর্ণনে কেমন করে অবাস্তব, অলীক উপাদান কোনো স্থির পরিকল্পনা, ছক মেনে ঢুকে পড়ে, তার কিছুটা অনুমান করা যাচ্ছে। সে প্রক্রিয়ার সঙ্গে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য জানা বা না-জানার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ রচয়িতা 'অশিক্ষিত' পল্লীকবি হওয়ার সম্ভাবনা এইজন্য প্রবল নয় যে তিনি খুঁটিনাটি তথ্য জানেন না। বরং এই কারণে যে, তথ্যানুসারী হওয়ার বাধ্যবাধকতা 'শিক্ষিত'জনেরই থাকে, যাতে, তাঁদের ধারণা বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতায় বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে, বিশ্বাস ও তথ্য যে পারস্পরিক নির্ভরশীল নয়, এ তথ্য তথাকথিত অশিক্ষিতদের খুব ভালো করেই জানা, তাঁরা এটাও জানেন যে বার বার পুনরাবৃত্ত ছক অনেক দ্রুত সাধারণজনের ধারণাক্ষম হতে পারে, পৌঁছতে পারে তাঁদের বিশ্বাসের বৃত্তে।

উপাদানের মতো গানটির গঠনেরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা চোখ এড়ায় না।

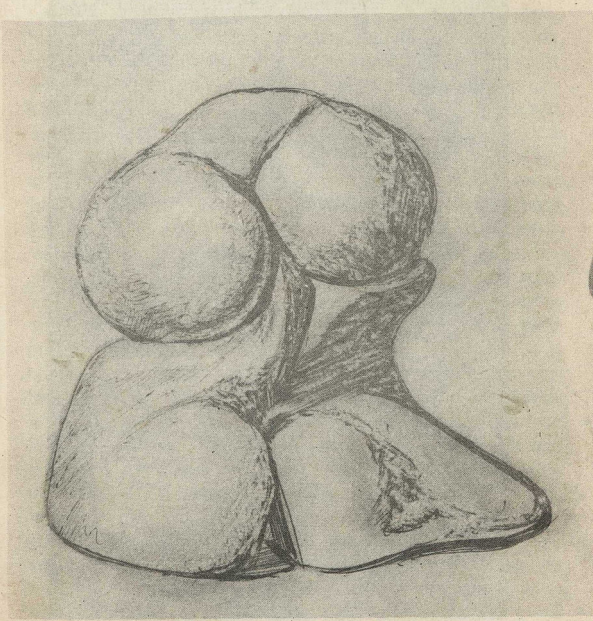

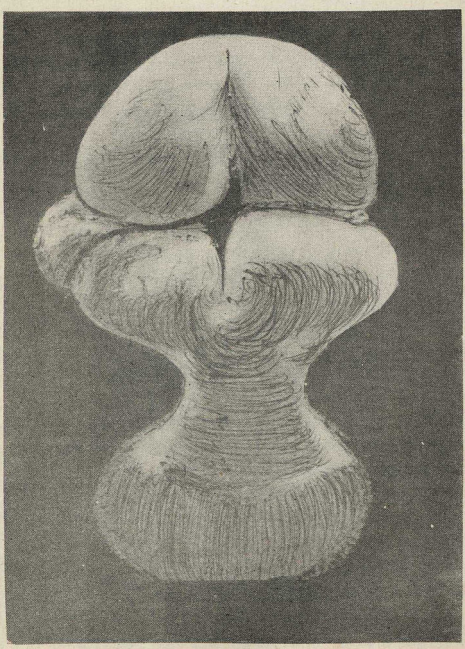

প্রথমত, কাব্যরূপে। দূর-অতীতের অতিকথা অনায়াসে গদ্যরূপে নিতে পারে, বিচ্যুতি-অতিরঞ্জনের সুযোগ-সম্ভাবনা থাকলেও শুরু-ঘটনা-সমাপ্তির কাঠামো একেবারে বাঁধাধরা, কথকের পক্ষে তার ব্যত্যয় ঘটাবার সুযোগ নেই। কিন্তু নিকট-অতীতের ঘটনা গদ্যরূপে অতিকথার চেহারা নিতে গেলে তাকে সত্য-মিথ্যার মিশাল দেওয়া গুজবই বলতে হবে। অথচ একই বৃত্তান্ত কাব্যরূপে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে। আলোচ্য ক্ষুদিরাম কাহিনীকে গদ্যে রূপান্তরিত করে তার বিস্তারের একটি কাল্পনিক অবস্থা ভাবলে এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা কিছুটা বোঝা যাবে।

গানটি ভণিতাবিহীন, অর্থাৎ গীতিকারের নাম জানা যাচ্ছে না। তার কারণ, আত্মগোপনের প্রয়াস হতে পারে, তাৎপর্য আরও কিছুটা বেশি। গান পূর্বকালে মৌখিক-বিস্তৃতি নির্ভর ছিল বৃহদংশে, অর্থাৎ গানটি প্রচারিত হত মূলত গায়নের মাধ্যমে এবং ভণিতা-অংশ দ্বারাই গীতিকার তাঁর ব্যক্তিগত স্বীকৃতি লাভ করতেন। ভণিতা প্রয়োজনীয়, তবু তাকে গানের সঙ্গে জুড়তে পারম্পর্য, প্রাসঙ্গিকতার দরকার হয়। ভণিতা শুধু নাম জানায় না, তার মাধ্যমে গীতিকার স্বয়ং, গানের বক্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যান, যেমন রামপ্রসাদ সেন 'শ্যামা মা উড়াচ্ছো ঘুড়ি' গানে "প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি / ভব সংসার সমুদ্র পাড়ে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি" বা কুবীর কবিদার 'ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন' গানে "ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙে, চালায় আবার সে কোন জন / কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাবো গুরুর শ্রীচরণ"। আধুনিক রাজনৈতিক, দেশাত্মবোধক গানেও তাই, বরং আরও প্রকট, মুকুন্দদাস 'ভয় কি মরণে' গানে বলেন "লইয়ে কৃপাণ, হও আগুয়ান / নিতে হয় মুকুন্দেরে নিও গো সঙ্গে"। শিরোনামযুক্ত (প্রথমে কবিতা, পরে সুরারোপিত) বা বিহীন গানের মুদ্রিত রূপের যে 'নৈর্ব্যক্তিক' চেহারা আমরা দেখি, যাতে কবির বা গীতিকারের নাম পৃথক-ভাবে মুদ্রিত, তা অনেক হাল আমলের। ক্ষুদিরামের গানকে ভণিতাবিহীন অবয়ব দেওয়ার জন্যই গানটি প্রথম পুরুষে বর্ণিত, এমনও হতে পারে।

আবেগময় রূপ উত্তম পুরুষের জবানীর আর এক সম্ভাব্য কারণ। বাঙালির কাছে বিদায়, বিসর্জন। বড় আবেগমথিত, অশ্রুদীর্ণ তার রূপ। শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁদিয়ে নিমাই চলে যান চিরকালের মতো, বৎসরান্তিক ক্রন্দনে মণ্ডপ শূন্য করে বিজয়াদশমীর দিন দুর্গা বিদায় নেন। কান্না বার বার ফিরে আসে অবধারিত বিচ্ছেদে, তাই বিষ্ণুপ্রিয়া গায় 'শচীমাতা গো, আমি চার যুগে হই জনম দুখিনী'। নিশ্চিত অকালমৃত্যু যার জন্য অপেক্ষমাণ, সেই মাতৃহীন কিশোরের নিজের মুখের কথায় শেষ বিদায় আরও মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

তথ্যের অভ্রান্ততা বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়, এ ধারণার কথা আমরা আগে বলেছি। তারই হাত ধরে আসে আর এক ধারণা, বক্তব্যের পক্ষে দূর-প্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য শুধু সঠিক হওয়ার কারণে গুঁজে দেওয়া যায়। অর্থাৎ প্রাসঙ্গিকতাটা খুব বড় ব্যাপার নয়, একটা সম্পর্ক থাকলেই চলে, কিন্তু তথ্যটা সঠিক এবং সেই কারণে তাকে

আখ্যানে স্থান দিলে আখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। ক্ষুদিরামের গানের তৃতীয় পাঠে 'মা' কোনো আড়াল না রেখে দেশমাতায় পরিবর্তিত হন, তেত্রিশ কোটি বারো লক্ষ ভারতবাসীকে তাঁর পুত্রকন্যা বলা হয়। বৃহৎ সংখ্যার ধারণা অস্পষ্ট হতে পারে, যেমন 'লক্ষ লক্ষ', 'কোটি কোটি', হতে পারে স্পষ্ট, যেমন 'সপ্ত কোটি' বা সুস্পষ্ট, যেমন '২৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬৯ হাজার', কিন্তু 'শিক্ষিত' জনের পছন্দ সুস্পষ্টতা কারণ তাকে সঠিকত্বের সঙ্গে সমার্থক ভাবা হয়। সচেতনভাবে সঠিকত্ব বজায় রাখা হয়। ১২৮১ সনে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির জনসংখ্যা লিখেছেন ছয় কোটি[১২], তার ছয় বছর পর 'আনন্দমঠ'-এ লিখলেন "সপ্ত কোটি কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ-করালে।"[১৩] আমার ধারণা ক্ষুদিরামের গানে 'বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি...' ইত্যাদি স্তবকটি পরবর্তীকালের সংযোজন। উপরিল্লিখিত কারণে তো বটেই, তাছাড়া ১৯০১ সালের জনগণনায় ভারতের মোট জনসংখ্যা নির্ণয় হয়েছিল ২৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৫৬ জন।[১৪]

ক্ষুদিরামের গানে এমন খণ্ড-বিচ্ছিন্ন 'সঠিক' সংযোজন ছাড়াও পরবর্তীকালে কৃত শিক্ষিতজনের ঢালাও সংস্কারকর্মের নমুনাও আছে, যাতে তথ্যগত ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা স্পষ্ট। তাগিদ একই, 'সঠিকত্ব'।

(চতুর্থ)

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী ॥
পাটের বোমা তৈরি করে,
দাঁড়িয়েছিলাম গাছটি ধরে,
(মা গো) জজসাহেবকে মারব বলে, মারলাম (দুই) নির্দোষী ॥
হাতে যদি থাকত ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পড়ত ধরা
রক্তে হত ছড়াছড়ি (মা), দেখত ভারতবাসী ॥
শনিবার দুটোর সময়
পুলিশ কোর্ট হল লোকময়,
জজ-ম্যাজিস্টর বিচার করে, রায় দিল (মা)
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ॥
কাঁচের বাসন, কাঁচের চুড়ি,
পরো না মা বিলাতি শাড়ি,
(মা গো) মনের দুঃখ রইল মনে,
হলো না মোর স্বদেশী ॥
দশমাস দশদিন পরে,
ক্ষুদিরাম তোর আসবে ফিরে, (মা গো)
(তখন) যদি না চিনতে পারো মা,
দেখবে গলার ফাঁসি ॥[১৫]

এই পাঠটি মূলে নয়, তার পরবর্তীকালে সংশোধিত রূপে, এমন অনুমানের কারণ কী? প্রধানত 'কলের বোমা'-র বদলে 'পাটের বোমা' শব্দ ব্যবহার। কারণ, 'কলের বোমা' বিপ্লবীদের দ্বারা বর্জিত হওয়ার পর বিস্মৃতিতে হারিয়ে যায়। তার অনেক পরে আসে 'পাটের বোমা' অর্থাৎ আর্সেনিক সালফাইড ও পটাশিয়াম ক্লোরেটের মিশ্রণ, পাটের রশি দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা। ক্ষুদিরাম 'পাটের বোমা' ব্যবহার করেননি, বলাই বাহুল্য। ক্ষুদিরাম নিরস্ত্র অবস্থায় ধরা পড়েন, তথ্যগত এই ভুলটি ছাড়া অন্য ভ্রান্তি কিছু নেই। লাটসাহেবের পরিবর্তে 'জজসাহেব', ভারতবাসী স্থলে 'নির্দোষী', অভিরামের অনুল্লেখ ইত্যাদি তার প্রমাণ। অনুমান 'লাটসাহেব, ভারতবাসী'-র মতো 'কলের বোমা'কে ভুল ভেবেই সংশোধন করা হয়েছে। সংস্কারকর্তা খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কত ওকিবহাল ছিলেন তার প্রমাণ পথ বা লাইনের পরিবর্তে গাছটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকার উল্লেখ। ক্ষুদিরামের মামলায় এই গাছ প্রসঙ্গ অনেক বার এসেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ক্ষুদিরাম দুটি জবানবন্দী দেন, প্রথমটি এইচ. সি. উডম্যানের কাছে ১৯০৮, ১লা মে, দ্বিতীয়টি ই. ডব্লু. বার্থউডের কাছে ২৩শে মে তারিখে। প্রথম জবানবন্দীতে তিনি বলেন একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁরা কিংসফোর্ডের অপেক্ষায় ছিলেন। দুজনের পায়েই জুতো ছিল কিন্তু বোমা ছোঁড়ার আগে গাছতলায় তাঁরা জুতো ছেড়ে রেখে যান। দ্বিতীয় জবানবন্দীকালীন তাঁকে ঘটনাস্থলের একটি নকশা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, গাছটি কোথায়? ক্ষুদিরাম নকশায় গাছ ও গাছের নিচে জুতো রাখার স্থানটি চিহ্নিত করেন।

কালসীমার দিক থেকে আলোচ্য গানটি নিশ্চয় প্রাক-মুদ্রণ বা প্রাক-এনলাইটেনমেন্ট যুগের নয়। কিন্তু পুরোপুরি সেই আবহটাই গানে উপস্থিত। বাস্তবকে অতিকথার ছাঁচে ঢালাই করে তাতে চিরন্তনতার স্বাদ এনে দেওয়া, বাড়তি, বেখাপ্পা বাস্তব-অংশটুকু বর্জন করতে যেমন দ্বিধা নেই, তেমনি নিঃসঙ্কোচে ছাঁচ পূর্ণ করতে অন্তর্ভুক্ত হয় নতুন চরিত্র বা অনুপুঙ্খ। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই যেখানে সব থেকে বড় ভূমিকা পালন করে, বাস্তবিকতা ধরতাই মাত্র, মীথ গড়ে ওঠার এমত প্রক্রিয়া, সন্দেহ নেই, মুদ্রণ-পরবর্তী যুগে ইনফরম্যাটিকসের আক্রমণে বিপর্যস্ত। তবু রেশ থেকে যায়। সাম্প্রতিক কালের অনুরূপ একটি গানের বক্তব্য বিচার করলে আমরা দেখব তথ্য জানা থাকলেও কেমন ছাঁচ পাল্টায় না, আধুনিকতার প্রলেপ ভেদ করে উঁকি দেয় আদ্যিকালের পুরাছবি। গানটির বিষয় ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যু, রচয়িতা বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী-বাসিন্দা বাউল গোষ্ঠগোপাল দাস।[১৬]

অক্টোবরের একত্রিশ, উনিশশো চুরাশি
বুধবার দুপুরে হায়রে, কি নিদারুণ খবর পেল ভারতবাসী বেতারে।
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ভারতেরই মাতা,
মতিলাল নেহরুর পুত্র জহরলাল ইন্দিরাজির পিতা।

দেহরক্ষীর গুলির ঘায়ে জ্ঞান হারালেন তিনি,
লক্ষ লক্ষ মানুষ কান্দে এই খবর শুনি।
কেউ বা ভাবে সত্য কথা, কেউ বা ভাবে মিথ্যা রে,
কি নিদারুণ খবর…
সন্ধ্যাবেলা বেতারেতে খবর ভেসে এলো,
প্রধানমন্ত্রী জাতির মাতা চিরবিদায় নিলো।
কোটি কোটি সন্তান কান্দে দিশাহারা হইয়া,
যুগে যুগে এসো তুমি জগতমাতা হইয়া।
তোমার লাগি কান্দে আকাশ, কান্দে পরদেশী,
স্বর্গধামে থাকো মা গো হইয়া ভারতমাতা রে,
কি নিদারুণ খবর…
দুঃখী দেশের সুখের লাগি শপথ নিলেন যিনি,
তার রক্তে হলো রাঙা মোদেরই রাজধানী।
দুঃখী জাতের মনের ব্যথা কে বুঝিবে হেথা,
সত্তর কোটি মানুষ কান্দে আছো তুমি কোথা।
কে বলিবে মোদের কথা গিয়া বিশ্বদরবারে,
কি নিদারুণ খবর…॥

ক্ষুদিরামের গানের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য স্পষ্ট, উভয়েরই কেন্দ্রবিন্দু আত্মবলিদান, তা ফাঁসিকাঠেই হোক বা দেহরক্ষীর গুলিতেই হোক। মিল আরও অনেক, ভণিতা-বিহীনতা, মৃত্যুর পর ফিরে আসার প্রার্থনা, সত্তর কোটি ভারতবাসীর উল্লেখ, ইত্যাদি। কিন্তু বৈসাদৃশ্য আছে, এবং তা আপাত-অস্পষ্ট হলেও সাদৃশ্যের অপেক্ষা গুরুতর। সাল, তারিখ, বার সমেত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি দিয়েছেন, কিন্তু বয়ান ভারতীয় বেতারের। আসল ঘটনার সঙ্গে ভারতীয় বেতার-প্রদত্ত বিবরণের গরমিল ছিল। লক্ষণীয়, গীতিকার প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল তাকে উপেক্ষা করে বেতার-প্রচারিত বয়ান ও জনতার প্রতিক্রিয়াকেই উপজীব্য করেছেন। প্রদত্ত তথ্যের প্রতি তিনি একান্ত বিশ্বস্ত এবং তথ্য জানাচ্ছেন উৎস কী তা জানাবার পর। ঘটনাটি সম্পর্কে তাঁর 'প্রথম অভিজ্ঞতা' অর্থাৎ নিজে যে ভাবে প্রথম জেনেছেন, কেবলমাত্র তাকে অবিকৃতভাবে নথিবদ্ধ করার প্রয়াস ভাবা ভুল হবে, কারণ গীতিকার জানেন তাঁর নিজের আর গানের সম্ভাব্য শ্রোতাদের ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানের কোনো হেরফের নেই। ইলেকট্রনিক মিডিয়া কতটা সর্বগ্রামী জানেন বলেই বেতারে ভেসে আসা খবর শুনে সত্তর কোটি মানুষের ক্রন্দনের অবতারণা। আসলে কী ঘটেছিল সে প্রশ্ন অবান্তর, ক্ষুদিরামের গানের গীতিকার গান শুরু করেছিলেন ঘটনার যে আখ্যান দিয়ে, তার অনুমোদন ছিল। অতিকথার অনুমোদন। গোষ্ঠগোপাল গান শুরু করেন যে

আখ্যান দিয়ে, তারও অনুমোদন আছে, ইলেকট্রনিক মাধ্যম, ইনফোটেকের অনুমোদন। তবু এমন প্রখর বাস্তবজ্ঞানীও ঐতিহ্যানুসারী পুরাতনী অতিকথার ছাঁচ এড়াতে পারেন না। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী আর্কে'টাইপাল ইমেজে পরিবর্তিত হন, 'জাতির মাতা' থেকে 'ভারতমাতা'-য় শেষ নয়, তাঁকে জগতের মাতা হয়ে যুগে যুগে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়। অবশ্যই আর্কে'টাইপালে পেঁছবার একটা বড় দরজা, মৃত্যু। তবু তা দিয়ে এর সবটুকু ব্যাখ্যা হয় না। অতিকথার শিকড় যে কত গভীরে, তাকে সমূলে উপড়ানো যে কত কঠিন, সে কথাই নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। আসলে গানটি সর্বার্থে বর্ণসংকর, মুদ্রণ-পূর্ব আর -পরবর্তী যুগ-বৈশিষ্ট্যের জারজ।

আমরা আগে বলেছি ঐতিহাসিকরা ক্ষুদিরামের গানের কথা উল্লেখ করেছেন। বাস্তবের বিচ্যুতি যাঁদের কাছে সদা পরিত্যাজ্য, তাঁরা অলীক কথায় ভরা এমন গানকে বিনা সমালোচনায় রেহাই দিলেন কেন, সে প্রশ্নের উত্তর আলোচনাসাপেক্ষ।

ঐতিহাসিকের অন্বেষিত সত্য আর অতিকথার সত্য, বলা বাহুল্য এক নয়। যার সত্যতা বার বার যাচাই করে নেওয়া চলে, ঐতিহাসিক এমন সত্যই খোঁজেন। সে সত্য অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ— যা কিছু হতে পারে, কিন্তু চিরন্তনতার হক তার নেই। অপরদিকে অমরত্বের দাবিতেই অতিকথার জন্ম। সে বেঁচে থাকার রস সংগ্রহ করে বিশ্বাসে, বিস্তারে। সমস্যা হচ্ছে অতীতকথা পুনর্গঠনমাণের কাজে কাঁচামাল রূপে প্রায়শ অতিকথা আর ঐতিহাসিক-সন্ধানিত সত্যের দুধে-জলে সহাবস্থান। সত্য উদ্ধারে বদ্ধপরিকর ঐতিহাসিক প্রাথমিক কাজ যা করতে পারেন, অসম্ভবকে ছেঁটে ফেলা। রাজা রইল, রাজ্য রইল, বাদ গেল রাজার পক্ষীরাজ ঘোড়া। অবশিষ্ট অংশ বিতর্কিত তথ্য হয়ে বিশেষজ্ঞ, যতদিন না অন্য উল্লেখ, প্রমাণাদির কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে তা প্রমাণিত সত্য-এর পদে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকের প্রথম পছন্দ ঘটনা আর প্রতিক্রিয়াজনিত কর্ম। অথচ প্রতিক্রিয়ার জন্ম যে মানসিকতায় তার উদ্ভব বিকাশের রূপ অনুসন্ধানে তিনি ততটাই নিরুৎসাহ। বিশ্বাসের শিকড় খুঁজতে তিনি ধর্মীয় বা রাজনৈতিক তত্ত্ব উল্লেখে রাজি কারণ তার দৃঢ়-বিধিবদ্ধ লিপিবদ্ধ পাঠ আছে। কিন্তু যার নেই এমন বিশ্বাসও তো অগুণতি, তাদের জন্য বরাদ্দ উপেক্ষা, অবহেলা।

ক্ষুদিরামের গানের বেলায়ও তাই ঘটেছে। উপরন্তু সেখানে রয়েছে সমান্তরাল তথ্য, যার উৎস ঐতিহাসিকের মনোমতো, কাজেই উল্লেখের বেশি গুরুত্ব তার ভাগ্যে জোটেনি। শিক্ষিতমানস থেকে অভিরামদের নির্বাসন ঘটেছে, সবার অলক্ষ্যে নিঃশব্দে। □

টীকা

১. শিশির কর, ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই, কলিকাতা ১৯৮৮, পৃ. ২৪।

২. "...বিহারের মানুষ বৈকুণ্ঠ সুকুল...দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী বেতিয়ার ফণী ঘোষকে হত্যার অপরাধে ফাঁসির আসামী। ফাঁসির আগের রাতে

বিভূতিবাবু (বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত) ও সুকুলজী ছিলেন কাছাকাছি দুই 'সেলে' যদিও সুকুলজী 'Condemned Cell'-এ থাকার দরুণ তাঁরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলেন না।" বাকিটুকু বিভূতিবাবুর জবানীতে, "হঠাৎ সুকুল ভাঙা বাংলায় বলল, একবার খুদিরামের ফাঁসির গানটা গান না দাদা। সেই— হাসি হাসি পরব ফাঁসি!

"...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুরু করলাম গান···আর-এক খুদিরাম শুনতে চাইছে সেই খুদিরামের গান···। মাঝে মাঝে সুকুলের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি আমার সঙ্গে গাইবার চেষ্টা করছে— গাইছেও।"

(চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ, কলিকাতা ১৩৯২, পৃ. ১৭৮-৭৯।)

শহীদ-গীতি রূপে আজও এর বহমানতার উদাহরণ জাহানারা ইমামের ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদ পুত্র রুমীর স্মৃতিচারণ, "তবু ছেলেরা যুদ্ধে যায়। বেশির ভাগই মাকে লুকিয়ে, বিছানায় পাশ-বালিশ শুইয়ে, রাতের আঁধারে পালিয়ে চলে যায়। মায়ের কান্নাকাটির ভয়ে ব'লে যেতে পারে না। কিন্তু মনে মনে বিদায় চেয়ে নেয় মায়ের কাছ থেকে : একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।" (পৃ. ২৮) "মা রুমীর মাথার কাছে বসে তার চুলে বিলি কাটতে লাগলেন, সাইড-টেবিলে রেডিওটা খোলা ছিল···হঠাৎ কানে এল ক্ষুদিরামের ফাঁসির সেই বিখ্যাত গানের কয়েকটা কলি : একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি ওমা, হাসি হাসি পরবো ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী— রুমী বলল, 'কি আশ্চর্য আম্মা। আজকেই দুপুরে এই গানটা শুনেছি। রেডিওতেই ···আবার এখনও— একই দিনে দু'বার গানটা শুনলাম। না জানি কপালে কি আছে!" (পৃ. ৪৬) "কেন যুদ্ধ হয়? কেন মায়ের বুক খালি করে ছেলেরা যুদ্ধে যায়? কেন হাসি হাসি মুখ করে ছেলেরা বলে 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি?'" (পৃ. ৫৯)।

(জাহানারা ইমাম, বিদায় দে মা ঘুরে আসি, ঢাকা ১৯৯২।)

৩. ক্ষুদিরামের গানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, দু'রকমেরই উল্লেখ আছে,

"বাঙলার শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামান্তরে কত গান রচিত হল এই কিশোর বীরের উদ্দেশ্যে স্তুতি ও বন্দনা জানিয়ে। কত চারণ গেয়ে গেলেন সে-সব গান। পথের ভিখারীর কণ্ঠে আজও শুনি : একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।" (ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব, পৃ. ৫৬)। "Terrorist heroism evoked tremendous admiration from very wide circles of educated Indians and sometimes from others, too — a street beggar's lament for Khudiram for instance, could still be heard in Bengal decades after his execution" (Sumit Sarkar,

Modern India 1885-1947. p. 124). "Another revealing fact was the universal sympathy felt for the revolutionaries. The accused in the Alipore Conspiracy Case was regarded as martyrs and those like Profulla Chaki and Khudiram who had lost their lives became heroes of folk songs sung all over the country. Even professional beggars substituted these for their traditional religious songs..." (R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*. Vol. II. p. 260).

৪. কলাম্বিয়া রেকর্ড নং GE. 7148, গায়ক তারা ভট্টাচার্য্য। রেকর্ডটির একপিঠে 'একবার বিদায় দে মা', শিরোনাম '(ক্ষুদিরামের গান)', অপর পিঠে 'হাসি মুখে ফাঁসি বরণ করেছ সেদিন অবহেলায় / বীর ক্ষুদিরাম, লহ গো প্রণাম ভুলিনি মোরা তোমায়'। গীতিকার রমেন চৌধুরী, সুরকার কালোবরণ দাস—বলা বাহুল্য দ্বিতীয় গানের।

৫. গোপাল ভৌমিক, বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ্ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী, কলিকাতা ১৩৫৪, পৃ. ৭৫-৭৬।

৬. প্রভাতকুমার গোস্বামী সম্পা., হাজার বছরের বাংলা গান, কলিকাতা ১৩৭৬, পৃ. ১৬০-৬১।

৭. প্রসঙ্গত, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *History of the Freedom Movement in India* (Vol. II Calcutta 1963) গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন 'The Cult of the Bomb'।

৮. যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, কলিকাতা ১৯৮২, পৃ. ৪৪-৪৫, পুনরায় অনুরূপ মন্তব্য পৃ. ২৫৩।

৯. তদেব, পৃ. ২৯৪।

১০. রণজিৎ সিংহ, মাটির সুরের খোঁজে, কলিকাতা ১৯৯০, পৃ. ১৭। সাম্প্রতিক (২০.১.৯৫) একটি চিঠিতে রণজিৎবাবু আমাকে জানিয়েছেন, "আমাদের প্রশ্ন ছিল, বাউল গানের সুর বিষয়ে। তার কি কোনো নির্দিষ্ট সুর আছে? না কি অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক সুর কাঠামোয় (ঝুমুর, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া) তা গাওয়া হয়? বাউল নিতাই দাসের জয়দেব মেলার আখড়ায় খালেদ চৌধুরী প্রশ্নটি তোলেন। নিতাই দাস তার উত্তর দিচ্ছিলেন। প্রশ্নের মীমাংসাও ছিল তাঁর উত্তরে। সেই আখড়ায় বাউল দীনবন্ধু দাসও ছিলেন। তিনি এই প্রশ্নের সূত্রে 'ঝুমুর বাউল'-এর কথা বলেন। তার সুর-কাঠামো বুঝিয়ে দেন 'বাউলদের গৌরচন্দ্রিকা' 'একবার এস গৌর দিনমণি' আর 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গান দুটি গেয়ে গেয়ে। প্রথমটির সুর দ্বিতীয়ে বসানো হল। গান দুটির সুর বোঝানোর আগে অবশ্য 'একবার বিদায় দে মা'-র রচনা ও সুর-ব্যবহারের ইতিহাস বলেছিলেন। আর তা ওইটুকুই। রচয়িতার বিষয়ে বিস্তারে বলেন নি। আমরাও জানতে চাই নি।"

লক্ষণীয়, দীনবন্ধু দাসের বক্তব্য নিতাই দাস অসমর্থন করেননি। সাক্ষাৎকারের তারিখ ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাস, নিতাই দাসের বয়স তখন ৮৩। অর্থাৎ ১৯০৮ সালে তিনি ২১ বছরের যুবক, গীত রচনা ও সুরারোপের ঘটনা জানা তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব।

১১. একটি স্মৃতিকথায় দেখি, "...সন ১২৬৪ সালের কথা সেই বৎসরেই সিপাহী বিদ্রোহ হয়। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কলিকাতা হুগলী বর্দ্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে একটা গুজব উঠিল মরা মানুষ ফিরিয়া আসিবে ... সেকালে এরূপ কোন হইলে হুজুগ বৈষ্ণবেরা সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার গান রচিত করিত। নূতন গান গাহিয়া বেশ দু পয়সা রোজগার করিয়া লইত।"
(অম্বিকাচরণ গুপ্ত, 'নিজের কথা' প্রজাপতি, ১৩১৯ পৌষ, পৃ. ২৩৭-৩৮।)

১২. "তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব... এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব"।
(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আমার দুর্গোৎসব, কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্গদর্শন ১২৮১ কার্তিক।)

১৩. বঙ্গদর্শন ১২৮৭ চৈত্র সংখ্যা থেকে 'আনন্দমঠ' ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে শুরু করে। পঙ্‌ক্তিটি আনন্দমঠ-এর অন্তর্ভুক্ত বন্দেমাতরম গানের।

১৪. প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসাবে পূর্বপর কালের ভারতের মোট জনসংখ্যা জনগণনায় কী নির্ধারিত হয়েছিল, জানা যেতে পারে, ১৮৮১ সাল—২৫৩, ৮৯৬, ৩৩০ জন।

১৮৯১ ,, — ২৮৭, ৩১৪, ৬৭১ ,,
১৯০১ ,, — ২৯৪, ৩৬১, ০৫৬ ,,
১৯১১ ,, — ৩১৫, ১৫৬, ৩৯৬ ,,
১৯২১ ,, — ৩১৮, ৯৪২, ৪৮০ ,,
১৯৩১ ,, — ৩৫২, ৮৩৭, ৭৭৮ ,,

(J. H. Hutton, *Census of India 1931*, Vol. I, Reprint Delhi 1989, p. 34.)

লক্ষণীয়, '৩৩ কোটি ১২ লক্ষ' সংখ্যাটি অনুপস্থিত, দ্বিতীয়ত মধ্যবর্তী কোনো অনুমান হলেও তার সময় ১৯২১-৩১-এর মাঝামাঝি কোনো সময়।

১৫. মনোরঞ্জন ঘোষ, অগ্নিশিশু, ক্ষুদিরাম, কলিকাতা ১৩৭৭, পৃ. ১২৩।

১৬. T-Series ক্যাসেটে প্রকাশিত, নং 046।

[তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক প্রতাপশঙ্কর লাহিড়ী, শ্রীমেঘদূত দাঁ ও শ্রী বিমল মজুমদার, এঁরা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ। বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন অধ্যাপক প্রদ্যোতকুমার মুখোপাধ্যায়, যিনি অধুনা-বিস্মৃত গ্রামোফোন রেকর্ডটির কথা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন, শ্রী অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর সৌজন্যে HMV অভিলেখাগার থেকে গানের পাঠটি পাওয়া সম্ভব হয়েছে ও শ্রীরণজিৎ সিংহ।]

বিমূর্ত সংগীতের সামাজিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

প্রদীপ বসু

চিন্তার ক্ষেত্রে বিমূর্তকরণের সাধারণ অর্থ হল কোনো এক শ্রেণীর বস্তু বা ব্যক্তির অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বর্জন করে, তার পরিচয় উপস্থাপন করা।
তাই যে কোনো শ্রেণীকরণ পদ্ধতিকেই একধরনের বিমূর্তকরণ বলা যায়।
বিমূর্ত কলাশিল্পের ক্ষেত্রে অবশ্য যে অর্থ আমাদের সবচেয়ে আগে মনে হয় তা হল কলার অপ্রতিরূপী চরিত্র। বহুক্ষেত্রে কলাশিল্পে, বিমূর্তকরণের ফলে আমরা বস্তুর এক সরলীকৃত আকৃতি দেখতে পাই, যার সহজ অর্থ হল বস্তুর আবশ্যিক উপাদানগুলিকে নিয়েই আকৃতিটির রচনা হয়েছে।
পাশ্চাত্য সংগীতে বিমূর্ত সংগীতের ধারণাটিও অনেকটা এইরকমের। বিমূর্ত সংগীত, যা পাশ্চাত্য সংগীতে 'অ্যাবসোলুট মিউজিক' নামেও পরিচিত, বলতে বোঝায় সেই সংগীত যা সংগীতের অতিরিক্ত অন্য কোনো ব্যঞ্জনা থেকে মুক্ত, যে সংগীত, কেবলমাত্র তার সাংগীতিক উপাদানগুলির মধ্যে বিদ্যমান।
পাশ্চাত্য সংগীতে বিমূর্ত সংগীতের সংজ্ঞা এসেছে 'প্রোগ্রাম সংগীত'-এর সঙ্গে

তুলনামূলক বৈসাদৃশ্যের উদাহরণ হিসেবে। প্রোগ্রাম সংগীত পাশ্চাত্য সংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যেখানে সংগীতের মাধ্যমে গল্প বলা হয়, বা কোনো সাহিত্যিক ধারণাকে পরিস্ফুটিত করা হয় বা ছবিও আঁকা হয়। বীটোভেনের "প্যাস্টোরাল সিম্ফনী" এর এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত যাতে চিত্র ও সংগীতের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। যদিও প্রোগ্রাম মিউজিক শব্দটির উৎপত্তি ফ্রান্জ লিসট্‌স [FRANZ LISTZ (1811-1886)] থেকে, এই সংগীতের অস্তিত্ব প্রায় সংগীতের উৎপত্তি থেকেই। এই সংগীতে রচনার ভাব ও উপাদান হিসেবে আছে : সাহিত্য (লিসট্‌স— **ফাউস্ট সিম্ফনী**), ইতিহাস (চাইকোভস্কি— **১৮১২ ওভারচার**) [PYOTT TCHAIKOVSKY (1840-1893)], ভূগোল স্মেত্‌না [BEDRICH SMETANA (1824-1884)] — **দ্য মোলডাউ** [MOLDAU] ; সিবেলাস [JEAN SIBELIUS (1865-1957)]— (**ফিনল্যান্ডিয়া** [Finlandia]), বা দৃষ্টিলব্ধ অনুভূতি (ডেবুসী [A. C. DEBUSSY (1862- 1918)] (**রিফ্‌লেক্‌শন্‌স ইন দ্য ওয়াটার**)। যদিও এই ধরনের বর্ণনাত্মক সংগীত রচনার দৃষ্টান্ত মধ্যযুগ (১৪শ শতাব্দী) থেকেই পাওয়া যায়, কিন্তু ১৯শ শতাব্দী থেকে এই সংগীত বিমূর্ত সংগীতের গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে— বিশেষত এর অর্কেস্ট্রাল রূপ, যা 'সিম্ফনিক পোয়েম' বা 'টোন পোয়েম' নামে পরিচিত।

বিমূর্ত সংগীতের প্রতিদ্বন্দ্বী এই সিম্ফনিক কবিতার উৎপত্তি প্রোগ্রাম সিম্ফনী থেকে, বিশেষত যখন রোমান্টিক সংগীত রচয়িতারা ক্লাসিক্যাল সিম্ফনীর প্রথাগত গণ্ডীর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির চেষ্টা করছিলেন। এর সূত্রপাত করেন লিসট্‌স (LISTZ) তাঁর বায়রনের কবিতার অনুসরণে রচিত **ট্যাসো** (১৮৪৯), হুগোর কবিতার অনুসরণে **ম্যাজেপ্পা** [Mazeppa] (১৮৫১), কলবাখের [KOLBACH] চিত্রের অনুসরণে, **দ্য স্লটার অফ্‌ দ্য হুন** (১৮৫৭), প্রভৃতি রচনায়। এই নতুন সৃষ্টিগুলি অতিদ্রুত অন্য সংগীত রচয়িতাদেরও সাহিত্য, কলা এবং অন্যান্য বিষয় থেকে সংগীত রচনার প্রেরণা দিতে থাকে। এ বিষয়গুলির মধ্যে সংগীত রচয়িতাদের বিশেষ প্রিয় বিষয় ছিল জাতীয় জীবনের বর্ণনা এবং দেশীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। ঘটনা পরম্পরায় সিম্ফনিক কবিতার উৎপত্তিও এমন এক সময় হয় যখন জাতীয়তাবাদী সংগীত ধীরে ধীরে প্রসিদ্ধিলাভ করছিল। সিম্ফনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় ১৯০০ সালের কিছু আগে যখন রিচার্ড স্ট্রাস্‌ (১৮৬৪-১৯৪৯) [RICHARD STRAUSS] নিজের বাস্তববাদী রচনা, যেমন, **ডেথ অ্যান্ড ট্রান্সফিগারেশন, এ হিরো'স লাইফ,** প্রভৃতিকে সিম্ফনিক পোয়েম আখ্যা দেন।

এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই অবশ্য সংগীত রচয়িতারা প্রোগ্রাম সংগীত রচনা থেকে সরে আসতে থাকেন। বিশেষত সিম্ফনিক কবিতা থেকে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয় নিও-ক্ল্যাসিকাল নন্দনতত্ত্বের প্রভাবে। নিও-ক্ল্যাসিকাল নন্দনতত্ত্ব মূলত রোমান্টিক সংগীত-রচয়িতাদের আত্মবাদিতা এবং মাত্রাতিরিক্ত আবেগময়তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে ওঠে।

এই নন্দনতত্ত্ব নিজের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে পূর্ববর্তী গুরুদের, বিশেষত ১৮শ শতাব্দীর রচয়িতা বাখ্ [BACH], মোৎসার্ট [MOZART], হান্ডেল [HANDEL] প্রমুখদের। এই প্রভাবের ফলে আমরা দেখতে পাই পূর্ববর্তী সংগীতের রূপ থেকে প্রেরণা নিয়ে, কাউন্টারপয়েন্ট-সমন্বিত সংগীতরচনার বিন্যাস, টোকাটা [TOCCATA], ফিউগ [FEUGE], কনচের্টো গ্রসো [CONCHERTO GROSSO] প্রভৃতি সংগীত-রূপের পুনঃপ্রবর্তন, অর্কেস্ট্রাল বর্ণের এবং উচ্চনাদী ধ্বনির ব্যবহার হ্রাস, প্রোগ্রাম সংগীতকে বাতিল করা এবং সাধারণভাবে সংগীত রচনায় এক নিস্পৃহ ভঙ্গি যা মূলত অ্যারোমান্টিক ও আবেগহীন। স্বভাবতই 'বাখ্-এ ফিরে যাওয়া' মানে সংগীতের ভাষাকে সেই যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, বরঞ্চ সংগীত এই সময় অনেক তীব্রভাবে ডিসোন্যান্স বা, বিসদৃশ-স্বনতার উপর জোর দেয়। গতিছন্দের দিক থেকেও এই সৃষ্টি অনেক জটিল হয়ে ওঠে কারণ এখানে এক একটি আলাদা সুরকে হারমনিক সমন্বয়ের পরোয়া না করেই পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হল।

বুসোনির [F. B. BUSONI : (1866-1924)] বিচ্ছিন্ন রচনা **সোনাটা ইন ডিয়েম নেটিভিটাটিস ক্রিস্টি** (১৯১৭) এবং প্রোকোফিয়েভ-এর [S. PROKOFIEV : 1891-1953] **ক্ল্যাসিকাল সিম্ফনীর** পর নিও-ক্ল্যাসিকাল ধারা আরো বিস্তৃতি লাভ করে এবং ১৯২০ সাল নাগাদ পাশ্চাত্য সংগীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা হয়ে ওঠে। স্ট্রাভিন্স্কির (I. STRAVINSKY 1882-1971) **সোনাটা ফর পিয়ানোফোর্টে** এবং **অক্টেট ফর উইন্ড ইন্স্ট্রুমেন্ট্স** (১৯২৩) এই ধারার এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্য সংগীত রচয়িতা যাঁরা নিজস্ব রীতিতে নিও-ক্ল্যাসিকাল রীতির বিকাশ করেন, তাঁদের মধ্যে আছেন বারটোক [B. BARTOK : (1881-1945)], হাইন্ডেমিথ [P. HINDEMITH (1895-1963)], পিস্টোন [W.PISTON : (1894-1976)] প্রমুখ।

বিমূর্ত সংগীতের আলোচনায় ফিরে আসি। প্রোগ্রাম সংগীতের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই, এখানেও সেই প্রতিরূপী ও অপ্রতিরূপী সংগীতের পার্থক্য। বিমূর্ত, অপ্রতিরূপী সংগীতকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ, বিশুদ্ধ এবং প্রামাণিক হিসেবে গণ্য করা হত।

শুধু সংগীত নয়, অন্য যে কোনো বিষয়েও আমরা এই স্তরবিভাগ দেখতে পাই, যেমন বিমূর্ত দর্শন বা গণিত এক সময় রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতির চেয়ে উচ্চতর বিষয় হিসেবে গণ্য হত। সংগীতের ক্ষেত্রে, প্রোগ্রাম সংগীতের রচনারীতির কিছু অন্তর্নিহিত ও মূলগত দুর্বলতা আছে এরকমও মানা হত। যুক্তি ছিল যে সংগীত মূলত এমন এক শিল্প যে নির্ভর করবে আপন অধিকার বা যোগ্যতাবলের উপর, তাই বাহ্যিক বিষয়-বস্তুর প্রতি অতিরিক্ত অনুষঙ্গ বা নির্ভরতা তার শিল্পগুণ বৃদ্ধি করার বদলে হ্রাস করতে বাধ্য। প্রতিরূপী সংগীত, এই যুক্তি অনুযায়ী, সংগীতের মূল প্রকৃতি ও অভীষ্ট সম্বন্ধে এক ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ করে দেয়। ফলে এমন এক প্রবণতা দেখা

যায় যেন সব সংগীতের অন্তরালে একটি 'গল্প' আছে, সব সংগীতকে এক 'গল্পের' মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা যায়, এবং বহু ক্ষেত্রে এই ভুল ধারণার বশীভূত হয়ে সব সংগীতের ক্ষেত্রে এই ধরনের গল্প বা ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করতে হয়।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে— বিমূর্ত সংগীতের কোনো অর্থ সম্ভব কি না? এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি সংগীত এক একান্ত জীবন যাপন করে। অন্যদিকে সাংগীতিক চিন্তার চরিত্রই বা কী? ভাষা চিন্তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখতে পাই, যে এই চিন্তা ভাষার অসম্পূর্ণতা এবং সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন ('যদি কিছু বলা না সম্ভব হয়, তাহলে নিঃশব্দ থাকাই উচিত'—ভিটগেনস্টাইন), অন্যদিকে সাংগীতিক চিন্তা সম্পূর্ণভাবে নির্মাণ হয় তার নিজস্ব উপাদানের ভিত্তিতে, সংগীতের বাইরে অবস্থিত কোনো বিমূর্তকরণের উপর নয়। এই চিন্তা নির্মাণ হয় স্বরের ধ্বনিগত বা গুণগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে, এবং সূত্রবদ্ধ হয় স্বর, ধ্বনি, গতিচ্ছন্দের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পার্থক্যের ভিত্তিতে। কিন্তু যা সূত্রবদ্ধ হয় সেটা কী?

টমাস মান-এর (THOMAS MANN : 1875-1955) উপন্যাস **ডক্টর ফাউস্টাস**-এর সংগীত রচয়িতা নায়ক তাঁর জীবনের প্রথমে এই দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন যে 'সংগীত হল এমন এক প্রণালী যার অর্থ সব সময় অনিশ্চিত।' এই উক্তির কথাই মনে হয় যখন সংগীতের অর্থনির্মাণ সংক্রান্ত পরস্পরবিরোধী, অস্পষ্ট প্রত্যয় ও ধারণার সম্মুখীন হই। বিমূর্ত সংগীতের এক ধরনের ব্যাখ্যা করেন সংগীতবিদ্‌রা সংগীতের বিষয়ের ভিতর থেকে। যে ব্যাখ্যা নির্মিত হয় সংগীত রচনার নিয়মকানুন, রীতিনীতি এবং কলাকৌশল সংক্রান্ত বিচার-বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে। সংগীতবিদ্যার এই ব্যাখ্যা সংগীতের এক স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়। প্রশ্ন হল সংগীতের বাইরে থেকে এই বিমূর্ত সংগীতের কী ধরনের ব্যাখ্যা বা অর্থ তৈরি করা সম্ভব? বস্তুত, এই ক্ষেত্রেই বিশেষ করে আমরা পরস্পরবিরোধী প্রত্যয় ও ধারণার সম্মুখীন হই, যার উল্লেখ টমাস মান করেছেন।

এই ধরনের বিশ্লেষণ যে প্রয়োজনীয় ও জরুরি তার একটা বড় কারণ হল যে সংগীত যখন সবচেয়ে অন্তর্মুখী, সবচেয়ে একান্ত, তখনও সেই সংগীতের অবস্থান সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যেই। সাম্প্রতিক এক গ্রন্থে (**মিউজিক্যাল এলাবোরেশন্‌স**) **এডোয়ার্ড সৈয়দ** এই যুক্তিকে বিশদ করে লিখেছেন—'আমি বলতে চাই সংগীতের অধ্যয়ন আরো বেশি চিত্তাকর্ষক হতে পারে যদি আমরা সংগীতকে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিতে অবস্থিত করতে পারি। এই কথা অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সংগীত পাশ্চাত্য সমাজে যে ভূমিকা পালন করে তার বিস্ময়কর বিভিন্নতা রয়েছে এবং সংগীতকে যে অ্যান্টিসেপ্‌টিক, নিভৃত, কেতাবি, পেশাদারী নিঃসঙ্গতা প্রদান করা হয়, সংগীতের ভূমিকা তার চেয়ে অনেক বেশি। চিন্তা করুন সংগীতের সঙ্গে সামাজিক সামাজিক মর্যাদার সম্বন্ধ; অথবা সংগীতের সঙ্গে ধর্মীয় শ্রদ্ধার সম্পর্ক— তাহলেই ধারণাটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। সমস্যা হল সাংগীতিক ক্রিয়াকলাপের এই বৃহত্তর

পটভূমি ব্যক্ত করার উপায় কী হবে, সে সমস্যা সম্প্রতিকালেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।'

এই বিষয়ে প্রথম যে আলোচনা আমরা দেখতে পাই তা হল ম্যাক্স হেবার-এর (MAX WEBER : 1864-1920) **'লোশাল অ্যান্ড র‍্যাশনাল ফাউন্ডেশন অফ মিউজিক'** গ্রন্থে যেখানে তিনি সামাজিক উপাদানগুলি কীভাবে সংগীতের সৃষ্টিশীল ও কারিগরি-প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে, যে প্রভাবের উৎস সংগীতের জীবনের বাইরে— এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হেবার-এর বিশ্লেষণ আরম্ভ হয় সংগীতের গতিশীল গুণাবলীকে বিচার করার প্রক্রিয়ার মধ্যে, যাকে হেবার দেখেছিলেন পশ্চিমস্থ মানুষের সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন হিসেবে— যে দৃষ্টিভঙ্গি অ্যাডোর্নো (THEODOR ADORNO : 1903-1969) আরো সম্প্রসারিত করেন, বিশেষত তাঁর বীটোভেন (LUDWIG VON BEETHOVEN : 1770-1827) সম্পর্কিত আলোচনায়। হেবার লিখেছিলেন : 'পশ্চিমের সংগীতে পশ্চিমের মানুষের নাটক ও অভিজ্ঞতা পুনঃ অভিনীত হয়। বস্তুত তার সংগীত— তার অভিব্যক্তি ও যুক্তির চাহিদাকে সংবোধন করেই রচিত।' হেবার এবং পরে অ্যাডোর্নো, দুজনেই মনে করতেন সংগীতের মধ্যেই সমাজের ওঠানামা, মানুষের স্বপ্ন, জীবন, আশা-নিরাশার এক কাঠামো নিহিত আছে। অ্যাডোর্নো অবশ্য মনে করতেন পাশ্চাত্য সংগীতের এই রূপ বীটোভেন-পরবর্তী যুগে অবলুপ্ত হয়। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সংগীত শুনে ঠিক একই কথা রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল। জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন : 'য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। ...আমি যখনই য়ুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি তখনই বারংবার মনের মধ্যে বলিয়াছি...ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা যে নাই তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই।'

বিমূর্ত সংগীতের এই ব্যাখ্যা নির্মিত হয়েছে যুগ-অনুযায়ী সংগীতের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকে বিচার-বিশ্লেষণ করে। অর্থাৎ সংগীতের বিকাশের এক দীর্ঘ সময়কে আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা কেউ করেছেন সংগীত রচয়িতাকে কেন্দ্র করে, কেউ আবার সংগীত রচনাগুলি ও তাদের শৈলীকে কেন্দ্র করে, কেউ কেউ আবার বিশ্লেষণের কেন্দ্রে রেখেছেন সমাজের বিবর্তনকে। আমরা এই আলোচনায় অ্যাডোর্নোর সংগীতচিন্তার উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, তার কারণ হল তাঁর সংগীতচিন্তা এখনও প্রভাবশালী। বিমূর্ত সংগীতের ব্যাখ্যার সমস্যা, সীমাবদ্ধতা এবং অস্পষ্টতার প্রকৃতিও তাঁর রচনা থেকে উঠে আসে। অ্যাডোর্নোর সংগীতের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রতি আকর্ষণের অন্যতম একটা কারণ বোধহয় এই যে বিভিন্ন নান্দনিক মাধ্যমের মধ্যে পলিফনিক সংগীত হল তাঁর কাছে সবচেয়ে কম প্রতিনিধিত্ব-মূলক বা সবচেয়ে বেশি বিমূর্ত মাধ্যম এবং তাই সংগীতই তাঁর কাছে প্রতিরূপহীন 'অন্য'কে প্রকাশ করার শ্রেষ্ঠ উপায়। যে অন্য-কে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল কখনোই ইতিবাচক-

ভাবে সংজ্ঞায়িত করেনি। আডোর্নোর সংগীতের সমাজতত্ত্বের তিনটি মূল উপাদান সংগীতের অন্তঃসম্পর্কিত তিনটি ক্ষেত্র— সৃষ্ট সংগীত, সংগীতানুষ্ঠানের সময় পুনঃসৃষ্টি ও তার উপলব্ধি। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংগীত ও সমাজের মধ্যে সংঘাত থাকেই, এই সংঘাত সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে দৃষ্ট হয় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সংগীতানুষ্ঠানের সময় সংগীত যখন পুনঃসৃষ্ট হয়। যে কোনো পুনঃসৃষ্টির সময় সংগীতের এক নতুন চেহারা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর সঙ্গে তাই জড়িত রয়েছে সংগীতের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা, প্রযোজনার কলাকৌশল, পরিচালক ও অর্কেস্ট্রার ক্ষমতা ও দুর্বলতা এবং শ্রোতাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা— এই সব কিছুই। এই ক্ষেত্রেই বিশেষত সংগীত সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে সমাজের সঙ্গে মধ্যস্থতার কাজ করে এবং এই মধ্যস্থতার প্রকৃতি অন্য কোনো শিল্প-অভিব্যক্তির সঙ্গে তুলনীয় নয়। তাই অ্যাডোর্নো বলেছিলেন, সংগীতের সমাজতত্ত্বের আসল সমস্যা হল এই মধ্যস্থতার সমস্যা। তাই তিনি সংগীতের প্রকৃত বিষয় বা অর্থ বলতে কখনই খুব একটা স্বস্তি বোধ করেননি। যেমন বীটোভেন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—'যদিও এটা কখনই বলা সম্ভব নয় যে বীটোভেনের শেষ পর্যায়ের কোয়ার্টেট-এর বিষয়গত আধেয় কী ছিল, কিন্তু এটা সহজেই বোধগম্য এগুলি হিট্‌গান থেকে আলাদা।'

অ্যাডোর্নোর কাছে সংগীতের মধ্যস্থতার এই যে জটিলতা—সংগীত-রচয়িতা, যন্ত্র, বাদক ও কৌশল— এই সব কিছুই সংগীতের মধ্যে ডায়ালেক্টিকাল কল্পনার এক উর্বর জমি তৈরি করে রেখেছে। অ্যাডোর্নোর কাছে সংগীতের গোড়াপত্তন যদিও বা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান বা কাজের ছন্দের মধ্যে হয়েও থাকে, সংগীত তার এই কার্যকরী ভূমিকাকে বহুদিন অতিক্রম করে গেছে। অনেকদিন ধরেই সংগীত আর বাস্তব জীবনের শুধুমাত্র প্রতিফলন নয়। যুক্তি, স্বাধীনতার আলোকপর্বে মানুষের মতো সংগীতও ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্তি পায়, শিল্পের সেক্যুলারাইজেশনের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতেরও সেক্যুলারাইজেশন শুরু হয়, আর এই জন্যই তিনি বীটোভেনের প্রতি এত আকর্ষণ অনুভব করেন। তাঁর মতে এই পর্বেই পাশ্চাত্য সংগীত সমাজ-সংস্কৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে স্বনির্ভর, স্বনিয়ন্ত্রিত এক জগত তৈরি করে। যে-জগত দৈনন্দিন জীবন থেকে, দূরত্ব বজায় রেখে, তার সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। ফলে সংগীত শুধুমাত্র নিজের এক অভ্যন্তরীণ ইতিহাস তৈরি করতেই সক্ষম হয়নি, সমাজের বিভিন্ন স্তর ও গঠনের এক প্রতিচ্ছবি নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পেরেছে এবং প্রদর্শন করছে নিজস্ব ডায়ালেক্টিক, উৎপাদক, উপভোক্তা ও পরিকাঠামো। যদিও তিনি সংক্ষিপ্তাকারে সংগীতের প্রকৃতি বলতে কী বোঝেন কোনোদিনই আলোচনা করেননি, কিন্তু টমাস মান-এর নায়কের মতো, তিনি সংগীতের এই দ্ব্যর্থকতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। মনে করতেন প্রত্যেক সংগীত রচনার সুর ও ধ্বনির মধ্যে কিছুটা ইউটোপিয়া রয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে সংগীত এক ভ্রমাত্মক বিশ্বাসও প্রকাশ করে যে এই ইউটোপিয়া যেন এসে গেছে। এমনকি, যাঁর সংগীত রচনার অ্যাডোর্নো এক বিরাট

সমর্থক ছিলেন সেই শ্যোয়েনবার্গ (ARNOLD SCHOENBERG : 1874-1951) সম্পর্কে সবচেয়ে ইতিবাচক রচনায় সংগীতের সেই অনিশ্চিত বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি লেখেন : 'সম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্রীকরণ এবং বিপরীতের সংযোজনের অস্পষ্টতা আধুনিক সংগীতের বৈশিষ্ট্য। অথচ এটা বিচার করা শক্ত যে সংগীতের এই নৈতিবাচক গুণগুলি সমাজের নৈতিবাচক উপাদানগুলিকে প্রকাশ করে কিনা। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে সংগীতের সমাজকে অতিক্রমণ করে যাবার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে এরকমও ভাবা যায় যে এই সংগীত অচেতনভাবে সমাজের জাদুর মধ্যে আবদ্ধ থেকে সমাজকেই অনুকরণ করে চলেছে। শেষ বিচারে এই দুটি সম্ভাবনার কোনোটিকেই আলাদাভাবে দেখা সম্ভব নয়।'

অতএব যে সম্ভাবনাগুলি দেখা যাচ্ছে তা হল সংগীতকে সমাজের নান্দনিক বৈতরূপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। এর প্রতিফলন হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে অথবা সমাজের অনুকরণ বা যে বিশ্ব থেকে এর উৎপত্তি তার প্রতিধ্বনি, অথবা তার অস্বীকৃতি ও জীবন্ত অসংগতি— এই হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

সংগীতের এই দ্ব্যর্থকতা কি অতিক্রম করা সম্ভব ?

এই দ্ব্যর্থকতা অতিক্রম করে তার সামাজিক মর্মার্থ নিষ্কাশিত করে আনা কি সম্ভব ?

এই ব্যাপারে কথা শিল্প ও কলা শিল্পের বিশ্লেষণের পদ্ধতিগুলি সংগীত অনুধাবনে কি প্রয়োগ করা যাবে ?

অ্যাডোর্নোর উত্তর হল সংগীতের সমাজতত্ত্বকে অন্য শিল্পের সমাজতত্ত্ব থেকে যেটা শিখতে হবে তা হল— [সংগীতের ধরা-ছোঁয়ার বিষয়কে অতিক্রম করে] এর প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যার উপর আরো বেশি মনোযোগ দেওয়া।

এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে সংগীতের বিষয়ের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং রচনাপদ্ধতির পরিবর্তন, যার গুরুত্ব এই বিশ্লেষণের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।

আধুনিক সংগীত ও বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সমাজ অ্যাডোর্নোর তাত্ত্বিক রচনার এক প্রধান বিষয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বীটোভেনের পর (যাঁর মৃত্যু ১৮২৭ সালে) সংগীত তার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং সামাজিক এলাকা থেকে সম্পূর্ণভাবে নান্দনিক এলাকায় প্রবেশ করে। বীটোভেনের শেষ পর্যায়ের রচনা সংগীতের জন্য অর্জন করে এক নতুন স্বাধীনতা, বিশেষত সাধারণ ঐতিহাসিক বাস্তব থেকে সংগীত স্বশাসিত জগতে প্রবেশ করে। আর্নল্ড শ্যোয়েনবার্গ-এর অসাধারণ কৃতিত্ব এই যে বীটোভেনের মৃত্যুর একশো বছর পর তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংগীতের নির্দিষ্ট মতাদর্শ কী ছিল। সেটাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে, শ্যোয়েনবার্গ নিজের সময়ের সংগীত ও সমাজের আরও তীব্র ও ট্র্যাজিক বিভক্তিকরণের পটভূমিতে নিজের সংগীতের যৌক্তিকতাকে মেলে ধরেন।

অ্যাডোর্নো বলেন শ্যোয়েনবার্গ-এর নতুন সংগীত তার বিশুদ্ধতার মাধ্যমে তার সামাজিক চেতনা, উদ্বেগ প্রকাশ করে। যত বিশুদ্ধভাবে একটি রচনা নিজস্ব সাংগীতিক গুণাবলী

প্রকাশ করতে পারে ততই প্রবলভাবে সে সামাজিক অশুদ্ধতা ও অসুস্থতার প্রতি ইঙ্গিত করবে। সংগীতের এই বিশুদ্ধিকরণ, সামাজিক অশুদ্ধিকে ছলনাময় মানবিকতা দিয়ে চাপা দেয় না। এই সংগীত শ্রোতার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে দূরত্ব তৈরি করে এবং কঠিন রীতিনীতি ও কৌশলের প্রয়োগে এই অর্থহীন ও অসুস্থ জগতের উপর এক তির্যক ও বিধ্বংসী আলোকপাত করে। অ্যাডোর্নো বলেছেন— এই সংগীতের সব সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে নিজেকে সৌন্দর্যের মায়া থেকে দূরে রাখার প্রক্রিয়ায়।

এ হল ডুবন্ত জাহাজ থেকে শেষ হতাশ-বার্তা।

আধুনিক সংগীত সম্বন্ধে অ্যাডোর্নোর একটি বিশেষ যুক্তি ছিল। এর কঠোর স্বতন্ত্রতা ও অবরুদ্ধতা নতুন কিছু নয়। বরং এর চরিত্র সাক্ষ্য দেয় সংগীতের এক বিশেষ প্রবণতার যা পৃথক, নির্বাক এবং অতর্কলভ্য (নন-ডিসকার্সিভ) শিল্প-আঙ্গিক হিসেবে পরিচয় পেতে চায়। যাঁরা সংগীত সম্বন্ধে লিখেছেন বা চিন্তা করেছেন, তাঁরা সর্বদা সংগীতের অর্থ ও ব্যাখ্যার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। এবং সব সময়ে এই উপলব্ধিতেই ফিরে এসেছেন যে সংগীত এত কিছু সত্ত্বেও কোনো একভাবে নিজের স্বল্পভাষিতা, রহস্যময়তা ও একধরনের নৈঃশব্দ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

সংগীতের এই দ্ব্যর্থকতার প্রশ্ন কেউই এড়িয়ে যেতে পারেননি। অ্যাডোর্নো-ও নয়। সংগীত-ইতিহাসের অ্যাডোর্নো রচিত মডেলে বীটোভেনের পর সংগীত দার্শনিক বক্তব্যকে পাশ কাটিয়ে গেছে, পরে শ্যোয়েনবার্গ নির্মিত সংগীতরীতি, ও তার বিচ্ছিন্নতা, রোমান্টিকতাবাদ সংগীতের যে নিভৃতিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল তাকেই পূর্ণতা দিয়েছে। অ্যাডোর্নোর এই বক্তব্যের সঙ্গে খুব একটা বিরোধ থাকতে পারে না, এবং সম্প্রতিকালে প্রকাশিত **কার্ল ডালহার্সের নাইনটিনথ সেঞ্চুরি মিউজিক** আরো বিশদ ও সূক্ষ্মভাবে এই মতেরই প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এডোয়ার্ড সৈয়দ অ্যাডোর্নো-উক্ত সংগীত বিশ্লেষণের সূচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে বর্তমান যুগে পারিক সংগীতানুষ্ঠান, যতই পেশাদারী, আচারনিষ্ঠ ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হোক না কেন ঐ জাতীয় সমাবেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগত এবং সংগীতের নিজস্ব নির্জনতার মধ্যে এক ধরনের মধ্যস্থতা করে। এই সব আসরে একই বিন্দুতে একীভূত হয় বিশেষ ও সাধারণ, সংগীত— স্বনিয়ন্ত্রিত এক বিশেষ নান্দনিক কলা, এবং শ্রোতৃমণ্ডলী সাধারণ, সামাজিকভাবে প্রাপ্তিসাধ্য উপস্থাপনার এ এক সাংস্কৃতিক রূপ।

সৈয়দ-এর মতে শ্রোতারা সংগীতসভায় আকর্ষিত হন এই জন্যই যে তাঁরা জানেন তাঁরা কখনোই স্টেজে উপস্থাপিত অপেরা ও কনসার্ট-এর গায়ক ও বাদকবৃন্দের সমকক্ষ হতে পারবেন না এবং তাঁরা সে-আশাও করেন না। কিন্তু এই অপ্রাপ্তিসাধ্য বাস্তব, যা আমাদের চোখের সামনে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত হয় তার পিছনে রয়েছে এক অদৃষ্ট ক্ষমতা ও এক অসাধারণ দক্ষতা। সঙ্গে আছে গায়ক ও বাদকের শিক্ষা, অনুশীলন ও প্রতিভার উন্মীলন। এবং আছে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি, অনুষ্ঠান পরিচালক, প্রযোজক ও বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার সংযোগ এবং

RABIN
18·3·93

Rahim
11-12-94

27-11-93

শ্রোতাদের কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য ইচ্ছা ও বাসনা। এর ফলে যা ঘটে তাকে সৈয়দ বলেছেন 'অ্যান এক্সট্রীম অকেশন' বা এক চরম উপলক্ষ্য, যা দৈনন্দিন জীবন থেকে অনেক দূরে ; যার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয় এবং যার মর্মে আছে এমন এক অভিজ্ঞতা যা এক চরম প্রাপ্তির অবস্থার মধ্যেই সম্ভব।

দৃষ্টান্ত হিসেবে সৈয়দ বেছে নিয়েছেন সংগীত পরিচালক আর্তুরো টোস্‌কানিনি-কে (ARTURO TOSCANINI : 1867-1957)। টোস্‌কানিনির সংগীত পরিচালনার বৈশিষ্ট্য ছিল অসম্ভব স্মরণশক্তি, স্বরলিপির উপর সম্পূর্ণ দখল, প্রতিটি যন্ত্র সম্বন্ধে প্রামাণিক জ্ঞান, খুঁটিনাটির উপর অসম্ভব মনোযোগ এবং অর্কেস্ট্রার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। অ্যাডোর্নো নিজে টোস্‌কানিনির পরিচালনা পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে টোস্‌কানিনি সংগীতের উপর এতটা নিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসন করতেন যে সংগীতের যেখানে পৌঁছবার কথা, সেখানে পৌঁছাতে পারত না। তিনি টোস্‌কানিনির স্টাইলকে 'সংগীতের উপর প্রশাসন ও প্রযুক্তিবিদ্যার জয়' বলে বর্ণনা করেছেন। সৈয়দ মনে করেন টোস্‌কানিনি 'চরম উপলক্ষ্য-'এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি মনে করেন এটা ঠিকই যে টোস্‌কানিনি আমেরিকায় সংগীতের বাজার তৈরি করতে সহযোগিতা করেছিলেন, যেখানে 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালনা করেছেন' ধরনের মোড়কের প্রয়োজন হয়। যে মোড়ক আরও মার্জিত ও পরিশীলিত সংগীত পরিচালকরা, যেমন ইউজেন জোছুম (EUGEN JOCHUM : 1902) অটো ক্লেম্পারার (OTTO KLEMPERER : 1885-1973), উইলহেল্‌ম ফুর্টওয়াঙ্গল্যার (WILHELM FURTWANGLER : 1816-1954) প্রভৃতিরা আমেরিকায় পাননি। কিন্তু সৈয়দের মতে টোস্‌কানিনির পরিচালনায়, যেমন বীটোভেন-এর **এরোয়িকা-র** ("Eroica" symphony, com. 1803), এক ধরনের কঠিন নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োগ দেখা যায়। এই প্রয়োগ আরও একটা গোপন প্রক্রিয়া উন্মুক্ত করে, যাকে আখ্যানও বলা যায়, যা একদিক থেকে অনুপম, কিছুটা অদ্ভুত ও খামখেয়ালিপূর্ণ এবং দৈনন্দিন জীবনের বিপরীত। এ যেন দৈনন্দিন জীবনের কঠোরতার এক নান্দনিক বিকল্প। ফলে সৈয়দ মনে করেন টোস্‌কানিনি যেটা করছেন সেটা হল সাংগীতিক অনুষ্ঠানের বৈপরীত্যকে তুলে ধরা, যা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পূর্ণ ধারাবাহিকতাহীন। আশ্চর্য নয় যে অ্যাডোর্নো ফুর্টওয়াঙ্গল্যার-কে পছন্দ করতেন, কারণ তাঁর পরিচালিত ব্রুকনার (ANTON BRUCKNER : 1824-1896) বা শুবার্ট-এর (FRANZ SCHUBERT : 1797-1828) **নাইনথ্ সিম্ফনী** শুনলে মনে হয় এ যেন তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যান ও অনুপ্রেরণার ফসল, যা আমরা হঠাৎ শুনে ফেলেছি। অন্যদিকে টোসকানিনির কঠোর, শুষ্ক সংগীত প্রযোজনা বস্তুত এক পারিক সংগীতানুষ্ঠান এবং শুধুমাত্র তাই। এখানে সংগীত সম্পূর্ণ উন্মোচিত, এর সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত বিষয়, ঘর, পরিবার, ঐতিহ্য বা জাতির যোগ নেই। সংগীত সৃজনে টোসকানিনি রচিত এই প্যারাডাইম বা মডেল এক সময় এক

প্রভাবী ধারা হয়ে ওঠে।

সংগীতানুষ্ঠানের এই 'চরম অভিজ্ঞতা'র ফলে শ্রোতারা এমন এক সূক্ষ্মতা, দক্ষতা ও প্রয়োগকৌশলের সম্মুখীন হন যে তাঁরা প্রায় নির্বাক হয়ে যান। সৈয়দ বলেছেন— সূক্ষ্মতা ও দক্ষতার এই প্রচণ্ড আক্রমণ যেন এক মর্ষকামী অভিজ্ঞতা [MASOCHISM (ম্যাসোখিজম)]। এই প্রসঙ্গে তিনি শপ্যাঁর [(FRYDARYK CHOPIN : 1810-1849)] পিয়ানো এত্যুদ-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। শপ্যাঁ এত্যুদগুলি লিখেছিলেন শিক্ষার্থীদের জন্য, কী-বোর্ড টেক্‌নিকের বিভিন্ন প্রয়োগকৌশল বোঝাবার জন্য (যেমন, অকটেভ্‌স্, থার্ড্‌স, লেফ্‌ট হ্যান্ড অ্যান্ড প্যাসেজ ওয়ার্ক, লেগাটো প্লেয়িং, ইত্যাদি)। এই এত্যুদগুলি বাজিয়েছেন সুদক্ষ ইতালীয় পিয়ানোবাদক মাউরিজিও পলিনি [MAURIZIO POLLINI (1942-)]। পলিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী পিয়ানোবাদক, মাত্র আঠারো বছর বয়সে শপ্যাঁ পুরস্কার পান। পলিনি-র এই বাজনায় কোনো অনিশ্চয়তা নেই, বিদ্যুতগতিতে তিনি এক স্বর থেকে অন্য স্বরে, অনায়াসে বিচরণ করছেন। একটিও ভুল স্বরে তাঁর আঙুল পড়ছে না। এই বাদন শুনলেই একজন অপেশাদারী পিয়ানো-বাদকের শপ্যাঁর বাজনার সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে দূরত্ব স্থাপন হয়ে যায়। শপ্যাঁর সংগীত সম্বন্ধে এক পারম্ভিক উদ্দেশ্য ছিল। যে কোনো শিক্ষার্থী বা সংগীতপ্রেমী এই সৃষ্টির মাধ্যমে সংগীতের জগতে প্রবেশ করবে এবং নির্জনতায় এর কলাকৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। পলিনি-র বাদনবৈশিষ্ট্য এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দেয়। সংগীতের প্রযোজনা তাই আজ এক আলাদা ফর্ম। একশো বছর আগে সংগীতানুষ্ঠানের কেন্দ্রে থাকতেন সংগীত রচয়িতা। আজকে থাকেন— গায়ক, পিয়ানোবাদক, বেহালাবাদক, ট্রাম্পেটবাদক বা পরিচালক। সংগীত প্রযোজনা আজকের দিনে যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার উদাহরণ হিসেবে এই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

সৈয়দ বলেছেন, আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে সংগীতের অবস্থান সামাজিক প্রসঙ্গের মধ্যেই। এই অবস্থান এক বিশেষ নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা-নির্ভর। যে অভিজ্ঞতা **গ্রামশ্চির** (ANTONIO GRAMSCI : 1891-1937) ভাষায় সিভিল সোসাইটিকে বজায় রাখে সম্প্রসারিত বা বিশদীকৃত করে। সংগীত প্রযোজনা, এক অর্থে, তাই অন্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়া, যেমন বক্তৃতা বা সভাসমিতির মতোই। সংগীত-প্রযোজনার সামাজিক এবং প্রায়োগিক সম্ভাব্যতা তাই অ্যাডোর্নো-উত্তর আর এক ধরনের বিশ্লেষণের সুযোগ দেয়। সেই বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন বিমূর্ত সংগীত ও সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য সমাজে তার ভূমিকা— এই নিয়ে চিন্তাভাবনা।

বিমূর্ত সংগীতের সামাজিক ব্যাখ্যা নিয়ে যে প্রসঙ্গগুলি আমরা আলোচনা করলাম, সেখানে ম্যাক্স হেবার যেমন সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করেছেন, অ্যাডোর্নোর বিশ্লেষণ তেমনই বহুলাংশে সমাজদর্শন-ভিত্তিক। এডোয়ার্ড সৈয়দ আধুনিকতর, এবং সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের ধারা অনুসরণ করেছেন। এই

প্রসঙ্গে আরো দুজনের নাম করতে হয় যে নাম দুটি আমাদের দেশে কিছুটা অপরিচিত। এঁরা হলেন **কুর্ট ব্লাউকপফ** (KURT BLAUKOPF : 1914-) এবং **অ্যালফন্‌স্‌ সিলবারম্যান**। দুজনেই হেব্বার দ্বারা প্রভাবিত এবং সংগীতের সমাজতত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। এঁদের সকলের কাজই সংগীতের ঐতিহাসিক বিকাশ ও পরিবর্তনের এক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। অর্থাৎ এঁদের বিশ্লেষণের মূলে আছে ইতিহাস, সময় এবং পরিবর্তনশীলতা। তাই মনে হয় এ আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না, যদি না আমরা অন্য এক ধরনের ব্যাখ্যার অন্তত কিছুটা আভাস না দিতে পারি। এটা হল পাশ্চাত্য সংগীতের স্ট্রাকচারালিস্ট বা গঠনবাদী ব্যাখ্যা। আমরা জানি গঠনবাদে ইতিহাস নেই, বস্তুত ইতিহাস গঠনবাদ থেকে নির্বাসিত। ক্লদ লেভি-স্ত্রোস্‌ (CLAUDE LE'VI-STRAUSS : 1908-) পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন সংগীত হল মীথ-এর মতো। সঙ্গীতের সঙ্গে মীথ-এর সম্পর্ক শুধুমাত্র সদৃশতার নয়, ধারাবাহিকতারও। সদৃশতা প্রসঙ্গে লেভি-স্ত্রোস্‌ বলেছেন আমরা যে-ভাবে উপন্যাস বা সংবাদপত্র পড়ি, বাঁ থেকে ডান দিকে, লাইনের পর লাইন ধারাবাহিক অনুক্রম হিসেবে, সেই ভাবে মীথ-এর অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। কারণ মীথ-কে সম্পূর্ণভাবে ধরতে হবে। মীথ-এর অর্থ রয়েছে ঘটনাগুচ্ছর আকারে যে ঘটনাগুচ্ছগুলি গল্পের বিভিন্ন স্থানে ভেসে ওঠে। তাই মীথ-কে পড়া উচিত সেই ভাবেই যে-ভাবে আমরা অর্কেস্ট্রার স্বরলিপি পড়ি। অর্কেস্ট্রার স্বরলিপি শুধুমাত্র স্টেভ্‌ থেকে স্টেভ্‌-এ পড়ি না, বরং সম্পূর্ণ পৃষ্ঠাটাই হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করি। এটা জানি যে, পৃষ্ঠার একদম উপরে প্রথম স্টেভ-এ যা লেখা আছে তা নিচে যা লেখা আছে তারই অংশবিশেষ। এর অর্থ নির্ভর করছে দ্বিতীয়, তৃতীয় স্টেভ্‌গুলিতে কী লেখা আছে তার উপর। অর্থাৎ অর্কেস্ট্রার স্বরলিপি আমরা শুধুমাত্র বাঁ থেকে ডান দিকে পড়ি না, উপর থেকে নিচেও পড়ি। মীথ-এর গঠনও তাই।

লেভি-স্ত্রোস বলছেন এই সদৃশতা আকস্মিক নয়। বরং রেনেসাঁসের সময় এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে মীথ যখন ক্রমশ অপস্রিয়মান, মীথ-ধর্মী গল্পের বদলে যখন উপন্যাসের আবির্ভাব হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ই কিন্তু সঙ্গীতের মহৎ শৈলীগুলির উদ্ভব, যা সপ্তদশ শতাব্দী এবং বিশেষত অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সংগীতের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। এ যেন সংগীত নিজের যে ঐতিহ্যবাহী গঠন তা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে। যে নতুন দায়িত্ব সংগীত গ্রহণ করল, তা বৌদ্ধিক ও মানসিক দায়িত্ব হিসাবে এতদিন মীথ পালন করে আসছিল।

গঠনবাদীদের মতে সংগীত মীথ ও ভাষার মধ্যেও একটা সম্পর্ক রয়েছে। গঠনবাদী ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী ভাষার মূল উপাদান হল ফোনেম (phoneme), অর্থাৎ আমরা যে অক্ষরগুলি ব্যবহার করি তার ধ্বনি, যার নিজের কোনো অর্থ নেই, কিন্তু ফোনেম-এর সংযুক্তিকরণের ফলে অর্থ সৃষ্টি হয়। সংগীতের স্বরের ক্ষেত্রেও ঠিক

তাই। কোনো একটি স্বরের— এ, বি, সি, ডি—নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। এগুলি শুধুমাত্র স্বর। এই স্বরগুলি সংযুক্তিকরণের ফলেই সংগীত সৃষ্টি হয়। লেভি-স্ত্রোস বলেছেন সংগীতের এই মূল উপাদানগুলিকে আমরা টোনেম (toneme) বলতে পারি। এই বিশ্লেষণের পরের পর্যায়ে আমরা দেখি ভাষায় ফোনেম যোগ করে শব্দ হয় এবং শব্দ যোগ করে বাক্য হয়। সংগীতে কিন্তু শব্দের তুল্য কিছু নেই। স্বরগুলি যোগ করেই 'বাক্য' বা সুরের ধ্বনিসমষ্টি তৈরি হচ্ছে। সুতরাং ভাষায় তিনটি নির্দিষ্ট স্তর রয়েছে, ফোনেম, শব্দ, বাক্য। সংগীতে কিন্তু মাঝের স্তরটি নেই। এখন মীথ-কে যদি ভাষা ও সংগীতের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে আমরা দেখব, মীথ-এ ফোনেম-এর তুল্য কিছু নেই। মীথ-এর মূল উপাদান হল শব্দ। যদি ভাষাকে প্যারাডাইম বা মডেল হিসেবে ধরা হয়, তাহলে এই প্যারাডাইম নির্মিত হচ্ছে প্রথম, ফোনেম, দ্বিতীয়, শব্দ ও তৃতীয়, বাক্য—এই তিনটি স্তরের মাধ্যমে। সংগীতে ফোনেম-এর তুল্য আছে, বাক্যের তুল্যও আছে। মীথ-এ শব্দের তুল্য আছে এবং বাক্যের তুল্য আছে, ফোনেম-এর তুল্য কিছু নেই। অর্থাৎ সংগীত এবং মীথ দুটি ক্ষেত্রেই একটি স্তর নেই। সুতরাং লেভি-স্ত্রোসের মতে আমরা যদি সংগীত, মীথ ও ভাষার সম্পর্ক বুঝতে চাই তাহলে আমাদের ভাষা থেকে শুরু করতে হবে এবং তাহলেই আমরা দেখাতে পারব, সংগীত এবং মীথ দুই-ই ভাষার দুটি ভিন্ন শাখা— যাদের মূল উৎপত্তি ভাষা থেকে কিন্তু তারা দুটি ভিন্ন দিকে চলে গেছে। সংগীতে মুখ্য হল ভাষার ধ্বনিগত দিকটি। মীথ-এ মুখ্য হল ভাষার অর্থগত দিকটি। সংগীত হল ধ্বনির দখলে এবং মীথ হল অর্থের দখলে। এ যেন সেই মীথ-এর দুই বোনের গল্প, যারা সহোদরা, কিন্তু যারা দুই দিকে চলে গেছে। আর কোনো দিন তাদের দেখা হয়নি। আলোচনা প্রসঙ্গে লেভি স্ত্রোস্-ও শেষ অবধি ফিরে এসেছেন শ্যোয়েনবার্গের সীরিয়াল সংগীতে। কিন্তু লেভি-স্ত্রোসের ব্যাখ্যা একটু অন্যরকম। তিনি বলছেন উপন্যাস আসার ফলে একসময় পশ্চিমী সাহিত্য থেকে মীথ যখন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল তখন সংগীত মীথ-এর গঠন এবং সামাজিক ক্রিয়া আত্মসাৎ করে। আজকে যখন সাহিত্যে উপন্যাসের অবলুপ্তি ঘটেছে, তখন সীরিয়াল সংগীত সেই গঠন আত্মসাৎ করেছে। এই উক্তি নিয়ে অবশ্য প্রচুর বিতর্ক সম্ভব।

কিন্তু শুধু এই উক্তি কেন, আমাদের বিষয় বিমূর্ত সংগীত, তা নিয়েই বা বিতর্কের শেষ কোথায় ? □

আকাশকুসুমের অধিকার

মিহির চক্রবর্তী

গণিতশিল্পী ছাড়া 'আকাশকুসুম' এর চাষ-আবাদ করার ক্ষমতা ও দুঃসাহস বিজ্ঞান জগতের আর কোন্ সাধকের থাকতে পারে ? বিজ্ঞানের বাইরে (সত্যিই বাইরে কি ?) হয়তো আছে কবির, হয়তো শিল্পীর।

অন্যদের 'বিষয়' নিতান্তই বাস্তব। পদার্থবিদের জড়পদার্থ, তার মধ্যেকার অণু-পরমাণু, তাদের গতিময়তা ও টানাপোড়েন, বটানিস্টের উদ্ভিদ, তার বৈচিত্র্য, তার জন্ম-মৃত্যু, জীববিজ্ঞানীর জীবজগত, তাদের ভালোবাসা তাদের বাঁচার নিয়মাবলী। বিষয় জ্ঞাতার বাইরে, তার অস্তিত্ব জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ এবং প্রচেষ্টা থাকে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ জ্ঞান অনুসন্ধানের। এ জ্ঞানের রূপ বাক্যবিন্যাসে, যে বাক্য উচ্চারিত হবার আগেই সত্য অথবা মিথ্যা হয়ে আছে। কোনো একসময় ভাষা ছিল না তবু বিষয় ছিল। তারপর এক মহালগনে আমরা প্রথম উচ্চারণ করতে জানলাম— 'সূর্য', 'পৃথিবী', 'আবর্তন'। প্রথম প্রকৃতি-পাঠক বললেন 'সূর্য পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হয়'। মিথ্যে হয়েই জন্ম নিল বাক্যটি।

(আজকাল অনেকেই এসবে সন্দিহান, জানি তবু তা এখনো সন্দেহই। ভাবনার মূল কাঠামোয় তেমন কোনো বদল ঘটেছে বলে মনে হয় না।)

বিপরীতে গণিতসাধকের জ্ঞেয় বিষয় তাঁর মনের মধ্যেই, তাঁর কল্পনায়। একটি কাগজে, রুলার দিয়ে একটি রেখা আঁকা হল। গণিতবিদ তার বাইরের অবস্থিত এই বস্তু রূপটিকে অন্য সকলের মতো দেখেন। কিন্তু এটিই তাঁর বিষয় নয়। তাঁর কল্পনায় এবারে রেখাটির বাস্তব প্রস্থকে মুছে ফেলতে ফেলতে তাকে একেবারে সীমায় ঠেলে নিয়ে যান। আবার অন্যদিকে রেখাটিকে দুদিকেই প্রসারিত করতে থাকেন যে কোনো সীমানা অতিক্রম করে। কল্পনার এই খেলায় কাগজের উপরকার বাস্তব, সীমায়িত প্রস্থবান রেখাটি একটি অন্য রূপ পেয়ে যায় — এরূপ আর বাইরে নেই, সমস্তটাই গণিতশিল্পীর মনে। নতুন এই রহস্যময়, মায়াবী রূপটিকে এবারে তিনি বরণ করে নেন তার 'বিষয়' হিসাবে এবং যথেষ্ট বিস্ময়ে তাকে, সেই বিষয়কে, পর্যবেক্ষণ করেন। বিষয়টিকে তার রহস্যাবৃত মনে হয়। এবং এই রহস্যের উন্মোচন তার কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এভাবেই গড়ে ওঠে একটি নতুন রূপ, যা বস্তুত গণিত স্রষ্টার মনেরই সৃষ্টি, যার কাছে স্রষ্টা নিজেই নতজানু, যেভাবে একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী নতজানু প্রকৃতির কাছে।
প্রকৃতিবিজ্ঞানীর সঙ্গে প্রকৃতির একটি খেলা চলে। বিজ্ঞানী এই খেলায় একজন বুদ্ধিমান কল্পনাক্ষম প্রার্থী— প্রার্থী তার বিষয় প্রকৃতির কাছে। গণিতবিদও এই ধরনের এক খেলাতেই লিপ্ত হন। তবে তার খেলার সামগ্রী তিনি নিজেই গড়ে নেন।
(বিতর্ক : এ সামগ্রী কতটা স্রষ্টা-নির্ভর? বাস্তব রেখাটি থেকে উদ্ভূত এই যে নতুন রূপ, এর মধ্যে একটি ইউনিভার্সালিটি থাকে। সকল সুস্থ কল্পনাশীল মানুষই মনের এই কারিগরিতে পারদর্শী, সকলেই সেই আইডিয়াল রেখা রূপটি মনের আঁশিতে দেখতে সক্ষম।
প্লেটো বলবেন অন্যভাবে। তিনি বলবেন, এই রূপটিই বাস্তব। The so called real world of experience is not at all real. We are like dwellers in a cave, who perceive the shadows of the external world and mistake the shadow for the real thing.)

তখনই অপরিহার্য হয়ে পড়ে কথা। অন্য বিজ্ঞানী তার বিষয় দেখিয়ে দিতে পারেন, যেমন— এই একটি বৃক্ষ, অথবা এই একটি প্রাণী, অথবা এই একটুকরো উল্কাপিণ্ড, অথবা এমনকি, এই একটি ইলেকট্রন। বিষয় উপস্থাপনার জন্য কথা তার ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়। কথার ভূমিকা দ্বিতীয় পর্যায়ে, বিষয়-এর জ্ঞানের বাহক হিসাবে।

কিন্তু গণিতের বিষয় মানেই একটি বা কয়েকটি গুণের বর্ণনা— বিন্দু : যার অবস্থান আছে অথচ পরিমাণ নেই। সংখ্যা : কোনো বস্তুসমষ্টির সেই ধর্ম যা পড়ে থাকেই বস্তুগুলি থেকে তাদের সমস্ত বিশেষ গুণাবলী যেমন, রঙ, আকার, গন্ধ, বা এমনি সব কিছু, সরিয়ে নিলেও।

কথার মতো শক্তিমান অ-বাস্তব আর কী আছে? কয়েকটি ধ্বনি দিয়ে অথবা চিহ্ন দিয়ে পর পর সাজিয়ে তোলা একটি পরম্পরা, একান্তই অ্যাবস্ট্রাকট গঠন একটি, কী মায়ার খেলায় জড়িয়ে ফেলেছে মানুষকে। ধ্বনির গঠন আবার তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অন্যদের ক্ষেত্রে বিষয়ের অস্তিত্বের পরেই তার বর্ণনা আসে। এখানে বর্ণনা দিয়েই বিষয়ের সৃষ্টি।
(তুলনা। বিষয় :— মৎস্যকন্যা : মাছের শরীর, মানুষীর মুখ, জলে ভেসে বেড়ায়।)
বাইরে নেই। মনে আছে। ভালবাসায় আছে।
রবীন্দ্রনাথের 'সে' মনে পড়ে? 'পুপে দিদিমনিকে ধারা বেয়ে যে গল্প বলে যাচ্ছি সেই গল্পের মূল অবলম্বন একটি সর্বনামধারী, সে কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরী।'
এই অ্যাবস্ট্রাকশন এবং বাণী-নির্ভরতার ফলে axiomatization হয়ে পড়ে গণিতের গঠনপ্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ।

কয়েকটি বাক্য উপস্থিত করা হয় খেলার টেবিলে। ধরে নেওয়া হয় কিছু সামগ্রী আছে যারা ঐ বাক্য উল্লেখিত গুণাবলীর আধার। ভালো হয় ইতিপূর্বে গঠিত কিছু গণিত সামগ্রীর যদি ঐ গুণাবলী থাকে। স্বাভাবিকভাবেই, গণিতের ইতিহাসের প্রথম সৃষ্টি axiom-গুলির জন্য আদিম সামগ্রীগুলির অস্তিত্ব প্রামাণ্য নয়। খানিকটা বোধ বা কাণ্ডজ্ঞানের ওপর ছেড়ে দিতে হয় এদের অস্তিত্বকে।
যেমন ইউক্লিডিয় জ্যামিতির axiom-গুলি অথবা পিয়ানোর সংখ্যাসংক্রান্ত axiom-গুলি। প্রথম গুচ্ছকে ধারণ করার জন্য আছে বিন্দু, সরলরেখা ইত্যাদি জ্যামিতির অবাস্তব বস্তুগুলি। আর দ্বিতীয় গুচ্ছের জন্য বিমূর্ত পূর্ণ সংখ্যার দল।

এইভাবেই বাস্তব বস্তু থেকে কল্পনায় এবং তার পরে সে কল্পনার বাণীরূপ। অথবা বাস্তব বস্তুর আভাস থেকে কথা এবং কথা থেকে কল্পনায় এক রূপের অবয়ব গড়ে তোলা।

ঠিক এখানেই সেই পুরনো প্রশ্নটি এসে যায়। কথা ছাড়া মানুষ কি ভাবতে পারে? বাণীহীন অর্থাৎ ভাষা গড়ে ওঠেনি যাদের তারা কি কল্পনা করতে পারে? ভাবতে পারে? অন্তত স্ট্রাকচারড বিমূর্ত ভাবনা? গণিতের মতো ভাবনা?

প্রাথমিক গঠনের পরে যে অ্যাবস্ট্রাকট রূপটি তৈরি হল তার কিছু নির্দিষ্ট গুণ আছে। এই অবাস্তব বস্তুগুলির সত্য কাহিনী রয়েছে।

সে গুণাবলীর 'আবিষ্কার'ই গণিতকর্মীর কাজ। এবং তার পদ্ধতি হল গাণিতিক প্রমাণের মধ্য দিয়ে যাওয়া। প্রমাণপদ্ধতি মাত্রেই অ্যাবস্ট্রাকট। সূর্যের আকৃতি গোলাকার— এর প্রমাণ সরাসরি, প্রকৃত তথ্য খোঁজার মধ্য দিয়ে। কিন্তু ত্রিভুজের কোণের সমদ্বিখণ্ডক তিনটি একই বিন্দু দিয়ে যায়— একথার প্রমাণ যুক্তি-তর্ক দিয়ে করতে হয়। এই বিমূর্ত কথা চালাচালির মধ্য দিয়ে যে সিদ্ধান্ত আসে তা এত অমোঘ, এত সন্দেহাতীত মনে হয় কেন— এটা এক বিস্ময়।

ফলত গণিত জগতের বিচরণকারীর কাজ দ্বিবিধ :

শিল্পী হিসাবে— আশ্চর্য, অসম্ভব, সুন্দর রূপের নির্মাণ।

আবিষ্কারক হিসাবে— সেই নির্মিত রূপের অজ্ঞাত গুণাবলীর অনুসন্ধান।

অজ্ঞাত গুণাবলীর আবিষ্কারের পদ্ধতিটি আরো একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। Axiom-গুলি দিয়ে রূপ নির্মাণের পরে নির্মাতার দায়িত্ব মূলত শেষ যদিও রূপের মূল একক-গুলি সাজিয়ে অন্যান্য বিচিত্র মিশ্র রূপ সৃষ্টির কাজেও শিল্পীসত্তাই ক্রিয়াশীল।

এরপরে আবিষ্কারক হিসাবে গণিতকর্মীর কাজের শুরু। তিনি তখন একের পরে এক গুণনির্দেশক বাক্য (কথার মাহাত্ম্য আবার লক্ষণীয়) উপস্থাপিত করেন এবং প্রশ্ন করেন, এ কি সত্যি না মিথ্যে? সত্যি, মিথ্যে শব্দ দুটো বহির্বিশ্বের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য হয়। গণিতের ক্ষেত্রে বরং বলা ভালো বাক্যটি প্রামাণ্য না অ-প্রামাণ্য। এতদিনের বিশ্বাস ছিল একটি অথবা অন্যটি হতে বাধ্য। সম্প্রতি তিরিশের দশকের পর থেকে একটি তৃতীয় সম্ভাবনাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন গণিত-পথিকেরা— তা হল প্রামাণ্য বা অ-প্রামাণ্য কোনোটিই নয়। অনিশ্চিতির আরো একটি কারণ, গাণিতিক প্রমাণপদ্ধতিতেও বিভিন্নতার উপস্থিতি। একই গাণিতিক রূপ থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন গুণসত্তার সন্ধান দিতে পারে, এমনকি বিরোধী সত্তারও।

গাণিতিক প্রমাণ এক জাতীয় পদ্ধতি, বিগত এক শতকেরও বেশি সময় ধরে যার গ্রহণ-যোগ্যতা এবং মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্ঞানের অন্য ক্ষেত্রগুলিতেও, পদার্থবিদ্যায় তো বটেই—এই পদ্ধতির প্রয়োগ এক লাফে সম্মান বাড়িয়ে তোলে। 'Understanding means understanding through mathematics,' গণিতের অপর নাম র‍্যাশানালিটির অপর নাম গণিত। সকলেই জানেন অধিকাংশ গণিতজ্ঞের আচরণ অস্বাভাবিক, তবুও।

ফলে 'বিজ্ঞানের রানী' থেকে যে কোনো অন্য জ্ঞানের 'পরিচারিকা'য় পরিণতিলাভ।

Non-standard analysis-কে অধ্যাপক William F. Taylor কী চোখে দেখেন

তার নমুনা : That subject looks very interesting to me, and I wish I could take out the time to master it. There are numerous places in my field where one is confronted with things that are going on simultaneously at totally different size scales. They are very difficult to deal with by conventional methods. Perhaps non-standard analysis with its infinitesimals might provide a handle for this sort of things.

টেলর ইনজিয়ারিং বিজ্ঞানের একজন প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব।

কোনো আশ্চর্য সুন্দর গণিতাংশকে প্রায়ই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়— 'কী হবে এ দিয়ে ?'

প্রশ্ন হয় না : 'কেমন লাগছে একে ?'

কেন ? কেন গণিতের অন্য নাম র‍্যাশনালিটি ? 'Quantitative science— that is Science with mathematics— has proved successful in controlling nature. The majority of the Society backs it up for this reason. At the present moment, they want nature to be altered and controlled— to the extent, of course, that we can do it and the results are felicitous. The humanist point of view is a minority point of view. But it is influential— one sees this among young people'— ১৯৭৭-এর আগস্ট মাসে অধ্যাপক টেলরের এই সাক্ষাৎকার। আমি আরো লক্ষ করতে বলি ঐ 'humanist point of view' শব্দগুচ্ছকে।

কে কথা বলছে ? ক্ষমতা। মেজরিটি প্রকৃতপক্ষে— ক্ষমতাবান গোষ্ঠী, অথবা মেজরিটির অর্থ গতানুগতিকতা।

সমস্ত জ্ঞানের পদ্ধতির চূড়ান্ত শুদ্ধ রূপ গাণিতিক পদ্ধতি— এই বোধ ও বিশ্বাসে একটু ভাঙন ধরেছে ইদানিং। এর অন্যান্য কারণের মধ্যে, আমার মতে, একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্যতর হল, প্রচলিত গণিতের ভিত্তি ও পদ্ধতিতে গণিতের অন্তর্জগত থেকেই উদ্ভূত সন্দেহ। এই সন্দেহের মুখে দাঁড়িয়ে গণিত এতদিনকার অদ্বৈততা হারিয়ে ফেলছে। সে শতধারায় বিভক্ত— আমি বলতে চাই বিকশিত। বিকল্প গণিতেরা দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মূল স্রোতটি অবশ্যই অদ্বৈততার রক্ষক, কারণ স্পষ্টতই পায়ের তলার ভূমি। আর বিভিন্ন ক্ষীণ, অতিক্ষীণ, বিদ্রোহী, অর্বাচীন ধারণাগুলির ক্রমাগত আবির্ভাব। কে বাঁচে কে হারায় সে প্রশ্ন এই ক্ষণে অর্থহীন। ধারাগুলি যেন স্বাভাবিক পরিণতি পেতে পারে— সভ্যতার দায় এটুকুই। তাকে যেন

স্বাভাবিক জল-হাওয়া থেকে বঞ্চিত না করা হয়। এ দায়িত্ব পালন করছে কই সভ্যতা? আর এই যে আত্মপ্রকাশনার সুযোগ পাচ্ছে বিভিন্ন বিকল্প গণিত তার পিছনেও, ঐ ব্যবসা— এবং ভবিষ্যত ব্যবহার্যতার সম্ভাবনা— আমার বিশ্বাস তা-ই।

আমার কাছে একটা দায় এসে পড়ে। 'আকাশকুসুম' রচনার অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়। গণিতের মূল ধারা আকাশকুসুমতাকে স্বীকার করেও তার আকার-বর্ণ-গন্ধের সীমানা সুনির্ধারিত করে দেয়। তাই অস্বীকার এই মূল স্রোতকে। আর রাষ্ট্র-সমাজ-ব্যবসা-টেক্‌নোলজি উপযোগিতার নিক্তিতে মাপছে সব কিছু। অর্বাচীনতার সামান্য স্থান সেখানে। অস্বীকার তাকেও, সে কারণে।
বস্তুত ক্রমাগত আকাশকুসুম রচনা করে করেই এই অস্বীকারের একটা বাস্তবতাও তৈরি হবে। □

মন্তব্য : ১ □ সুদীনকুমার আচার্য

শ্রীমিহির চক্রবর্তী মহাশয়ের 'আকাশকুসুমের অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধটির মূল সুরটি অনুধাবন করতে কোনো অসুবিধে হয় না— আমিও এই সুরে সুর মিলিয়ে নিতে চাই। কল্পনার পাখায় পাড়ি দিয়ে অনাদি-অনন্ত-অসীম মনোময় গণিতের জগতে আমরা বিচরণ করতে পারি— হারিয়ে যাওয়ারও কোনো মানা নেই। গণিত স্রষ্টা যখন তাঁর নিজের আনন্দে সৃষ্টি করেন তখন তাঁর সৃষ্ট গণিততত্ত্বের উপযোগিতা আছে কিনা সে প্রশ্ন তাঁর কাছে গৌণ হয়ে যায়। গাণিতিক নিয়মাবলীর বাস্তব প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতার কথা অনেকেই ভাবতে পারেন— কিন্তু যিনি স্রষ্টা তাঁর এই জাতীয় ভাবনার প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই ; স্রষ্টার ভূমিকা এখানে শিল্পীর, কবির, মরমী সাধকের।

প্রবন্ধটির ইতিবাচক দিকের কথা সংক্ষেপে বলা হল। কিন্তু এই লেখাটির অন্তর্গত কিছু কিছু মন্তব্য আমার কাছে অতিসরলীকৃত বলে মনে হয়েছে। প্রবন্ধের প্রায় শুরুতেই লেখক বলেছেন "অন্যদের বিষয় নিতান্তই বাস্তব"— এ কিন্তু অভিমানের কথা, এতবড় একটা মন্তব্য লেখক কিছুটা আলগাভাবেই করে ফেলেছেন। বিশুদ্ধ গণিতের অনুশীলন এবং অধ্যয়ন বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে নিরভিমান হতে, নিস্পৃহ হতে, নিরাসক্ত হতে। পদার্থবিদ এবং রসায়নবিদ যখন মৌলিক পদার্থের অণু-পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের জটিল অবস্থান এবং ঘূর্ণনের নিয়মের কথা বলেন, যে অলৌকিক অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার ভাবনা তাঁরা ভাবেন সেসবকে কি নিতান্তই বাস্তব কোনো বিষয় বলে মনে করব? এই সমস্ত প্রায়

বিলীয়মান (Infinitesimal) কণাদের স্বতঃসিদ্ধকল্প গতিপ্রকৃতি নিয়ে যখন তাঁরা জটিল অঙ্ক কষেন তখন তার বাস্তবাভিত্তি কোথায় থাকে ? এই প্রসঙ্গে স্যার জেমস্ জিনস এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য (*The New Background of Science*, p-68)— 'Physical Science set out to study a world of matter and radiation, and finds that it cannot describe or picture the nature of either, even to itself. Photons, electrons and protons have become about as meaningless to the physicist as X, Y, Z to a child on its first day of learning algebra. The most we hope for at the moment is to discover ways of manipulating X, Y, Z without knowing what they are, with the result that the advance of knowledge is at present reduced to what Einstein has described as extracting one incomprehensible from another incomprehensible.'

লেখক অন্য এক জায়গায় বলেছেন— 'অন্যদের ক্ষেত্রে বিষয়ের অস্তিত্বের পরেই তার বর্ণনা আসে। এখানে বর্ণনা দিয়েই বিষয়ের সৃষ্টি'। বর্ণনা দিয়ে, কথার পর কথা সাজিয়ে গণিতবিদ যখন কোনো বিষয়ের সৃষ্টি করেন, তখন তার আগেই কি সেই বিষয়ের একটা ঝাপসা ছবি তাঁর মনের মধ্যে ভেসে ওঠে না ? বর্ণনা তার এই মনের ছবিকে একটা বাণীরূপ দেওয়ার চেষ্টা মাত্র। প্রবন্ধের একেবারে শেষে লেখকের মন্তব্য— 'বস্তুত ক্রমাগত আকাশকুসুম রচনা বার করেই এই অস্বীকারের একটা বাস্তবতাও তৈরি হবে'। এর কি কোনো প্রয়োজন আছে ? তাছাড়া কাকে অস্বীকার করার কথা উনি বলেছেন তা খুব স্পষ্ট নয়। সর্বোপরি গণিতের প্রকৃত স্বরূপের পরিপন্থী কোনো ধারাকে চেষ্টা করে অস্বীকার করা মানে, প্রকারান্তরে সেই ধারাকে স্বীকার করেই নেওয়া।

মন্তব্য : ২ □ পার্থপ্রতিম ঘোষ

অধ্যাপক মিহির চক্রবর্তীর রচনাটি পড়লাম। গণিতের ছাত্র হিসাবে রচনাটি আমার কাছে শুধুমাত্র সুখপাঠ্যই হয়নি, আমার সমস্ত বিশ্বাসকে যেন প্রতিফলিত করেছে। এই প্রসঙ্গে আমি দুটি কথা বলতে চাই ; দুটিই বোধ করি এই রচনাটির মূল ভাবধারার সাথে একসুরে বাঁধা।

১) পাঠক যদি সঠিক উদ্ধৃতি দেবার অক্ষমতাকে ক্ষমা করেন তবে বলি : Bertrand Russell একবার বলেছিলেন : 'Mathematics is a science in which the scientist does not know what he says, neither is he bothered of what he says is true.'

২) গণিত ছাড়া, বোধ করি অধিকাংশ বিষয়ের ভাবগঠন পদ্ধতিকে খুব মোটা দাগে নিচের ছবিটা দিয়ে বর্ণনা করা যায় :

a-priori beliefs →	formulation of a-priori beliefs →	process of reasoning/methods of deduction →	conclusions →	a-posteriori interpretation

আমার ধারণা এই যে এই 'process of reasoning/methods of deduction' -এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে গাণিতিক পদ্ধতি। 'গণিত ছাড়া' কথাটা বললাম এই কারণে যে গণিতের বৈশিষ্ট্য হল এই এর 'a-priori beliefs' নেই এবং 'a-posteriori interpretation' নেই। তাই গণিতের জন্ম যেমন গণিতের মধ্যে, গণিতের চরম সার্থকতা লাভও গণিতেরই মধ্যে!

এবার তাহলে আমার একটি প্রশ্ন পাঠকের সামনে তুলে ধরি : গণিতের অপর নাম যদি 'আকাশকুসুম-চয়ন' হয় তবে কি সেটা একেবারে নিরর্থক হবে? □

দর্শনে বিমূর্ত বিষয়

মাধবেন্দ্র নাথ মিত্র

বিমূর্ত বিষয় বলতে সাধারণত এমন একটি বস্তুকে বুঝে থাকি যার কোনো আকার নেই, অবস্থান নেই এবং হয়তো কোনো নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে যাকে বাঁধা যায় না। প্রশ্ন উঠতে পারে— এ আবার কী রকম বস্তু? বস্তু বলতে তো আমরা বুঝি এমন একটা পদার্থ যাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, যার একটি নির্দিষ্ট আকার আছে, যে কোনো না কোনো দেশ বা কালে অবস্থান করে। যেমন, আমার ঘরের সামনে বাঁধা রয়েছে যে গরুটি। এটি একটি বস্তু, যার একটি মূর্তি আছে, বিমূর্ত বা মূর্তিহীন বস্তু আবার কী ধরনের বস্তু? যার আকার আছে, দেশ-কালে অবস্থান আছে তাকেই আমরা জানতে পারি, আর জানা মানেই তো কোনো না কোনো ভাবে তাকে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা। যে সমস্ত বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ করি না, বা যাকে জানবার জন্যে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করি না সে তো কাল্পনিক, কল্পলোকের বস্তু। সেই বস্তুই কি তাহলে বিমূর্ত বস্তু? তা বলা যায় না। কারণ কল্পনার বস্তুও হয়তো মূর্তিহীন নয়; যেমন অর্ধনারীশ্বর যার অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পুরুষ।

এটি কল্পনার বস্তু হলেও এর একটা মূর্তি আছে। অথবা ধরা যাক পক্ষীরাজ ঘোড়া। তারও তো একটা মূর্তি আছে। তাহলে মূর্তিহীন কল্পনার বস্তু কি হয় না? যদি বা স্বীকার করা যায় যে, মূর্তিহীন কল্পনার বস্তু হয়, তাহলে সেই বস্তুর স্বরূপ কী? তাকে মনের ধারণা ছাড়া আর কিছু কি বলা যায়? সুতরাং তার অস্তিত্ব থাকলেও সে কিন্তু কোনো না কোনো নির্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ বলা যায়, সে সাময়িক বা সময়ের গণ্ডীর মধ্যে অন্তত সীমাবদ্ধ। আর তাহলেই তাকে আর আমাদের অর্থে বিমূর্ত বলা যাবে না। বিমূর্ত বস্তুর অস্তিত্ব আছে কথাটির অর্থ হল মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব তার আছে। অবশ্য এই অস্তিত্ব, গরুটির যে অস্তিত্ব, বা এমনকি কাল্পনিক বস্তুর যে অস্তিত্ব, তার থেকে পৃথক করতে হবে।

এরকম বিমূর্ত বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্যিই সন্দেহ জাগে আমাদের। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দর্শনে অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই বিমূর্ত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে আসা হয়েছে। এমনকি এমন কথাও কোনো কোনো দার্শনিক বলেছেন যে, এই বিমূর্ত বস্তুগুলিকে আমরা গরু, ঘট, পট প্রভৃতি আর পাঁচটা অস্তিত্ববান বস্তুর মতো প্রত্যক্ষেই পাই এবং সে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়লব্ধ।

পাশ্চাত্য দর্শনের দিকে তাকালে বিমূর্ত বস্তু সম্বন্ধে আমরা প্রধানত দুটি মত দেখতে পাই। একদল মনে করেন বিমূর্ত বস্তু আছে, অর্থাৎ দেশ-কালের অতীত নিত্য আকারহীন বা মূর্তিহীন বস্তু আছে।[১] একে আমরা ইংরেজিতে অনেক সময় abstract object আখ্যা দিয়ে থাকি। এই মতের পাশাপাশি আর একটি এর ঠিক বিপরীত মতও আমরা পাশ্চাত্য দর্শনে দেখতে পাই। যেখানে ভাবা হয় যে সমস্ত বস্তুই দেশ অথবা কালের সীমানায় আবদ্ধ এবং তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়, অর্থাৎ তাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জানা যায়। এই বস্তুগুলিকে আমরা ইংরেজিতে concrete object বলে থাকি। প্রথম মতের দার্শনিকগণ মনে করেন জগতে দু ধরনের বস্তুই আছে— যেমন, গরু, ঘট, পট প্রভৃতি মূর্ত বস্তু এবং গোত্ব, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম, যেগুলি বিমূর্ত বস্তু। দ্বিতীয় ধারায় বিশ্বাসী দার্শনিকগণ কিন্তু গোত্ব প্রভৃতি ধর্মের কোনো নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বা পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; অর্থাৎ তাঁদের মতে গরু, ঘট, পট প্রভৃতি মূর্ত বস্তুই জগতে আছে, অন্য কোনোরকম বস্তু জগতে নেই। প্রথম দলের দার্শনিকদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিদের নাম করতে হলে আমাদের প্রথমেই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর নাম মনে পড়ে।

যেহেতু প্লেটোর বিমূর্ত বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা এই নিবন্ধের মূল বিষয় নয়, তাই বিস্তারিতভাবে সে আলোচনার মধ্যে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দু একটা কথা বলেই প্লেটোর কথা শেষ করব। আমরা বহু 'ব্যক্তি গরু' প্রত্যক্ষ করি, বহু 'ব্যক্তি ঘট' প্রত্যক্ষ করি। এই ব্যক্তি গরুগুলি বা ব্যক্তি ঘটগুলি কিন্তু প্রত্যেকেই একে অপর থেকে ভিন্ন। তারা যদি প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন গরু, ভিন্ন ভিন্ন ঘট হয়, তাহলে এই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে ভিন্ন নামে না ডেকে আমরা একই নামে ডাকি কেন? নিশ্চয়ই

তাহলে প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন গরুর বা ঘটের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যার জন্যে প্রত্যেকটিকে আমরা একই নামে ডাকি, অর্থাৎ সেগুলিকে গরু বলি কারণ সেগুলি একটি আদর্শ প্রকৃত গরুর অনুকৃতি মাত্র। যে ঘট জীবনে কখনো দেখিনি, তাকেও আমরা ঘট বলে চিনে নিই, কারণ ঘট মাত্রই তো ঐ আদর্শ ঘটের অনুকরণে তৈরি, এই আদর্শ ঘটের অনুকৃতি যেখানেই দেখব সেটাকেই আমরা ঘট বলে চিনে নেব। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে— আদর্শ গরু বা আদর্শ ঘট কি সত্যিই আমরা ঘট, পটের মতো দেখতে পাই? প্লেটো পরিষ্কার বলেছেন— না দেখতে পাইনা।[২] যা কিছু আমরা দেখি বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি তাকে জ্ঞান বলা যায় না। সত্যিকারের জ্ঞান কখনো এমন বস্তুর হয় না যে বস্তুর ধ্বংস হয়। অনিত্য, আজ আছে কাল নেই, এমন বস্তুর জ্ঞানকে প্রকৃত অর্থে জ্ঞান বলা যায় না। আর ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা কেবল সেরকম বস্তু সম্বন্ধেই অবহিত হই, যে বস্তু নিত্য, তা দেশ-কালের অতীত, কারণ যা নির্দিষ্ট দেশ-কালে অবস্থান করে তা অনিত্য হতে বাধ্য; তা উৎপন্ন হয়, ধ্বংস হয়। প্রকৃত জ্ঞানের বিষয় তা-ই হবে যা নিত্য, স্থিতিশীল, অপরিবর্তনীয় নিত্য, স্থিত বস্তুর জ্ঞানই যদি প্রকৃত জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান আমরা কখনোই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লাভ করতে পারব না। তা জানার জন্য আমাদের জ্ঞানলাভের আর একটি যন্ত্র বা উপায় স্বীকার করতে হয়। যার সাহায্যে এই নিত্য বস্তুকে জানা যেতে পারে প্লেটো তার নাম দিয়েছেন reason বা rational faculty। এই reason-এর বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া কঠিন। অনেকে একে বুদ্ধি বলে উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা আপাতত প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় বা যন্ত্র হিসেবে প্লেটোর reason-কে বুদ্ধি বলেই অনুবাদ করব। এই বুদ্ধির সাহায্যে যা জানি তা কিন্তু আজ আছে কাল নেই এরকম কোনো বস্তু নয়। তা হচ্ছে দেশ-কালের অতীত নিত্য, অখণ্ড পদার্থ। এই নিত্য পদার্থগুলিই বিমূর্ত বস্তু। আদর্শ গো, আদর্শ ঘট, আদর্শ পট প্রভৃতি বস্তুগুলি এরকম বিমূর্ত বস্তু এবং বুদ্ধির সাহায্যে এগুলিকে আমরা জানি। এই বুদ্ধির সাহায্যে জানা বস্তুগুলি কিন্তু আছে, তাদের ধ্বংস নেই, আর তাদের অনুকৃতিই হচ্ছে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা-লব্ধ বস্তুগুলি। জগতে আজ যদি সমস্ত ঘট ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও কিন্তু ঐ আদর্শ ঘট ধ্বংস হবে না এবং ভবিষ্যতে যদি কখনো কোনো ঘট উৎপন্ন হয়, তাকে ঘট বলা হবে যদি তা ঐ আদর্শ ঘটের অনুকৃতি হয়। কোনো একটি ঘট ঠিক ঘট হয়েছে কিনা বুঝব কোন্ মাপকাঠির সাহায্যে? ঐ মাপকাঠি হচ্ছে আদর্শ ঘটটি। এই আদর্শ ঘটটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, তাকে আমরা কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই জানতে পারি। সুতরাং যে জ্ঞানের বিষয় অতীন্দ্রিয় তাকেই আমরা আজ বলতে পারি, তার জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য।

প্লেটোর মতে দু ধরনের জগৎ আছে— একটি সৎ এবং অপরটি তার অবভাসমাত্র। শেষোক্ত জগতের বস্তুগুলি পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ আর প্রথমোক্ত জগতের বস্তুগুলি কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য অপরিবর্তনীয়, অবিনাশী পদার্থ। প্লেটোর

মতে এই বুদ্ধিগ্রাহ্য অবিনাশী পদার্থগুলিই প্রকৃত অর্থে সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ববান, অন্য সমস্ত পদার্থ, অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শময় জগৎ হচ্ছে ঐ সৎ-এর অবভাস মাত্র, ঐ সৎ-এরই অনুকরণে উৎপন্ন।

এই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে প্লেটো শিল্প, সাহিত্য সম্বন্ধে যে মত পোষণ করতেন তার একটু আভাস এখানে দিলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকৃত সৎ বস্তুর—জগতের অবভাস মাত্র, কিন্তু যেহেতু এই অবভাসিত জগতের বস্তুগুলি প্রকৃত সৎ জগতের বস্তুগুলির সরাসরি অনুকরণে উৎপন্ন, তাই এই জগতের বস্তুগুলি ঐ সৎ বস্তুগুলির অনেক কাছাকাছি বলা যেতে পারে। একজন শিল্পী পরিদৃশ্যমান জগতের অনুকরণে তার শিল্প সৃষ্টি করেন; একজন কবি অবভাসিত জগতের বস্তুগুলিকে তাঁর 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' অনুকরণ করেন; তাই শিল্পকর্ম বা কবি সাহিত্যিকগণের সৃষ্ট কর্ম সৎ জগতের বস্তু থেকে আরও দূরে অবস্থান করে—They are twice removed from reality. সুতরাং শিল্প সৃষ্টি বা সাহিত্য সৃষ্টির আর যা-ই মূল্য থাক না কেন, তারা সৎ বস্তুর অবভাসের অবভাস মাত্র— তাই তারা সত্যের থেকে অনেক দূরে। তাদের জগৎ পুরোপুরি যেন কল্পনার জগৎ, যে কল্পনা আমাদের সত্যে পৌঁছতে দেয় না।

প্লেটোর এই ধরনের মতবাদ অনেকেই হয়তো মেনে নেবেন না। একটি কথা এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে। কৃষ্ণদাস সিংহরায় নামে মহাত্মা গান্ধীর একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন। কৃষ্ণদাসবাবু একদিন আমার কাছে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি আলোচনার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ভাষায়— গান্ধীজী যাই বলেন রবীন্দ্রনাথ যুক্তির সাহায্যে তাই খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন। শেষকালে গান্ধীজী যখন কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের যুক্তির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না, তখন বললেন—'তুমি কবি, তুমি সত্যদ্রষ্টা, তুমি একদিন আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করবে। যুক্তি দিয়ে সত্যকে জানা যায় না।' এই রকম মতকে যাঁরা সমর্থন করবেন, স্বভাবতই প্লেটোর কথা তাঁরা মেনে নেবেন না।

পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটোর এই ধারাকে অন্যতম প্রধান ধারা আখ্যা দিলে হয়তো অত্যুক্তি করা হবে না। এই ধারার সমস্ত দার্শনিকই মনে করেন শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কখনোই প্রকৃত অর্থে জ্ঞান হতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞান সর্বদাই অভিজ্ঞতাপূর্ব (a priori)। বুদ্ধিগ্রাহ্য একমাত্র এরকম জ্ঞানই নিশ্চয়তা দিতে পারে। এই মতে বিশ্বাসী দার্শনিককে পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণত বুদ্ধিবাদী দার্শনিক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। আধুনিক দর্শনের পিতা দেকার্তে থেকে আরম্ভ করে কান্ট পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বুদ্ধিবাদী দার্শনিকই একথা মেনে নিয়েছেন। লক, বার্কলে, হিউমের মতো যাঁরা অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক তাঁরা যদিও ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলেছেন, তথাপি তাঁরা তার সঙ্গে একথাও স্বীকার করেছেন— অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কখনোই নিশ্চয়তা দেয় না। তাই অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউমের শেষ কথা হল—

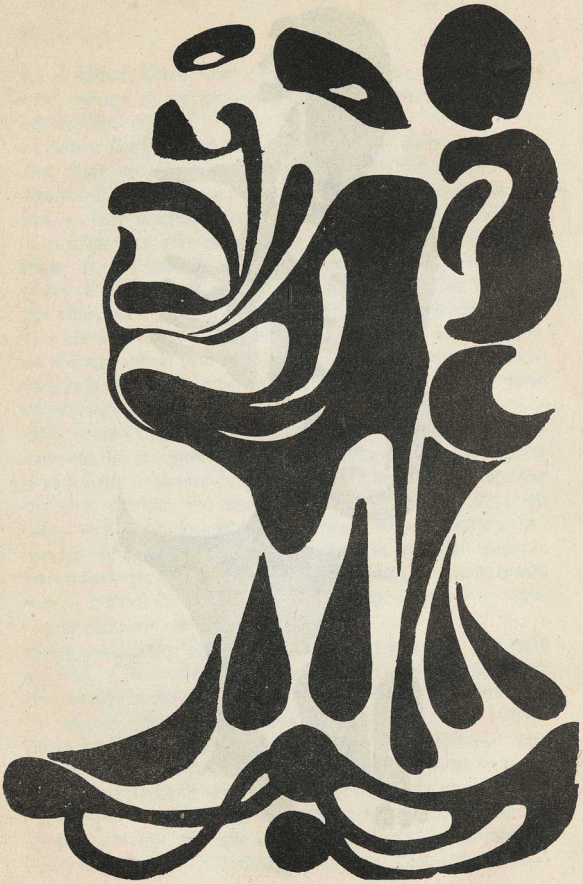

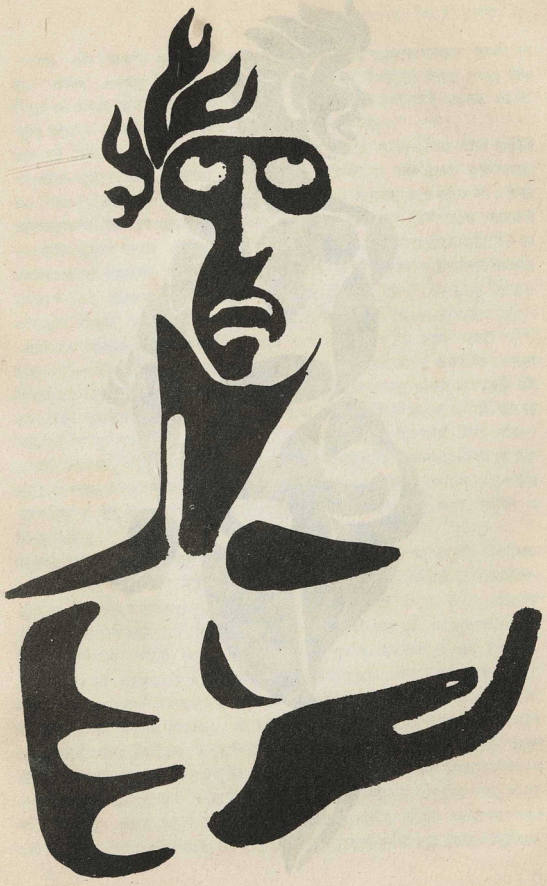

নিশ্চয়তা যদি জ্ঞানের একটি ধর্ম হয় তাহলে বলতে হয় আমাদের কোনো জ্ঞানই হয় না। কারণ, একমাত্র অভিজ্ঞতা-পূর্ব বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানই নিশ্চয়তা দিতে পারে, আর ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা ছাড়া জ্ঞানলাভের যেহেতু কোনো উপায় নেই, তাই জ্ঞানই হয় না প্রকৃত অর্থে। স্বভাবতই এঁরা বিমূর্ত বস্তু স্বীকার করেন না।

অনেকের মতে গাণিতিক বাক্যগুলির জ্ঞান, তর্কবিদ্যার বাক্যগুলির জ্ঞান প্রভৃতি অভিজ্ঞতা-পূর্ব। তাই পাশ্চাত্য দর্শনে ফর্মাল লজিক বা আকারগত তর্কবিদ্যার এত কদর। এই জ্ঞান সর্বদাই নির্ভুল হয়, ভুল হবার সম্ভাবনা এতে থাকে না; আর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কখনোই ভুল হবার সম্ভাবনা মুক্ত নয়। উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক। সাত আর পাঁচ যোগ করলে যে বারো হয় তা জানবার জন্যে আমাদের সাতটি জিনিস ও পাঁচটি জিনিস যোগ করে দেখার দরকার হয় না। এই সংখ্যাগুলির প্রকৃতি জানলে এবং যোগের ধারণা থাকলেই কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই আমরা বুদ্ধির সাহায্যে বলে দিতে পারি যে এর যোগফল বারো। তেমনি তর্কবিদ্যার একটি বাক্য নেওয়া যাক। 'এখন হয় বৃষ্টি হচ্ছে অথবা বৃষ্টি হচ্ছে না'—এই বাক্যটি সত্য, কিন্তু এর সত্যতা নির্ণয়ের জন্যে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতার দরকার হয় না। এটি অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞান, কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই এই জ্ঞান হয়ে থাকে। কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে যে জ্ঞানই লাভ করি, সেই জ্ঞানের বিষয়টিই বিমূর্ত বস্তু। সুতরাং বিমূর্ত বস্তু শুধুমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই জানা যায়—এরকম মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের কাছে আকারগত যুক্তিবিজ্ঞান-এর কদর যে হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের বিষয় কোনো না কোনো ভাবে বিমূর্ত বস্তু বা অন্ততপক্ষে বিমূর্ত সম্বন্ধ। আর তাই এদের জ্ঞান নির্ভুল ও নিশ্চয়াত্মক।

উপরের আলোচনা থেকে এরকম কারও মনে হতে পারে যে, যাঁরা বুদ্ধিবাদী দার্শনিক তাঁরাই কেবল আকারগত যুক্তিবিজ্ঞান (formal logic)-এ বিশ্বাসী। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ আকারগত যুক্তিবিজ্ঞান-এর কথা স্বীকারই করেন না। এইরকম ভাবনা কিন্তু ঠিক হবে না। বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী উভয়েই আকারগত যুক্তিবিজ্ঞান স্বীকার করতে পারেন, তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র এই হবে যে, বুদ্ধিবাদীরা ঐ আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের বিমূর্ত বস্তুগুলিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান বলবেন, অভিজ্ঞতাবাদীরা তাকে জ্ঞান বলবেন না, কারণ তাঁদের মতে জ্ঞান হতে হলে কোথাও একটা নতুনত্ব দরকার। এই ঘটটি ঘট— কোনো জ্ঞানের উদাহরণ নয়, কারণ এটি নতুন কোনো কিছুকে উপস্থাপিত করছে না। সুতরাং এগুলি প্রকৃত অর্থে জ্ঞান পদবাচ্য নয়, যদিও এগুলি নির্ভুল। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের আরও একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বিমূর্ত বস্তু বলে মন-নিরপেক্ষ কোনো বস্তু আছে তা স্বীকারই করেন না। কিন্তু একথা স্বীকার করতে তাঁদের অনেকের বাধা থাকবে না যে, আমরা অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে ব্যক্তিবিশেষকে জানি, তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে

যদি কল্পনায় একে একে বাদ দিয়ে একটি সাধারণ বস্তুতে এসে পৌঁছাই, সেটিকে বিমূর্ত বস্তু বলতে পারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই বিমূর্ত বস্তুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ কল্পনা-নির্ভর, অর্থাৎ এই বিমূর্ত বস্তুগুলি কাল্পনিক সৎ নয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। আমি রাম, শ্যামা, রহিম, আয়েসা প্রভৃতি ব্যক্তি মানুষকে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার সাহায্যে জেনেছি। প্রত্যেকের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে আমরা, একজনকে অপর জন থেকে পৃথক করতে পারি। যেমন, আমরা বলতে পারি—রামের পিতামাতা, রহিমের পিতামাতা ভিন্ন, রামের গায়ের রঙ রহিমের গায়ের রঙ থেকে ভিন্ন, রাম যে দেশ-কালে অবস্থান করে, রহিম তা করে না, ইত্যাদি। এই ভেদক ধর্মগুলিকে কল্পনায় বাদ দিলে যে বস্তুটি পড়ে থাকে তা রামও নয়, রহিমও নয়, অথচ রাম রহিম প্রভৃতি সকলের মধ্যে যে সাধারণ ধর্মটি আছে সেটি। একেই আমরা মানুষত্ব বলে থাকি যা সকল মানুষের সাধারণ ধর্ম হিসেবে থাকে। এই সাধারণ মানুষ বা মানুষত্ব ধর্ম— এরা কেউই কিন্তু বাস্তবের কোনো বস্তু নয় যা রাম, রহিমের মতো দেশ-কালে আছে বলা যায়, এটি একটি চিন্তা বা মন দিয়ে তৈরি বস্তু। একে আমরা ইংরেজিতে অনেক সময় concept বলে থাকি যাকে বাঙলায় প্রত্যয় বা ধারণা বলে অনেক সময় অনুবাদ করা হয়ে থাকে। এই প্রত্যয় বা ধারণার যেহেতু মন-নিরপেক্ষ কোনো অস্তিত্ব নেই, যেহেতু এই ধারণা আমার মনেরই সৃষ্ট, তাই এগুলিকে বিমূর্ত বলা গেলেও, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতন মন-নিরপেক্ষ বিমূর্ত বস্তু বলা যায় না। অর্থাৎ এই ধারণাগুলি সম্বন্ধে বলা যায় না যে, এরা আগের থেকেই আছে, আমরা কেবল এগুলিকে বুদ্ধি দিয়ে জানি বা আবিষ্কার করি না; বলতে হয় এই ধারণাগুলি আগে থেকে নেই আমরা এগুলিকে সৃষ্টি করি, আবিষ্কার করি না। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে এই বিমূর্ত বস্তুগুলি সামান্যীকরণের সাহায্যে আমরা তৈরি করলেও, এরা অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুরই মনে মনে বা চিন্তার সাহায্যে অমূর্তায়ন বা পৃথকীকরণ। তাই এদের জ্ঞানকে অভিজ্ঞতাপূর্ব বলা যায় না। কিন্তু, চিন্তার সাহায্যে যেহেতু এগুলি উৎপন্ন অভিজ্ঞতা থেকে যা পাই— তা থেকেই অমূর্তায়নের ফল, তাই এই বস্তুতে জ্ঞানের মধ্যে নতুনত্ব থাকে না, এই জ্ঞানগুলি আমাদের নতুন কোনো খবর দেয় না, আর তার ফলেই একে প্রকৃত অর্থে জ্ঞান বলা যায় না যদিও এইরকম তথাকথিত জ্ঞান আমাদের নানা কাজে লাগে। বিমূর্ত যুক্তিবিজ্ঞান তাই অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে নতুন কোনো জ্ঞান নয়, আর তাই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানই নয়—'ঘটটি ঘট' এই রকম কোনো তথাকথিত জ্ঞান। তথাকথিত জ্ঞানই হোক আর প্রকৃত জ্ঞানই হোক, যেহেতু এগুলি বিমূর্ত বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা দ্বারা প্রাপ্ত অথবা বুদ্ধি দ্বারা আবিষ্কৃত জ্ঞান তাই এই জ্ঞানের মধ্যে নিশ্চয়তা থাকবেই। যদি এই বিমূর্ত বস্তুগুলি অভিজ্ঞতায় পেতাম তাহলে আর এক্ষেত্রে নিশ্চয়তা থাকত না। এই নিশ্চয়তা কথাটির অর্থ কিন্তু কেবলমাত্র বাস্তবিক নিশ্চয়তা নয়, এই নিশ্চয়তা কথাটির অর্থ এমন একটি নিশ্চয়তা যা কোনোভাবেই অনিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।

দার্শনিকগণ এই ধরনের নিশ্চয়তাকে logical certainty (as opposed to psycho-logical certainty) আখ্যা দিয়ে থাকেন। যে কোনো আকারগত যুক্তিবিজ্ঞান (formal logic)-এ এইরকম নিশ্চয়তা থাকে। এই রকম বিমূর্ত আকার বা বিমূর্ত সম্বন্ধের উপর যুক্তি বা অনুমান প্রতিষ্ঠিত হলে সেই অনুমান বৈধ হতে বাধ্য, এর অন্যথা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু এমন কোনো দার্শনিক যদি থাকেন যাঁরা বিমূর্ত বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন অথচ বলেন বিমূর্ত বস্তুগুলি ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাতেই পাওয়া যায়। তাঁদের মতে formal logic বা আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের মধ্যে কোনোরকম যৌক্তিক নিশ্চয়তা (logical certainty) থাকতে পারবে না। অর্থাৎ সেই যুক্তিবিজ্ঞানের অনুমানগুলি বৈধ হলেও, তাদের সম্বন্ধে একথা বলা যাবে না যে, এগুলি অবৈধ হওয়া অসম্ভব বা যুক্তির দিক থেকে অসম্ভব (logically impossible)।

পাশ্চাত্য দর্শনের যে ধারা নিয়ে এই আলোচনা করছি সেই ধারার কোনো দার্শনিক সম্প্রদায়ই অভিজ্ঞতার সাহায্যে বিমূর্ত বস্তুর জ্ঞান লাভ করার সম্ভাবনা স্বীকার করবেন না[৩], কিন্তু প্রাচ্য দর্শনের এই ধারার দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব কোনো কোনো ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়, যেমন ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বিমূর্ত বস্তুর জ্ঞান স্বীকার করেছেন।

ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় মনে করেন— এটি ঘট, এটি ঘট বলে যে আমাদের অনুগত প্রতীতি হয়, এই অনুগত প্রতীতিকে ব্যাখ্যা করতে হলে প্রত্যেক ঘটের মধ্যে একটি অনুগত ধর্ম স্বীকার করতে হয়। এই অনুগত ধর্মটি ঘটের ক্ষেত্রে ঘটত্ব, গরুর ক্ষেত্রে গোত্ব, পটের ক্ষেত্রে পটত্ব— এই রকম। এই অনুগত ধর্মকে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় জাতি বলে অভিহিত করেছেন। এই জাতিগুলির কোনো আকার নেই, যদিও এরা সমস্ত কালে এবং সর্বত্র বিদ্যমান। সমস্ত কালে বিদ্যমান বলার অর্থ হল এই যে, জাতির কোনো উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই— এটি একটি নিত্য পদার্থ। সর্বত্র বিদ্যমান কথাটির অর্থ এই নয়। যে ঘটেও গোত্ব জাতি দেখা যাবে, এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত ঘটের মাধ্যমে ঘটত্ব প্রকাশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সমস্ত ঘটেই— ঘটত্ব বিদ্যমান এবং প্রকাশিত। যেমন গো মাত্রই গোত্ববিশিষ্ট। এই ধর্মটিই গো-কে অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক করে, তাই একে এক অর্থে ভেদক ধর্মও বলা হয়ে থাকে। ঘট, পট, গরুর পার্থক্য এই যে, ঘটে ঘটত্ব ধর্ম থাকে, পটত্ব বা গোত্ব থাকে না। এই ঘটত্ব ধর্ম থাকার জন্যেই আমরা ঘটকে ঘট বলে থাকি, ঘটকে ঘট বলে চিনে থাকি এবং ঘটকে ঘট বলে জেনে থাকি। এই ঘটত্বের কিন্তু কোনো আকার বা মূর্তি নেই। তাই একে বিমূর্ত বস্তু বলতে কোনো বাধা নেই। এখানে লক্ষণীয় পাশ্চাত্য দর্শনের যে আলোচনা করেছি সেই আলোচনায় বিমূর্ত বস্তুগুলি দেশ-কালের অতীত বলে বুঝেছি। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের বিমূর্ত বস্তুগুলি দেশ-কালের অতীত নয়, বরং তাদের সর্বকালীন বলাটাই ঠিক হবে। কিন্তু, দেশ-

কালের অতীত বা সর্বকালীন যাই বলি না কেন, দুটি মতেই এই বিমূর্ত বস্তুগুলি কিন্তু নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশহীন পদার্থ।

পাশ্চাত্য দর্শনে অনেক সময় ইন্দ্রিয় ছাড়াও বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা যায় বলে স্বীকার করা হয়েছে। বিমূর্ত বস্তুগুলি তাই শুধুমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে সমস্ত জ্ঞানের মূলেই ইন্দ্রিয় রয়েছে। বুদ্ধিকে তাঁরা জ্ঞানলাভের উপায় হিসেবে বা যন্ত্র হিসেবে স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন ঘট, পট, গো-কে যেমন আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানি, ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্বকেও আমরা ঐ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই জানি। ঘটকে যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করি, ঘটত্বকেও আমরা প্রত্যক্ষ করি। প্রশ্ন উঠতে পারে— ঘটকে তো আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি, ঘটত্বকেও কি আমরা সেইরকম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি? ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় কিন্তু তা-ই বলবেন। কেবল তার সঙ্গে যোগ দেবেন আর দুটি কথা। (১) ঘটের প্রত্যক্ষ আমরা অনুব্যবসায়ের সাহায্যে জানতে পারি, কিন্তু ঘটত্বের প্রত্যক্ষ অনুব্যবসায়-গম্য নয়। তা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলতে তাঁরা কী বোঝেন সে সম্পর্কে আমি পরে সামান্য কিছু আলোচনা করব। (২) ঘটের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় ও ঘটের মধ্যে যে সম্বন্ধ হয়, ঘটত্বের প্রত্যক্ষে একটি ভিন্ন সম্বন্ধ লাগে।

এসব কথা ভালোভাবে বুঝতে গেলে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা প্রয়োজন। এখানে খুব সংক্ষেপে তাঁদের প্রত্যক্ষ নিয়ে আলোচনা করেই ক্ষান্ত হতে চাই। এটুকু আলোচনা না করলে তাঁদের মতটি বোধগম্য হওয়াই কঠিন হবে।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে— ইন্দ্রিয় ছ'টি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ হচ্ছে বহিরিন্দ্রিয় এবং মন হচ্ছে অন্তরিন্দ্রিয়। (৪) যে কোনো ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধের ফলে যে জ্ঞান আত্মাতে উৎপন্ন হয় তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এখানে আরও দু'একটি কথা বলা দরকার। ন্যায়-বৈশেষিক মতে জগতের সমস্ত বস্তুকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তারা হচ্ছে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। দ্রব্য আবার নয়টি : ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্, দিক্, কাল, আত্মা ও মন। গুণ চব্বিশটি। এই গুণগুলি কখনোই কোনো না কোনো দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না, সমস্ত গুণই কোনো দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না, সমস্ত গুণই কোনো না কোনো দ্রব্যাশ্রিত। এর মধ্যে কোনো কোনো গুণ ঘট, পটের মতো বহির্দ্রব্যে থাকে। যেমন ঘটের রূপ বা রঙ। আবার কিছু কিছু গুণ আত্মারূপ দ্রব্যে থাকে। যেমন, জ্ঞান, ইচ্ছা, সংস্কার প্রভৃতি। এই জ্ঞান আত্মার আগন্তুক ধর্ম বা গুণ। আত্মাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান উৎপত্তির জন্যে প্রথমে আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ দরকার হয়। আত্ম-মন সংযোগ না হলে কোনো জ্ঞানই উৎপন্ন হবে না। সুতরাং জ্ঞানমাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ হচ্ছে আত্ম-মন সংযোগ। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে হলে মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ আবশ্যক। আমি যদি আমার সামনে যে ঘটটি রয়েছে

তার দিকে পেছন ফিরে থাকি বা তার সঙ্গে যদি আমার চোখের মিলন না হয় বা ত্বকের স্পর্শ না হয় তাহলে ঘটটির প্রত্যক্ষ হবে না। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ না হলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হবে না। তাই ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভেদক কারণ বা বিশেষ কারণ বলা হয়ে থাকে। এই ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সম্বন্ধ কিন্তু নানারকমের হতে পারে। ঘটের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ঘটের সম্বন্ধ হচ্ছে সংযোগ। সংযোগ সম্বন্ধের অর্থ দৈহিক মিলন বা সংযোগ (physical contact)। দুটি দ্রব্যের মধ্যেই এই সংযোগ সম্বন্ধ থাকতে পারে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে— ঘটের যখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং ঘটের মধ্যে সর্বদাই একটা ব্যবধান থাকে। এখানে দৈহিক সংযোগ হবার সুযোগ কোথায়, তাহলে তো এক্ষেত্রে দৈহিক সংযোগ ছাড়াই ঘটের প্রত্যক্ষ হয়ে যাচ্ছে না কি? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ বলেন— যে চোখকে আমরা দেখতে পাই, যাকে চোখ বলে বুঝি সেটি কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় নয়, সেটি ইন্দ্রিয়-স্থান মাত্র। চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজ পরমাণু দিয়ে তৈরি এবং অতীন্দ্রিয় পদার্থ। তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই তেজ পরমাণু ইন্দ্রিয়-স্থান থেকে বেরিয়ে এসে ঘটরূপ দ্রব্যের সঙ্গে দৈহিকভাবে সংযুক্ত হয়। এই তেজ পরমাণুও দ্রব্য (পৃথিবী নয়টি দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত) এবং ঘটও একটি দ্রব্য, তাই এদের মিলনকে সংযোগ বলা হয়ে থাকে।

ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় সমবায় নামে একটি সম্বন্ধ স্বীকার করে থাকেন। সমবায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে একটি ছোটখাট পুস্তিকার আকার ধারণ করবে। তাই তাঁদের মতে কোন্ কোন্ বিষয়ের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ থাকে তার উল্লেখমাত্র করব। পাঁচ রকমের অযুতসিদ্ধ (inseparable) পদার্থের জুড়ির মধ্যেকার সম্বন্ধকে এঁরা সমবায় সম্বন্ধ আখ্যা দিয়েছেন। যেমন— (১) দ্রব্য ও গুণ, (২) দ্রব্য ও কর্ম, (৩) দ্রব্য, গুণ কর্ম ব্যক্তি ও তাদের জাতি, (৪) নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ, এবং (৫) অবয়ব ও অবয়বী। ঘট ও ঘটত্ব জাতির মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ বিদ্যমান। ঘটত্বকে যখন প্রত্যক্ষ করি তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ঘটত্বের মধ্যে সম্বন্ধ হচ্ছে সংযুক্ত-সমবায়। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় হচ্ছে চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং বিষয় ঘটত্ব; ঘটত্ব ঘটে সমবায় সম্মন্ধে থাকে, এবং ঘট চক্ষুসংযুক্ত, তাই ঘটত্বের সঙ্গে চক্ষুর সম্বন্ধকে সংযুক্ত সমবায় বলা হয়ে থাকে। ঘটত্ব বিমূর্ত বস্তু, তাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই জানি, তাকে জানবার জন্যে বুদ্ধি ব'লে কোনো নতুন জ্ঞানলাভের উপায় বা যন্ত্রকে স্বীকার করতে হয় না।

ঘটকে যে আমরা প্রত্যক্ষ করি তা সকলেই স্বীকার করবে। কিন্তু, ঘটত্বকে প্রত্যক্ষ করি— এ আবার কেমন কথা? এর উত্তরে বলা যায়, ঘটকে যে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা আমরা আবার অনুব্যবসায়ের সাহায্যে জানি। ঘটকে জানার পর ঐ ঘটজ্ঞানকে বিষয় করে যখন আমাদের মানস প্রত্যক্ষ হয় সেই প্রত্যক্ষে আমি যে ঘট জানি তা-ও জানি। এইরকম প্রত্যক্ষে মনরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘটজ্ঞানরূপ বিষয়ের সম্বন্ধ হয়।

এইরকম মানস প্রত্যক্ষকেই অনুব্যবসায় বলা হয়। এইভাবে আমরা জানতে পারি যে ঘটজ্ঞান আমার হয়েছে। কিন্তু, এমন জ্ঞানও আমাদের হয় যার অনুব্যবসায় হয় না। এই রকম জ্ঞানকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলা হয়। ঘটত্বের যে জ্ঞান আমাদের হয় তা নির্বিকল্পক জ্ঞান, তাই ঘটত্বকে যে আমরা প্রত্যক্ষে জেনেছি তা জানতে পারি না। কারণ ঘটত্বের জ্ঞানকে বিষয় করে আমাদের অনুব্যবসায় হয় না। নির্বিকল্পক জ্ঞান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা না করে যেটুকু আমাদের প্রয়োজন সেটুকুই বলেছি।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে শুধু ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিই যে বিমূর্ত বস্তু, তা নয়; গুণ, কর্ম, সমবায় অভাব প্রভৃতি আরও অনেক পদার্থকে বিমূর্ত বস্তু বলা যায়, এবং এদের সকলের জ্ঞানই— শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ যেমন বিমূর্ত বস্তুর নিরপেক্ষ অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁদের মতে যেমন আগে থেকেই আছে এমন বিমূর্ত বস্তুকে আবিষ্কার করার বা জানার প্রশ্ন ওঠে না, ন্যায়-বৈশেষিক মতে কিন্তু তা নয়। এঁরা বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতোই মনে করেন বিমূর্ত বস্তুর মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আগে থেকেই আছে, আমরা কেবল তাকে জানি বা আবিষ্কার করি। কিন্তু, বুদ্ধিবাদীদের সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকের পার্থক্য হল তাঁরা মনে করেন ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই এই জ্ঞানের উৎস, বুদ্ধি এই জ্ঞানের উৎস নয়। তাই অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের কথা তাঁরা স্বীকার করেন না। আর ফলে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের ধারণা দেখতে পাওয়া যায় না। তাই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে যখনই নিশ্চয়তার কথা বলা হয় তা যৌক্তিক নিশ্চয়তা নয়, তা হচ্ছে বাস্তবিক নিশ্চয়তা। একই জিনিস একই সঙ্গে সাদা এবং অ-সাদা হতে পারে না, তার কারণ আমরা এরকম চিন্তা করতে পারি না। অর্থাৎ অচিন্তনীয় বলে আমরা কোনো একটা জিনিসকে একই সঙ্গে সাদা ও অ-সাদা হতে পারে না, তার কারণ আমরা এরকম চিন্তা করতে পারি না। অর্থাৎ অচিন্তনীয় বলে আমরা কোনো একটা জিনিসকে একই সঙ্গে সাদা ও অ-সাদা বলতে পারি না— এই যে স্ব-বিরোধের নীতি, এটি চিন্তার নিয়ম। বুদ্ধি দিয়েই এটা আমরা বুঝি বা জানি, এই কথাই পাশ্চাত্য দর্শনে বলা থাকে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় বলবেন যে, এটি অচিন্তনীয় কারণ আমরা কখনোই এক জিনিসে সাদা এবং অ-সাদা রূপ প্রত্যক্ষ করি না। এটা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করি না বলেই আমরা স্ব-বিরোধ নীতি মানি। এটা অভিজ্ঞতাপূর্ব বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান নয়, এটি অভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞান মাত্র।

এতক্ষণ আমরা বিমূর্ত বস্তু সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের একটি ধারা এবং ভারতীয় দর্শনের একটি ধারা নিয়ে আলোচনা করলাম। উভয় দর্শনেই অন্য ধারাও আছে। সেই ধারা নিয়ে কোনো আলোচনা করা তো হলই না, এমনকি যে ধারা নিয়ে আলোচনা করেছি তার মধ্যেও যে কত রকম বৈপরীত্য ও মতবিরোধ আছে তা-ও ভালোভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে যে আলোচনা করেছি তা খুব সাধারণ ও স্থূলভাবেই করেছি, সূক্ষ্মতার দিক থেকে বিচার করলে এর মধ্যেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গেছে হয়তো।

কিন্তু মূল কথাটা যেটা বলতে চেয়েছি সেটিকে ঐ ধারার বক্তব্য বলে সনাক্তকরণ করলে ভুল হবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বিমূর্ত বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে দুটি প্রধান মত পাওয়া যায়। একটি মতে বিমূর্ত বস্তুগুলির মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে এবং যা নিত্য, উৎপত্তি-বিনাশহীন পদার্থ। অপর মতে বিমূর্ত বস্তুগুলিকে আমরা পৃথকীকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করি। প্রথম মতটিকে যদি অস্তিত্ববাদ বলি তাহলে দ্বিতীয় মতটিকে সৃষ্টিবাদ বলা যেতে পারে— অর্থাৎ অস্তিত্ববাদে বিমূর্ত বস্তুগুলি আগে থেকেই আছে, সৃষ্টিবাদে বিমূর্ত বস্তুগুলি আগে থেকে নেই, তাকে আমরা পৃথকীকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করে থাকি।

এই দুটি মতবাদ যদি সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি যে কোনো কলার সঙ্গে যুক্ত করি তাহলে ছবিটি কীরকম দাঁড়াবে দেখতে চেষ্টা করা যাক। যাঁরা অস্তিত্ববাদে বিশ্বাস করবেন তাঁরা দু' ধরনের কলার কথা বলতে পারেন। ১: যে কোনো কলাসৃষ্টি হচ্ছে ঐ বিমূর্ত বস্তুর অনুকৃতি মাত্র। প্লেটোর কথা যদি বলি, তাহলে তিনি বলবেন ঘট, পট, মানুষ যেমন আদর্শ ঘট, পট, মানুষের অনুকৃতি, ঘট, পট, মানুষের যখন ছবি আঁকি তখন সেগুলি ঐ অনুকৃতির অনুকৃতি। তাঁদের মতে একটি ছবি ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তার বিচার হবে ছবিটি কতটা সাফল্যের সঙ্গে অনুকরণ করা হয়েছে তার উপর। অর্থাৎ যাকে দেখে ছবিটি আঁকা হচ্ছে সেই বস্তুটির সঙ্গে তার কতটা মিল আছে তা দেখে। এসব কথার পূর্বাভাস আমরা আগেই দিয়েছি। ২: প্লেটোর মতো করে যাঁরা ভাবেন না অথচ শাশ্বত, নিত্য, বিমূর্ত বস্তু যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরা অনেকে মনে করেন ঐ বিমূর্ত বস্তুই শিল্পের মাপকাঠি। তাঁরা তাঁদের শিল্পে ঐ বিমূর্ত বস্তুরই একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ দেবার চেষ্টা করে থাকেন। তাই ঐ শিল্প-সৃষ্টিকে আমরা বিমূর্ত বস্তুর মতন শাশ্বত, নিত্য বলে থাকি। ধ্রুপদী সাহিত্য, ধ্রুপদী সঙ্গীত, ধ্রুপদী চিত্রশিল্প— এ সমস্ত ক্ষেত্রেই যেন ঐ বিমূর্ত শাশ্বত বস্তুকেই ধরবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, তাই তাকে এক অর্থে সর্বকালীন বলা হয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত, একটি ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়ছে। প্রখ্যাত সেতার শিল্পী বিলায়েত হোসেন খাঁ-র বাজনা শুনতে গিয়েছিলাম। অসাধারণ বাজালেন এবং সমস্ত দর্শকের করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে গেল। উনি তখন খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন— "আমি ঈশ্বরের চাকর মাত্র (তাঁর কাছে ঈশ্বর হচ্ছে বিশুদ্ধ সুর)। ঐ বিশুদ্ধ সুরকে আমি দেখতে পেয়ে তারই প্রকাশ আমার যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে করার চেষ্টা করে থাকি।" তাঁর কথার তাৎপর্য আমি যা বুঝেছিলাম তা হচ্ছে— বিশুদ্ধ সুর যেন কোথাও একটা আগে থেকেই রয়েছে, যা বিমূর্ত, যা শাশ্বত, যা সাধারণের চোখে ধরা পড়ে না। তাঁর বাদ্যযন্ত্রে ঐ সুরেরই যেন একটা রূপ ধরা পড়েছে। ঐ বাজনাটি তাই ধ্রুপদী যার উৎকর্ষ সর্বকালীন। যাঁরা ঐ সুরকে সামান্যভাবেও প্রত্যক্ষ করতে পারেন বা অনুভব করতে পারেন তাঁরাই কেবলমাত্র এই বাজনাকে সুন্দর, অসাধারণ বলবেন। যার জ্ঞান

ঐ সূত্রকে প্রত্যক্ষ করার জন্য তৈরি করা হয়নি সে হয়তো এর উৎকর্ষ তত ভালোভাবে বুঝতে পারবে না। এই অর্থেই হয়তো মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে সত্যদ্রষ্টা বলে থাকবেন।

যাঁরা অস্তিত্ববাদে বিশ্বাস করেন না, সৃষ্টিবাদে বিশ্বাস করেন তাঁদের মতে শিল্পসৃষ্টি আগে থেকে অবস্থিত কোনো বিমূর্ত বস্তুকে রূপ দেবার চেষ্টা করা নয়। তাঁরা বিমূর্ত বস্তুকে নিজের কল্পনায় পৃথকীকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করেন। এই পৃথকীকরণের সাহায্যে কল্পনায় সৃষ্ট যে শিল্পকলা তা-ই তাঁদের মতে শিল্পকলা। অস্তিত্ববাদীর ক্ষেত্রে ভালো, মন্দ শিল্পে মানদণ্ডটি যে আগে থেকে রয়েছে, তারই প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম করছেন ; আর সৃষ্টিবাদীর ক্ষেত্রে ঐ ভালো-মন্দর মানদণ্ডটি সে তৈরি করে নিচ্ছে। ঐ তৈরি করা মানদণ্ড, তৈরি হওয়ার পর অনেক সময় শাশ্বত রূপ ধারণ করতে পারে। কিন্তু অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ বলবেন, যে সমস্ত তৈরি করা মানদণ্ড শাশ্বত বলে পরিচিত হয় সেগুলি আসলে ঐ আগে থেকে থাকা মানদণ্ডের অনুরূপ বলেই হয়। আর তা না হলে ঐ সৃষ্ট মানদণ্ড সাময়িকই হবে, কোনো নির্দিষ্ট দেশে, নির্দিষ্ট কালের পরিপ্রেক্ষিতেই তার মূল্যায়ন হবে, সেই মূল্যায়ন চিরকালীন বা শাশ্বত হবে না। সেইরকম সৃষ্ট মানদণ্ডে যার বিচার হবে সেই বিচারে কোনো একটি শিল্পসৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট সময়, একটি নির্দিষ্ট যুগে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রশংসা পাবে, সর্বযুগে সর্বকালে প্রশংসা পাবে না। অথবা একই সময় কেউ তাকে উৎকৃষ্ট শিল্প বলে প্রশংসা করবে, অপর কেউ তাকে নিকৃষ্ট শিল্প আখ্যা দেবে।

দর্শনে অস্তিত্ববাদ এবং সৃষ্টিবাদের দ্বন্দ্বকে আমরা ধ্রুববাদ (essentialism) এবং আপেক্ষিকতাবাদের (relativism) দ্বন্দ্ব বলেও হয়তো আখ্যা দিতে পারি।

ধ্রুববাদের বিরুদ্ধে একটা জেহাদ অনেকদিন থেকেই দানা বেঁধে উঠেছে এবং দর্শনে, সাহিত্যে, শিল্পে তার প্রতিফলনও পড়েছে। একদিকে যেমন অস্তিবাদী (existentialist) দার্শনিকগণ ধ্রুববাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, অপরদিকে অতি আধুনিককালে দেরিদা (Derrida) প্রমুখ দার্শনিকগণও ধ্রুববাদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। অন্য কোনো প্রবন্ধে এর বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। □

---

১. এই বস্তুগুলি আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অর্থাৎ এদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানা যায় না।

২. তখন আবার স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে— যদি কখনো তাদের দেখতেই না পাই, তাহলে তারা যে প্রকৃতই আছে তা জানি কীভাবে? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরই তো জ্ঞান হতে পারে। অতীন্দ্রিয় পদার্থ অলীক বস্তু, অবাস্তব কল্পনামাত্র। সুতরাং যে জ্ঞানের বিষয় অতীন্দ্রিয় পদার্থ তার আবার জ্ঞান কীভাবে হয়? এর উত্তরে প্লেটো বলেন—

৩. যদিও কোন্ বস্তুকে বিমূর্ত বস্তু বলব এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। প্লেটোর মতে আদর্শ ঘট, পট, সৌন্দর্য (beauty), ন্যায়ধর্ম (justice) প্রভৃতি হচ্ছে বিমূর্ত বস্তু, অনেকের মতে আবার ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি হচ্ছে বিমূর্ত বস্তু, যা সমস্ত ব্যক্তি ঘটে, ব্যক্তি পটে থাকে। যদি বিভিন্ন দার্শনিকের বিমূর্ত বস্তুর একটা তালিকা দেওয়া যায় তাহলে তার মধ্যে যে শুধু প্লেটোর আদর্শ বস্তুগুলি থাকবে তাই নয়, তার মধ্যে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম (properties), বিভিন্ন সম্বন্ধ (relations), প্রত্যয় (concept), অপেক্ষক (function), দল বা শ্রেণী (sets or classes) সংখ্যা (numbers) বচন (propositions), নমুনা (types), বিন্দু (points) প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিমূর্ত বস্তু বলতে যাই বুঝি না কেন, পাশ্চাত্য দর্শনের এই ধারায়, কোনো বিমূর্ত বস্তুরই জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হতে পারে না।

৪. এই মন কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে Mind বলতে বা বুঝি তা নয়। পাশ্চাত্য দর্শনের Mind-কে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের আত্মার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

রোগনির্ণয় ও চিকিৎসায় বিমূর্তের ভূমিকা

শুভানন রায়

রোগীর চিকিৎসা বস্তুত বিমূর্ত এবং অ-বিমূর্ত, দুই পদ্ধতির মিশ্রণ।

'ডায়াগনোসিস' বা রোগনির্ণয় প্রথমত রোগীর 'সিম্‌টম'-এর উপর নির্ভর করে। রোগী বলে যে আমার খুব পেট ব্যথা করছে বা খুব সর্দি লেগেছে। এইভাবে রোগী তার অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলে যেতে থাকে।

তারপর আমরা তাকে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করি, 'ডায়াগনোসিস'-এ একটা অংশ যেমন শারীরিক অসুস্থতা কতটুকু সেটা দেখা, তেমনই রোগীর মানসিক কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটাও চিকিৎসকের বিচার্য। রোগীর মানসিক গঠন এবং ব্যক্তিগত জীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা সহজ নয়। যেমন, একজন 'হাইপারটেনশন'-এর রোগীর কথা ধরা যাক। হয়তো চরিত্রের দিক থেকে সে একজন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। আমি যদি তাকে ক্রমাগত ওষুধই দিয়ে যাই তবে তার মানসিক চাপ কমবে না। কিছুদিন পর ওষুধেও কাজ হবে না। তার প্রয়োজন জীবনকে সহজভাবে নেবার শিক্ষা।

শারীরিক ও মানসিক দুটো অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে আমাকে তার চিকিৎসা করতে হবে।

'ডায়াগনোসিস'-এ বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলার সূত্র খোঁজা হয়।

রোগী যখন নিজেকে দেখাতে আসে বা তার আত্মীয়স্বজনরা যখন তাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে আসে তখন আমরা রোগীর মুখে বা যারা তাকে এনেছে তাদের মুখে একধরনের বর্ণনা পাই— অসুখের, আঘাতের বা যন্ত্রণার।

প্রথম পর্যায়ে সমস্তটাই বিশৃঙ্খল। আমরা ধরে নিই যে রোগী এবং তার আত্মীয়স্বজনরা গুছিয়ে, চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, কার্যকরভাবে পেশ করতে পারবে না। এটাই স্বাভাবিক। সমস্তটাই শুরুতে তালগোল-পাকানো, অস্বচ্ছ এবং পরম্পরাহীন হয়ে থাকে।

অতঃপর আমাদের কাজ হল ঐ এলোমেলো কথাবার্তার মধ্যে একটা শৃঙ্খলার সূত্রকে খোঁজা।

এখানে একটা সমস্যা আছে।

প্রথমত, শৃঙ্খলার নামে রোগীকে একটা আবদ্ধ অবস্থার মধ্যে এনে ফেললে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা বাড়তে পারে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হয়তো রোগী (ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়) গোপন করছে। তার ফলে একটা ধাঁচ বা স্ট্রাকচার তৈরি করায় ত্রুটি ঘটতে পারে।

দ্বিতীয়ত, চিকিৎসকও নিরপেক্ষ নন। তাঁর অধীত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার মধ্যে আলোচ্য রোগীর অসুস্থতার একটি উদাহরণ এবং পূর্বনির্ধারিত কার্যকারণ সম্পর্ক তিনি খুঁজবেন। তারপর, মেলানোর দায়। এই 'ম্যাচিং' করানো একটি মৌলিক কাজ। এইখানে বিমূর্ত চিন্তার একটি মুখ্য এবং সক্রিয় ভূমিকা আছে। অর্থাৎ আমরা ক্রমে অ্যাবস্ট্রাকশনের দিকে যেতে থাকি।

মানুষ তো কার্যক্ষেত্রে, সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে, সর্বত্র এই-ই করে থাকে। বহু বিশৃঙ্খল সংবাদ, তথ্য, ঘটনা, ছবির মধ্যে থেকে একটা সূত্র, একটি নিয়ম, এক পরম্পরা খোঁজাই তো ফলিত বিজ্ঞানের কাজ। ইংরেজিতে যাকে বলা চলে— 'এ সার্চ ফর এ প্যাটার্ন'।

তারপর শুরু হয় শারীরিক পরীক্ষা। তার নানা পথ নির্ধারিত আছে। রোগীর পুরনো ইতিহাস পর্যালোচনা করারও প্রয়োজন থাকে। আজকাল 'প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট' অর্থাৎ রক্ত-মল-মূত্র পরীক্ষা না করে চিকিৎসকরা জটিলতর অসুখের চিকিৎসার দিকে যেতে চাইবেন না। রক্তচাপের রোগীর জন্য চাই 'ই. সি. জি রিপোর্ট' বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চাই 'এক্স-রে' ছবি।

অতীতে যেমন নাড়ী দেখে অভিজ্ঞ কবিরাজরা অনেক কিছু বলতে পারতেন— আজকাল আর তেমনটি হয় না। যদিও আমাদের প্রত্যেককেই নাড়ী দেখায় অভ্যস্ত হতে হয়। কিন্তু শুধু ওটুকুই যথেষ্ট নয়।

তারপর আসে ওষুধ এবং পথ্যের বিধান। এখানেও আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র বহুদূর

প্রসারিত। এক-একটা ওষুধই এক-একটা পরিবার।
যেমন ধরা যাক পেনিসিলিন। বহু রকমের পেনিসিলিন আছে। কোন্ রোগে কোন্‌টি কার্যকর হবে এটা চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতা এবং পঠনপাঠন থেকে জেনেছেন। প্রতিটি ওষুধেরই কিছু-না-কিছু অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়া থাকে। সেগুলিরও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।
কী পরিমাণ ওষুধ ব্যবহৃত হবে— সেটাও বিবেচ্য। তারপর শল্যচিকিৎসার কথা আসে।
অর্থাৎ আমরা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও বিধানের দিকে যেতে থাকি।
এই ভাবে, প্রথমে যে তালগোল-পাকানো একটা সমস্যার কথা বলেছিলাম, অর্থাৎ রোগী প্রথম দর্শনে চিকিৎসকের কাছে যে-চিত্রটি মেলে ধরে— তার জট ক্রমে খুলতে থাকে। এর মধ্যে অবশ্যই ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
বিমূর্ত এবং অ-বিমূর্তের মধ্যে যাতায়াতে অসতর্ক এবং অনভিজ্ঞ পা ফেলার সম্ভাবনাকে কেউ অস্বীকার করবে না।
কিন্তু আমরা যে-শাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করি, অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্র, তার সাধারণভাবে বলা যায় দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে।
প্রথমত, এটি 'এমপিরিক্যাল' বা পরীক্ষামূলক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান নির্ভর। সহজ-ভাবে বলা যায়, চোখে-দেখা, কানে-শোনার এখানে প্রধান ভূমিকা।
দ্বিতীয়ত, রোগনির্ণয়ের পদ্ধতিটি হল 'ডিডাকটিভ' অর্থাৎ অবরোহী। ব্যাখ্যা করে বলা চলে যে, বহু কিছু চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ দেখার পর চিকিৎসক একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যার সঙ্গে জড়িত থাকে অধীত জ্ঞান ও পূর্ব অভিজ্ঞতা।
বলা বাহুল্য প্রতিটি চিকিৎসক কাজের প্রতিটি স্তরে তাঁর নিজস্ব মানসিক প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন নাও থাকতে পারেন। কিন্তু এই নক্সা বা 'স্ট্রাকচার'টি না জানলে কোনো চিকিৎসকের শাস্ত্রাধিকার হয় না। অর্থাৎ, তাঁর রোগনির্ণয়, চিকিৎসা বা ওষুধপথ্যের বিধান দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। □

অরূপের রূপ ও ভাষা

মনসিজ মজুমদার

[FAR-এর সেমিনারে পঠিত রচনার পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত রূপ এই প্রবন্ধটি। সেমিনারের বৌদ্ধিক নিয়ন্তা, উৎপলকুমার বসুর নির্দেশ ছিল কোনো রকম মূল্য বিচার না করে চিত্রকলায় বিমূর্তনার আলোচনা করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে এই লেখক যে বিমূর্ত চিত্রকলার গভীর অনুরাগী তা নয়। কিন্তু বিমূর্ত চিত্রকলাকে বাদ দিয়ে আধুনিক চিত্রকলায় কারোর আগ্রহও অনুসন্ধিৎসা সুদূরপ্রসারী হতে পারে না।

বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট অনেক তথ্য এবং আলোচিত অনেক বিষয় বিভিন্ন বই ও রচনা থেকে আহৃত। সেগুলির উল্লেখপঞ্জী থাকলে প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হত। কিন্তু সব বই হাতের কাছে নেই, নাম ও প্রকাশ-তারিখ, লেখকের নামও যথাযথ মনে নেই। তাছাড়া প্রবন্ধটির আরও পরিমার্জনা ও পরিবর্তনের অবকাশ আছে। সেই চূড়ান্ত লেখাটি যদি কোথাও প্রকাশ করার সুযোগ পাই তবে অবশ্যই পাঠতালিকা সেখানে থাকবে।]

অরূপ বা বিমূর্ত যে-ভাবেই আমরা ইংরাজি abstract শব্দটির বাংলা করি না কেন তার মধ্যে একটা নঙর্থক ব্যঞ্জনা থাকেই। abstract-এ তা নেই। abstract কথাটি

সারাৎসার, সংক্ষিপ্ত ইত্যাদি সদর্থক অর্থেও ব্যবহার করা চলে। একটি সদর্থক শব্দ আমাদের ভাষায় কেন সৃষ্টি হয়নি— তা ভাববার ব্যাপার। কারণ রূপ ও অরূপের দ্বৈতশাসন আমাদের চেতনায় চিরকালই ছিল। রূপময় জগতের সঙ্গে নিত্য ও প্রত্যক্ষ সংযোগের পাশাপাশি এক অপ্রত্যক্ষ, অব্যয় অনির্বচনীয় কিছুর বোধ যে মানুষ অর্জন করেছিল— সে-বোধ অস্ফুট বা অস্পষ্ট হলেও— তার নিদর্শন প্রাচীন বা আদিম সংস্কৃতিতে সব দেশেই যেমন পাওয়া যাবে তেমনি আমাদের দেশেও মিলবে।

অরূপের চর্চা করেছেন আদিম মানুষ— প্রকৃতি ও মানুষ কোনো এক অদৃশ্য, সর্বশক্তিমান সত্তার হাতে নিয়ন্ত্রিত মনে করে। এঁদের মধ্যে অনেকে চিরকালের মিস্টিক ছিলেন। মিস্টিকের সাধনা রূপের মধ্যে অরূপের— অনিত্যের মধ্যে নিত্যের, যা কিছু মূর্ত তার মধ্যে বিমূর্তের সন্ধান করা। দার্শনিকের তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বিমূর্তের সাধনা— সত্য বা নিত্যের জ্ঞান নিরাকার, রূপহীন। শিল্পীরা— বিমূর্ত রীতির শিল্পীর কথা বলছি না— দৃশ্যজগতের পরিচিত অবয়ব বা দৃশ্যজগতের অনুকৃতিকে এমন এক রূপময়তায় প্রাণিত করেন যাতে অরূপের ব্যঞ্জনা থাকে। এই ব্যঞ্জনা না থাকলে তাঁর ছবি নিছক দৃশ্যজগতের নকল বলেই মনে হবে।

সকল শ্রেণীর অরূপ সন্ধানীর মধ্যেই অবশ্য শিল্পী থাকতে পারেন। শিল্পীও মিস্টিক, শিল্পীকে তাই ফরাসী ভাষায় বলা হয় mystique manqué অর্থাৎ তিনি লক্ষ্যচ্যুত মিস্টিক কারণ যা অনির্বচনীয় তাকে প্রকাশ করাই তাঁর লক্ষ্য। মিস্টিক দৃশ্যমান জগতেই অরূপকে প্রত্যক্ষ করেন, আর শিল্পী অরূপকে রূপের নিগূঢ় বাঁধার জন্যে দৃশ্যমান জগত থেকেই অবয়ব— প্রতিমা নির্বাচন করেন। তবু মিস্টিকের কাজ রসিকের, শিল্পীর কাজ স্রষ্টার। রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের শচীশের ভাষায় :

> তিনি রূপ ভালবাসেন, তাই কেবল রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন, আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়··· গান যে করে সে আনন্দ হইতে রাগিনীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিনী হইতে আনন্দের দিকে যায়··· তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

ঈশ্বরের মতো শিল্পীর অভিযান অরূপ থেকে রূপে— শিল্প রসিকের যাত্রা সেই রূপ থেকে অরূপে। কিন্তু যে-শিল্পীরা অরূপের চর্চা করেন এবং তাকে রূপের বন্ধনে বাঁধতে চান এবং পরিচিত রূপময় জগতের অবয়ব, উপমা, চিত্রকল্প, প্রতীক ইত্যাদি সংগ্রহ করে অরূপকে রূপ দেন তাঁরা যে বিমূর্তরীতির শিল্পী তা নয়। তাঁরা অরূপ বা বিমূর্তকে প্রত্যক্ষ করেও রূপে ফিরে আসেন— এবং সে-রূপে থাকে পরিচিত রূপ ও অবয়বেরই অনুকৃতি। চতুরঙ্গ থেকেই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে। শচীশের সন্ধানে দামিনী এক প্রখর অগ্নিবর্ষী দুপুরে নদীর ওপারে জনপ্রাণীহীন বালির চরে পৌঁছল। এক সীমানাহীন ফ্যাকাশে সাদা সেই বালির চর, তার মাঝখানে 'দামিনীর বুক দমিয়া গেল।' সেই চরের যে ছবি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তা এক বিমূর্ত ছবি :

এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তাতে না আছে শব্দ, না আছে গতি, তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া।

এই abstract আমাদের নঙর্থক অরূপ, অর্থাৎ তার যে রূপ, তাকে নির্দিষ্ট করতে হয় কী আছে তা দিয়ে নয়, কী নেই তা দিয়ে। যেমন অরূপ ব্রহ্মকে negative দিয়ে বোঝাতে, হয়, তিনি কী তা বলা যায় না, তিনি কী নয় তা বলা যায়। কিন্তু এই শিল্পী যে আধুনিক বিমূর্তরীতির শিল্পী নন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ঐ বর্ণনার শেষ ছত্রে :

> যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

এই শিল্পীর সঙ্গে আধুনিক বিমূর্তরীতির শিল্পীর তফাৎ কী? দুজনেরই অরূপের সাধনা, কিন্তু প্রথমজনের কাজ বিমূর্তকে পরিচিত প্রতিমায় প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু দ্বিতীয়জন সরাসরি অরূপের রূপকে ধ্যান করেন। 'যেন', 'যেমন'-এর মধ্যস্থতা বর্জন করে, যা অরূপের বিমূর্ত রতন তাকেই রূপসাগরে ডুব দিয়ে তুলতে চান। অর্থাৎ তিনি রূপে অরূপকে বাঁধেন না, অরূপের রূপকে বাঁধতে চান।

abstract কথাটি তাই দার্শনিক। এবং নঙর্থক হলেও 'অরূপ' বা 'বিমূর্ত' শৈল্পিক। কারণ, 'অরূপ'-এর মধ্যে রূপের অস্তিত্ব আছে, বিমূর্ত ইঙ্গিত দেয় নির্বিশেষের বিশিষ্ট মূর্তির। কিন্তু abstract-এ অরূপের মিস্টিক ব্যঞ্জনা নেই, আবার আধুনিক বিমূর্ত চিত্রকলার জন্মসূত্র থেকে এই শব্দটি এই শিল্পরীতির প্রক্রিয়া ও পরিণতির ইঙ্গিত বহন করছে। শব্দটির দার্শনিক ও প্রক্রিয়াগত তাৎপর্য আমরা পরে বোঝার চেষ্টা করব।

abstract কথাটিতে কোনো অরূপের ব্যঞ্জনা না থাকলেও বিমূর্ত চিত্রকলা যে-অরূপের সাধনা তাতে কি কোনো অতীন্দ্রিয় অস্তিত্বের রূপসন্ধান আছে? মূর্ত বা প্রতিমাধর্মী চিত্রকলার বিরোধিতা করেছেন প্লেটো পরে খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম। সংগীতের বিশুদ্ধতার তুলনায় চিত্রকলা ও কাব্য যে নিকৃষ্ট এই ধারণার জনক ও সমর্থক প্লেটো, প্লটিনাস, সেন্ট অগাস্টিন এবং তাঁদের মধ্যযুগীয় উত্তরসূরীরা। সংগীতের কদর প্লেটোর কাছে কেন বেশি ছিল তা রিপাবলিকের পাঠকরা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের চিত্রকলা সম্পর্কে আপত্তির কারণ ছিল একই— পৌত্তলিকতায় ঐ দুটি ধর্মের অরুচি। লাতিন-আমেরিকান লেখক লুই বর্গহেসের একটি গল্পে একজন সমালোচক বিমূর্ত চিত্রকলার সপক্ষে যা বলছেন তার সারার্থ হল :

> বাইবেল ও ইসলামের নিষেধ ছিল দৃশ্যজগতের অনুকরণ করে ছবি আঁকার। সংগীত যেমন সৃষ্টি করে সুরের ও শব্দের নিজস্ব জগত, চিত্রকলারও প্রয়াস হওয়া উচিত অবয়ব ও রঙের এক স্বতন্ত্র জগত সৃষ্টি করা। সুতরাং আধুনিক বিমূর্তবাদী

শিল্পীরা চিত্রকলার মূলে ঐতিহ্যে ফিরে যাচ্ছেন, যে-ঐতিহ্যকে বিপথগামী করেছেন ড্যুয়েরার এবং রেমব্রান্টের মত হেরেটিক্‌স্‌রা।

এতে প্রচ্ছন্ন কৌতুক আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু মনে রাখা দরকার ৩১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্তান্তিনের চার্চ প্রতিষ্ঠার পর প্রায় তিনশ বছর বিতর্ক চলেছিল ব্যাসিলিকার ভিতরের দেয়ালে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি চিত্রিত হবে কিনা সেই প্রশ্নে। ষষ্ঠ শতকের শেষে চূড়ান্ত রায় দেন পোপ গ্রেগরি দ্য গ্রেট এই বলে যে, স্বাক্ষর ব্যক্তির কাছে পুঁথির যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজনই নিরক্ষরের কাছে সমূর্ত চিত্রকলার। কিন্তু মানুষ ও দৃশ্য-জগতের প্রতিচ্ছবি না থাকলে চিত্রকলা কী চেহারা নিত তা আমরা জানি। কান্দিন্‌স্কি এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বর্গহেসের গল্পে বিমূর্ত শিল্পীকুলের বিরোধীরা সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন এই অভিযোগ করে যে, 'They are being influenced merely by broadloom rugs, kaleidoscopes and men's neckwear.' মাত্র একদশক আগে পশ্চিমে বিমূর্ত চিত্রকলার সরকারি ও বেসরকারি চাহিদা সম্পর্কে যে মন্তব্য শোনা গেছে তাতে মনে হয় না কোনো মিস্টিক প্রেরণায় বিমূর্ত ছবি আঁকা হচ্ছে বা দর্শকও কোনো আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিয়ে বিমূর্ত ছবি দেখতে আসেন। একটু ক্ষোভের সুরেই একজন সমালোচক বলেছেন: '...abstraction is now regarded essentially non-controversial. Certainly it is non-erotic, non-political and non-sectarian.

কিন্তু চিত্রকলায় বিমূর্তের ধারণা মিস্টিসিজম না হলেও অধিবিদ্যা থেকে একেবারে বিমুক্ত ছিল না। অনেকের ধারণা, বহু শতাব্দী ধরে মানুষ জ্ঞানার্জনে, চেতনায় শিল্প-সৃষ্টিতে যে বিমূর্তনার অভ্যাস অর্জন করেছে তার মূলে আছে প্লেটো প্রমুখ দার্শনিক-দের অধিবিদ্যা। এমনকি খুব যত্নবান বাস্তবধর্মী ছবির শিল্পীরাও যখন গাছ বা স্টিল-লাইফে ফুল ফল বা অন্য কিছু এঁকেছেন বা প্রতিকৃতি ছাড়া মানুষের ছবি এঁকেছেন, তাঁরা কেউ-ই নির্দিষ্ট গাছ, ফুল ফল, বা মানুষের ছবি আঁকেননি। তাঁরা ঐ সব বস্তু বা প্রাণী সম্বন্ধে এক বিমূর্ত ধারণাকে ছবিতে রূপ দিয়েছেন। সেই রূপ অবশ্য প্রাথমিক। যা তাঁদের সৃষ্টিকে সার্থক করে তা ঐ প্রাথমিক বিমূর্ততা ছাড়াও আরও এক অনন্য বিমূর্ত শৈল্পিক গুণ। এই বিমূর্ত শৈল্পিক গুণ কী তা আমরা দেখব পরে বিমূর্ত চিত্রভাষা প্রসঙ্গে।

আধুনিক চিত্রকলায় বিমূর্তের নান্দনিক ধারণা এসেছে প্রাচীন ঐতিহ্যের সূত্রে সংগীত থেকে। ছবি যে সংগীতের সাধর্ম্য অর্জন করতে পারে তা গত শতকে শিল্পী কবি দার্শনিকেরা লক্ষ করেছিলেন— গ্যয়টে, শোপেনহাওয়ার, ব্যোদলেয়র এবং দেলাক্রোয়া। সংগীতের অভিব্যক্তি আত্মা ও চিত্তকে স্পর্শ করে এবং সংগীত প্রকাশও করে অন্তরাত্মার গভীর অনুভব ও অভিজ্ঞতা। বাহ্য জগতের কোনোরকম অনুষঙ্গ ছাড়াই। কান্দিন্‌স্কি তাই আর্টে আধ্যাত্মিকতার এবং অভিব্যক্তির কথা বলেছিলেন যাতে বিমূর্ত চিত্রকলা নিছক অলঙ্করণ হয়ে না দাঁড়ায়। কান্দিন্‌স্কির spiritual

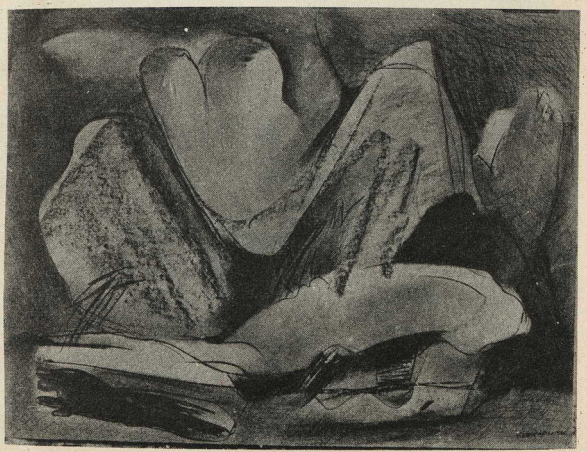

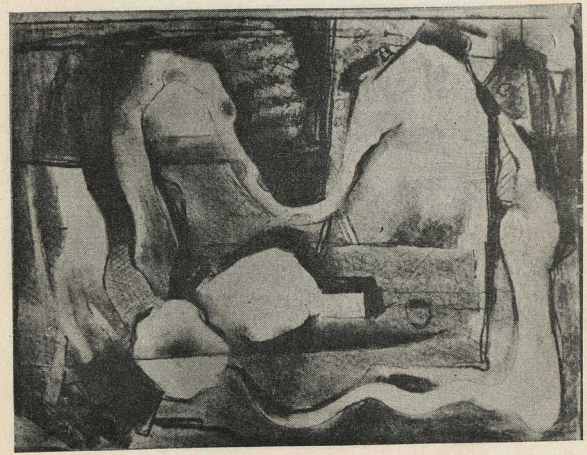

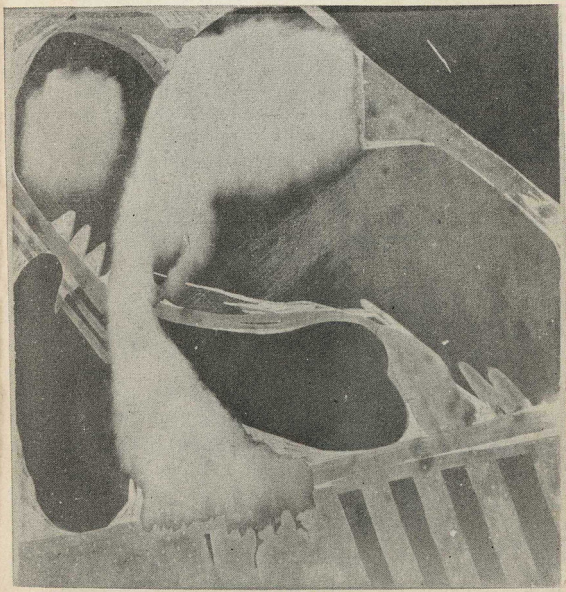

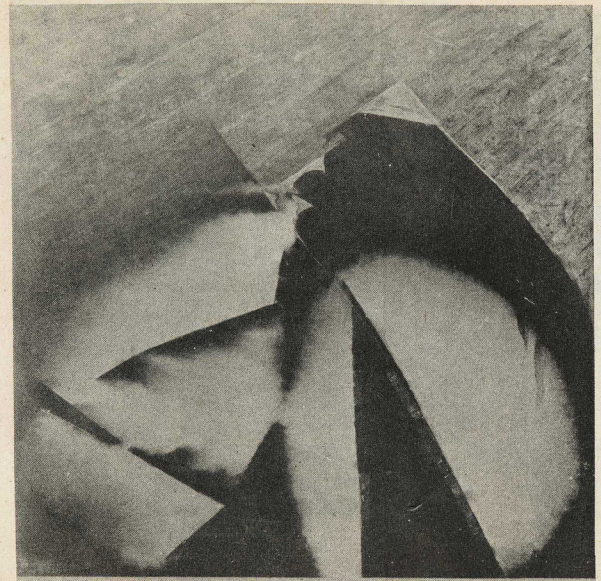

কথাটিকে বুঝতে হবে material-এর বিপ্রতীপ ধারণা হিসেবে। গ্যয়টে— যাঁকে কান্দিন্স্কি সাক্ষী মেনেছিলেন— বলেছেন, সংগীতের তুলনায় ছবির বস্তুভার অনেক। তার অর্থ, প্রথমত, মাধ্যমের বস্তুধর্মিতা ; দ্বিতীয়ত, বিষয়বস্তুর ভার এবং তৃতীয়ত, শিল্পকলার বিষয়ভার ছিল উনিশশতকী বস্তুবাদ (নাকি জড়বাদ) বা materialism-এর অনুষঙ্গী। চিত্রকলায় সেই জড়বাদের কলুষতাহীন এক আত্মিক জীবনবোধের অভিব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। তাই চিত্রকলায় spiritualism ছিল জড়বাদের বিরোধিতা। এই সাংগীতিক সূত্রেই এসেছে বিমূর্ত চিত্রকলার একটি প্রধান প্রেরণা— চিত্রকলার বিশুদ্ধিকরণ। সংগীতের মতোই শিল্পকলাকে নামাতে হবে বিষয়ের ভার—তার কাঁধ থেকে। যেমন যা-কিছু কবিতা নয় তাকে বর্জন করে গত শতকের শেষপাদের ফরাসী কবিতা শুচিস্নাত হল, তেমনি ছবিকে বর্জন করতে হল image বা প্রতিমাকে। দৃশ্যজগতের অনুকৃতি সযত্নে পরিহার করাই হল বিশুদ্ধ (বা বিমূর্ত) চিত্রকলার লক্ষ্য। কারণ সব ধরনের প্রতিমাধর্মিতাকে মনে করা হল অ-শিল্প। মালার্মে, যিনি বলেছিলেন কবিতা শব্দ দিয়ে লেখা হয়, আইডিয়া দিয়ে নয়, তিনিই বললেন, **'Paint not the thing but the effect it produces'.**

অনেকে মনে করেন কান্দিন্স্কি নয়, পিকাসোই বিমূর্ত চিত্রকলার জনক। কিউবিজমই ঐ বিশুদ্ধিকরণের প্রথম ধাপ। পিকাসো এবং আরও অনেকে লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে, ছবিতে অবয়ব, ত্রিমাত্রিক জমি, পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদিতে এতদিনের অভ্যস্ত structure ভেঙে দৃশ্যজগতের নবনির্মিতি রচনা করতে গিয়ে দৃশ্যজগতকে এমনভাবে কেটে ছেঁটে বাদ দিয়েছিলেন, মনুষ্যমূর্তি'র এমন বিকৃতি ঘটিয়েছিলেন, বা প্রতিমাকে বিলীন করেছিলেন যে অনেক সময় বিমূর্ত ছবির সঙ্গে তাঁর ছবির ভাবগত না হোক দৃশ্যত কোনো অমিল ছিল না। শুধু এই যে, মনুষ্য অবয়ব বা দৃশ্যজগতের যে চিহ্নলেশ তাঁর কিউবিস্ট ছবিতে ছিল তা পিকাসো কোনোদিনই নিশ্চিহ্ন করেননি। এই সাদৃশ্যটুকু ছিল বলেই কাফকা তাঁর নিজের অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা সমকালীন বাস্তবতার প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন পিকাসোর ছবিতে। প্রাগে প্রথম কিউবিস্ট প্রদর্শনীতে কাফকার বন্ধু গুস্তাভ জানুশ পিকাসোর ছবি দেখে বলেছিলেন : 'খেয়াল-খুশি বিকৃতি।' উত্তরে কাফকার মন্তব্য ছিল :

> আমার তা মনে হয় না। পিকাসো সেইসব বিকৃতিই লক্ষ করেছেন যা আমাদের চেতনায় এখনও ধরা দেয়নি। শিল্পকলা আয়নার মতো। ঘড়ির মতো কখনো কখনো, সময়ের আগে আগে চলে।

পিকাসোর কিউবিস্ট ছবিতে কাফকা যে তাঁর বোধ-অনুভবের বিশ্বস্ততা দেখতে পেলেন, তাতেই প্রমাণ পাওয়া গেল কিউবিজমের বিমূর্ত চরিত্রের। কারণ, কিউবিজম মূলত আঙ্গিকধর্মী, চিত্রকলার এক নতুন প্রকরণ ও নান্দনিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করাই ছিল কিউবিজমের লক্ষ্য। কিউবিজম আবিষ্কারের আগে পিকাসো ব্যক্তিগত আবেগ, সমাজভাবনা, কাব্য-সাহিত্যের প্রভাবে ছবি এঁকেছেন। কিন্তু কিউবিজমের ক্রমবিকাশ

ঘটেছে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, বাইরের সবরকম প্রভাব সযত্নে এড়িয়ে। তাই কাফকা যখন পিকাসোর ছবিতে কোনো ভবিষ্য ঘটনার ছায়া দেখতে পেলেন তখন বিমূর্ত ছবির দর্শকদের মতোই তিনি নিয়ে এলেন 'something of their own to the work and to read into it whatever they want to discover.' মার্ক রোথকোর বিমূর্ত ছবিতে যেমন অনেকে এক গভীর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দেখতে পান। কিউবিজমের রকমফের ছিল যাঁদের কাজে—ডেলনি, কুপকা, লেজের, দ্যুশাঁ, পিকারিয়া— তাঁরা বিমূর্ত চিত্রকলারীতির ক্রমবিবর্তনকে ঋদ্ধ পরিণতিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় abstract কথাটিতে প্রক্রিয়া ও পরিণতির দ্বৈত ব্যঞ্জনা। বিচ্ছিন্ন করা, সারাংশ বা নির্যাস বার করা 'abstract' ক্রিয়াপদের অর্থ। ভাস্কর যেমন পাথর থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেনে ছেনে মূর্তিটিকে বার করে আনেন, তেমনি দৃশ্যবস্তুর সব সাদৃশ্য বিলীন করতে করতে, প্রাকৃতিক অবয়বকে সরলীকৃত করে বা তার চিহ্নমাত্র আভাস রেখে অনেক শিল্পীই পৌঁছে গেছেন বিমূর্ত চিত্ররীতিতে। অনেকগুলি ক্যানভাসে বিমূর্ত একটি গাছের ডালপালা ছাঁটতে ছাঁটতে, facet cubism-এর পথ ধরে— এক অতি পরিশীলিত, অনার্দ্র, বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত আবেগহীন চিত্রকলার সৃষ্টি করেছিলেন ডাচ শিল্পী মন্দ্রিয়ান। তাঁর বিশুদ্ধিকরণ ছিল কেবল চিত্রকলার নয়, বিমূর্ত চিত্রকলারও। মন্দ্রিয়ান ছাড়াও টাটলিন, ম্যালেভিচ, ড্যান ডোয়েসবার্গ গাবো, পেভ্‌স্‌নার এবং পরবর্তীকালের পোস্ট-পেইন্টারলি বিমূর্তবাদীদের ছবিতে এক ভিন্ন বিমূর্ত নন্দনভাবনা দেখা যাবে। তাঁরা কান্দিন্‌স্কির অন্তর্মুখীনতা বা বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদকে বর্জন করে বিমূর্ত চিত্রকলাকে অতিবিশুদ্ধ করেছিলেন এবং তার ফলে বিমূর্ত চিত্রকলায় যেটুকু spiritual বা আধ্যাত্মিক বোধের বীজ ছিল বলে অনেকের ধারণা তা অঙ্কুরিত হয়নি। আবার একথাও বলা চলে, কান্দিন্‌স্কির অভিব্যক্তিবাদী বিমূর্ত চিত্রকলার ক্রমান্বয়ী পরিশীলন ঘটেছে পরবর্তীকালের ডি কুনিং, নিউম্যান, জ্যাকসন পোলক, রোথকো, স্যাম ফ্রান্সিস, ক্লাইন প্রমুখ শিল্পীদের কাজে। এই উভয়বিধ বিমূর্তরীতির চিত্রকলায় জড়বাদ বা materialism-এর বিপ্রতীপ এক ব্যঞ্জনা আছে যা কঠিন মনন বা গভীর আবেগ থেকে উৎসারিত।

এর কারণ আধুনিক চিত্রকলায় বিমূর্তির প্রবণতার মূলে ছিল আধিবিদ্যা, আধ্যাত্মিকতা বা মিস্টিসিজমের নির্ভরতা ছাড়াই মানবমনের ভিতরের সত্য এবং বাইরের বস্তুজগতের সত্য সম্পর্কে অনেক বিমূর্ত ধারণা। বিজ্ঞান ও যন্ত্রসভ্যতার ক্রমপ্রসারের যুগে এই বিমূর্ত ধারণাগুলি জ্ঞান ও চেতনার অভাবনীয় বিকাশে অনন্য ভূমিকা নিয়েছে। জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান যখন মানুষকে অনেক রহস্য, অনেক অতীন্দ্রিয় ধারণার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছে, তখন শিল্পীরা এক নতুন রহস্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়েছেন। রূপাতীত অথচ বুদ্ধিগ্রাহ্য এক নতুন বাস্তবতার সন্ধান দিয়েছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত। সেই বিমূর্ত ধারণার মৌল অবলম্বন ছিল time, space, speed ও energy. অনন্ত মহাকাশ, অনন্তকাল, অবচেতনের অনন্ত রহস্য, অণুতে

নিহিত অনন্ত শক্তি এবং যন্ত্রের শক্তি, শক্তি থেকে অর্জিত গতি ইত্যাদির প্রবল অভিঘাত থেকে শিল্পীরা পেয়ে গেছেন জগত ও জীবন-সত্য সম্পর্কে নানা বিমূর্ত ধারণা। তাঁদের মিস্টিক হতে হয়নি।

এমনকি অন্তঃসত্য এবং বহিঃসত্য— বা reality within এবং reality without— এই দুইয়ের অদৃষ্টপূর্ব চেহারা যা এতদিন হিমশৈলের নিমজ্জিত অংশের মতো দৃষ্টি বা বোধের বাইরে ছিল, তার পরিধি, গভীরতা এবং শক্তির পরিচয় পেয়ে বিষয়ী (subject) ও বিষয়ের (object) মধ্যেকার এতদিনের অভ্যস্ত, পরিচিত সম্পর্কের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রইল না। এরই প্রতিক্রিয়া আমরা দেখি ফোবিজম, কিউবিজম, সুররিয়ালিজম, ডাডাইজম, এক্সপ্রেশনিজম প্রমুখ বিশশতকী চিত্রকলার বিভিন্ন আন্দোলনে এবং অবশ্যই আমাদের আলোচ্য বিমূর্ত চিত্রকলায়। এই শতকের কলাচর্চার বিচিত্র এবং বহুধা বিবর্তনে প্রত্যক্ষ জগতবাস্তবতার অবমূল্যায়ন ঘটেছে এবং বিষয়ীর প্রতাপ বিষয়কে খর্ব করেছে যেসব রীতির চিত্রকলায় তার মধ্যে বিমূর্ত রীতির ছবি অন্যতম চরম দৃষ্টান্ত এবং অরূপের রূপের সন্ধানে সবচেয়ে অগ্রণী।

বিমূর্ত চিত্রকলার আলোচনায় বিমূর্ত চিত্রভাষার অনুল্লেখ মার্জনার যোগ্য ত্রুটি নয়। ছবির প্রসঙ্গে ছবির ভাষার কথা এসে যায় অনিবার্যভাবে। অর্থবহ যা-কিছু মানুষের সৃষ্টি তা যে এক ধরনের ভাষায় কথা বলে এবং সে-ভাষা মানুষের কথ্য ভাষার আদর্শে বিচার্য— এই ধারণা ইদানীং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধুনা প্রয়াত একজন প্রখ্যাত লেখক খুব খেদ করে বলেছিলেন, স্পষ্টতই আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কে, 'ছবি বুঝি না, কারণ, ব্যাকরণ জানি না।' এই খেদোক্তিতে হয়তো প্রচ্ছন্ন অভিযোগও ছিল যে চিত্রভাষার কোনো ব্যাকরণ নেই। কিন্তু এই খেদ বা অভিযোগের জন্যে ব্যাকরণ কোনোভাবেই দায়ী নয়, তার অস্তিত্বও জরুরি নয়। সব শিক্ষিত বাঙালিই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ জানেন, কিন্তু বাংলা কবিতার পাঠকসংখ্যা অতি নগণ্য। সুতরাং ব্যাকরণের জ্ঞান থেকে নয়, কবিতাপাঠের অনুরাগী অভ্যাস থেকেই কবিতার ভাষা বোঝা যায়। তেমনি ছবির ভাষার সঙ্গে পরিচয় হয়, সে-ভাষা আয়ত্তে আসে, ছবি দেখার সনিষ্ঠ অভ্যাস থেকে। কেন প্রাথমিক ভাষার ব্যাকরণ জানলেই কবিতার ভাষা বোঝা যায় না সেই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। কিন্তু তার আগে এই প্রবন্ধের অন্যত্র যে বিমূর্ত শৈল্পিক গুণের উল্লেখ করেছিলাম সেই কথা মনে রেখে ছবির ভাষা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আলোচনাটা সেরে নেওয়া যাক।

মূর্ত (representational) চিত্রকলায় শিল্পী কোনো সুস্পষ্ট বিষয়ের অবতারণা করেন এবং দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ জগতবাস্তবতার সাদৃশ্যকে সেই বিষয়ের মুখ্য অবলম্বন করেন। মানুষজনের চেহারা, তাদের পরিবেশ (setting), পরিবেশে দু-একটি তাৎপর্যপূর্ণ বস্তুর উল্লেখ, আলোছায়া ইত্যাদি যে-সব অনুকৃতির উপাদান ছবিতে থাকে তাকে বলা হয় ছবির semantic বা অর্থবহ, সাদৃশ্যধর্মী অংশ। কিন্তু এই সেমান্টিক উপাদানের সংজ্ঞা দেয়, নিয়ন্ত্রিত করে রঙ, রেখা, জমি, অবয়ব, চিত্রবস্তুর

বিন্যাস ইত্যাদি plastic উপাদান। মূর্ত চিত্রভাষায় এই সাদৃশ্যধর্মী বা সেমান্টিক অংশটুকু দর্শককে প্রাথমিকভাবে জানিয়ে দেয় ছবির বিষয় কী। কিন্তু ছবির তাৎপর্যের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে ঐ প্লাসটিক অংশের আলোচনা অপরিহার্য। মনে রাখা দরকার যে কোনো ছবির ব্যঞ্জনা বা অভিব্যক্তি থাকে নিছক চিত্রবস্তুর সাদৃশ্যধর্মিতায় নয়, বরং দৃশ্য-বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রবস্তুর ভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্যে, যা বাস্তবধর্মী ছবির মতো সূক্ষ্ম, বা এক্সপ্রেশনিস্ট ছবি বা কিউবিস্ট ছবির মতো সোচ্চার হতে পারে। জিওকোন্ডার হাসি কি বাস্তবে সম্ভব? সম্ভব হলে দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা নিয়ে আদৌ কি কোনো হইচই হত?

আবার আরও এক ধরনের ভিন্নতায় ঐ অর্থব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ হয় যা এক শিল্পীর ছবি থেকে অন্য শিল্পীর ছবির পার্থক্য চিহ্নিত করে, বিষয় বা রীতি এক হলেও। লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারিতে মনতেনিয়া এবং তাঁর শ্যালক বেলিনির আঁকা দুটি ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। দুটিরই বিষয় ও নাম অভিন্ন—অ্যাগনি ইন দ্য গার্ডেন। দুটি ছবিই ইতালীয় হাই রেনেশানসের আগের কোয়াট্রোচেন্তো রীতিতে আঁকা হলেও মনতেনিয়ার ছবিতে আছে ভাস্কর্যসুলভ কাঠিন্য এবং অনার্দ্র দার্শনিক জিজ্ঞাসা কিন্তু বেলিনির ছবিতে পাওয়া যাবে আধ্যাত্মিক আবেগে আপ্লুত লিরিক সুষমা। এই শতাব্দীর সূচনায় বিভিন্ন জার্মান এক্সপ্রেশনিস্টদের বা আমাদের নব্যবঙ্গীয় ঘরানার অবনীন্দ্রনাথ, তস্য শিষ্য নন্দলাল, তস্য শিষ্য বিনোদবিহারীর ছবি দেখলে বোঝা যাবে রীতির অভিন্নতা সত্ত্বেও শৈলীর ভিন্নতা প্রত্যেক শিল্পীর চিত্রভাষায় বিশিষ্টতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

শিল্পকলার নন্দনভাবনায় এই উভয়বিধ ভিন্নতার গুরুত্ব বেশি এবং ছবি যে শৈল্পিক-গুণে এই ভিন্নতা অর্জন করে তা মূলত বিমূর্ত। অলডাসহা ক্সলি যিনি বিমূর্ত চিত্রকলার অনুরাগী ছিলেন না এবং ছবির আলোচনায় বিষয়কে উপেক্ষা করে কেবল রচনা, আঙ্গিক ইত্যাদি নিয়ে অবয়বী (formal) বিশ্লেষণে যাঁর প্রবল অরুচি ছিল তিনিও স্বীকার করেছেন :

> ...Many works even of the Renaissance and the Baroque incorporate passages of almost unadulterated abstraction. These are often expressive in the highest degree. Indeed the whole tone of a representational work can be established, and its inner meaning expressed by those parts of it which are mostly nearly abstract.

বিমূর্ত বা প্রায়-বিমূর্ত অংশের জন্যেই, হাক্সলির মতে, কজিমো তুরা এবং পিয়েরো দেল্লা ফ্রানচেসকার ছবির মেজাজে এত গভীর পার্থক্য।

সুতরাং ছবি যখন সর্বৈব বিমূর্ত তখন তার ভাষাগত প্রকরণ ও প্রক্রিয়ার একটা স্বাতন্ত্র্য বোধহয় সহজেই অনুমান করা চলে এবং অবিমূর্ত ছবির ভাষার সঙ্গে বিমূর্ত ছবির ভাষার সম্পর্ক নিছক শরিকী নয়। নিজের বর্ণমালা, ব্যাকরণ এবং দুরূহ পাঠ নিয়ে সে-ভাষা স্বরাট।

চিত্রকলায় আধুনিকতার সূচনা ও ক্রমবিকাশের সমকালেই মানুষের ভাষার চরিত্র, গঠন, প্রক্রিয়া ও প্রকরণ ইত্যাদি নিয়ে ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর, লেভি স্ট্রাউস, রোমান জ্যাকবসন প্রমুখ পশ্চিমী পণ্ডিতেরা গভীর অনুসন্ধান ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। আধুনিক এই স্ট্রাকচারালিস্ট ভাষাতত্ত্বের সূত্র ধরেই সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য-শিল্প এমনকি ফ্যাশন, ইত্যাদি অনুধাবন করার নতুন নতুন তাত্ত্বিক প্রয়াস চলছে গত কয়েক দশক ধরে। সস্যুরের প্রদর্শিত পথে স্ট্রাকচারালিস্ট ও ফর্মালিস্টরা সাহিত্য সমালোচনায় নানা জটিল তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন। তাঁদের তত্ত্বের ক্রমবিবর্তনে আবার পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্টরা তাত্ত্বিক জটিলতায় আরও অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। জটিলতা যাই থাকুক বিমূর্ত চিত্রভাষার আলোচনায় স্ট্রাকচারালিস্ট ও ফর্মালিস্টদের তত্ত্ব উপেক্ষা করা চলে না। বিচার্য বিষয় অবশ্য এই যে, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্ব-প্রসূত সমালোচনা তত্ত্বের আলোয় বিমূর্ত চিত্রভাষার বিশ্লেষণ বা চরিত্ররূপ নির্ধারণ করা যায় কিনা।

প্রথমেই স্ট্রাকচারালিস্ট ভাষাতত্ত্বের প্রসঙ্গ না এনে আমরা ফর্মালিস্টদের তত্ত্বের সাহায্যে বিমূর্ত চিত্রভাষা বোঝার চেষ্টা করতে পারি। কারণ, বিমূর্ত চিত্রকলার নন্দনভাবনার সঙ্গে ফর্মালিস্টদের কাব্যতত্ত্বের একটা নিকট সম্পর্ক আছে। আধুনিক চিত্রকলার বিষয়মুক্তি যেমন সম্পূর্ণ হয়েছে বিমূর্ত চিত্রকলায় তেমনি ফর্মালিস্টদের তাত্ত্বিক আলোচনা কেবল ফর্মকে নিয়ে। তাঁদের ধারণায় কাব্যে বিষয়বস্তু নয়, ফর্ম বা রূপই হল কাব্যের সর্বাকছু এবং নানাভাবে ভাষার রূপান্তর ঘটিয়ে সম্ভব হয় কাব্যের রূপ-নির্মিতি। কাব্যভাষার এই রূপান্তরের রহস্য না জানলে নিছক ব্যাকরণ জানলেই কবিতা বোঝা যায় না। আর মাতৃভাষা যেমন ব্যাকরণ না জেনেই আয়ত্তে আসে কেবল প্রত্যক্ষ পরিচয় থেকে, কাব্য-শিল্পের ভাষাও তেমন করে আমরা শিখে যাই।

কিন্তু কাব্যের রূপান্তরিত ভাষা মাতৃভাষা নয়। ফর্মালিস্টদের গুরু জ্যাকবসন এই ভাষার নাম দিয়েছেন metalanguage বা রূপান্বিত ভাষা। এই ভাষার প্রধান দুটি কাজের একটি হল উল্লেখধর্মী (referential) এবং অপরটি হল কাব্যিক বা সৃষ্টিধর্মী (creative)। লেভি স্ট্রাউসও ভাষার এই দুটি চরিত্রকে চিহ্নিত করেছেন যথাক্রমে message ও myth অভিধা দিয়ে। message কথাটিও জ্যাকবসনের। বিমূর্ত চিত্রভাষাকেও এমনই এক metalanguage বলা চলে। অরূপের রূপ, আগেই বলেছি, অনির্বচনীয় এবং সেই রূপকে ব্যঞ্জিত করার জন্যে যে বিশিষ্ট ভাষার প্রয়োজন বিমূর্ত চিত্রভাষা তেমনই এক রূপান্বিত ভাষা। কবিরা যে রূপময় শব্দপ্রতিমা সৃষ্টি করেন তার অর্থগৌরব থাকুক বা না থাকুক তার আসল শক্তি তার কাব্যময়তায়। রঙ, রেখা, অবয়ব ও জমির বিন্যাসে বিমূর্ত চিত্রকলায় যে দৃষ্টিবাহিত প্রতিমার সৃষ্টি হয় তার কোনো অর্থ থাকে না, থাকে কেবল নয়নবেদ্য এক কাব্যময় ব্যঞ্জনা। বিমূর্ত চিত্রে যেমন, কবিতাতেও তেমনি, সেই ব্যঞ্জনার অভিঘাত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন হতে পারে, অর্থও চিরকাল অপরিবর্তনীয় থাকে না। কবিতায় কোনো নির্দিষ্ট অর্থ

থাকলেও বিমূর্ত চিত্রকলায় থাকে না, কিন্তু কবিতার সেই অর্থকে গৌণ করে দেয় ভাষার রূপময়তা। জ্যাকবসন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন: I like Ike— নির্বাচনে আইসেন-হাওয়ারকে সমর্থনের পক্ষে একটি স্লোগান। এতে অবশ্যই, এক অনড় অর্থবস্তু আছে। এবং তা অন্যভাবে বলা যায় আরও বিশদ করে। কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত ঐ উক্তিতে ধ্বনি-সুষমামণ্ডিত মাত্র তিনটি শব্দে অর্থের অতিরিক্ত যে অভিব্যক্তি আছে তা আর কোনো সহজ-উচ্চার্য বাক্যে পাওয়া যাবে না। জ্যাকবসনের দৃষ্টান্ত অতি নিকৃষ্ট, মনে হয় যেন ফর্মালিস্ট তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার উপযোগী একটি দৃষ্টান্তকে তিনি উদ্দেশ্যমূলক-ভাবে তুলে এনেছেন। আমরা আমাদের হাজারো প্রিয় কবিতার উজ্জ্বল লাইন তুলে এনে দেখাতে পারি সে-সব দৃষ্টান্তের অর্থগৌরব কম নয় যেমন কীটসের একটি কবিতার সূচনা ছত্রটি— 'A thing of beauty is joy for ever.' কিন্তু অর্থের ঋদ্ধতা তুচ্ছ হয়ে যায় রূপান্বিত ভাষায় তাকে ধরা না গেলে। A beautiful object is a constant source of joy বললে একই অর্থ বজায় থাকত কিন্তু উবে যেত তার কাব্যগুণ যাকে ফর্মালিস্টরা নাম দিয়েছেন literariness।

জ্যাকবসনের metalanguage-এ সাধারণ বা অভ্যস্ত ভাষার যে রূপান্তর ঘটে এমন কিছু করে যাতে message-এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। message কথাটির অর্থ অবশ্যই ভাষায় নিবদ্ধ উক্তির রূপ, উক্তিতে বিধৃত বক্তব্য নয়। এবং উক্তির ভাষাগত রূপটিকে প্রত্যক্ষ করানোর কাজটিকে ফর্মালিস্টরা বলেন foregrounding বা সম্মুখীকরণ। এই সম্মুখীকরণ নানাভাবে করা যায় এমনকি বাক্যের ব্যাকরণশুদ্ধ অন্বয় ভেঙে বা অন্য শব্দের সঙ্গে আপাত সম্পর্কহীন একটি শব্দকে বাক্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে, যেমন: 'সান্ধ্য উমাকীর্তিবাবুর চরণাশ্রিত সঙ্গীত/গাই।' জ্যাকবসন অবশ্য অতিবিন্যস্ত (highly patterned) ভাষার ব্যবহারকেই সম্মুখী-করণের প্রধান প্রকরণ বলেছেন। বিমূর্ত চিত্রভাষায় এই সম্মুখীকরণ কীভাবে ঘটে বা আদৌ ঘটে কিনা তা দেখার আগে একটি জরুরি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার। জ্যাকবসনের metalanguage-এ অর্থ গৌণ হয়ে literariness মুখ্য হয়ে উঠলেও অর্থ থাকেই। কারণ মানুষের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের আভিধানিক অর্থ আছে। বিমূর্ত চিত্রভাষায় ব্যবহৃত উপাদানে এমন কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই, যদিও কাল্পনিক চেষ্টা করেছিলেন এইরকম অর্থ চিহ্নিত করার। বরং মূর্ত চিত্রকলায় সেই অর্থ থাকে এবং ভাষারও রূপান্তর ঘটে। সুতরাং metalanguage কেবল বিমূর্ত চিত্রভাষার সম্পত্তি নয় বরং সামগ্রিকভাবে মূর্ত-বিমূর্ত সব চিত্রভাষাকেই আমরা রূপান্বিত ভাষা বলতে পারি।

বস্তুত চিত্রভাষার বিশুদ্ধ চরিত্রগত বা কাঠামোগত (synchronic) বিশ্লেষণে দেখা যাবে সব রীতির ছবির ভাষাই রূপান্তরিত হয় ফর্মালিস্টদের নির্দিষ্ট করা দুটি প্রক্রিয়ায়: সম্মুখীকরণ এবং অপরিচিতীকরণ (defamiliarisation)। কিন্তু আমরা যদি আধুনিক চিত্রকলার ভাষার ক্রমবিকাশ (diachrony) আলোচনা করি

তাহলে দেখব ঐ রূপান্তরণ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে এবং গুণগত পরিবর্তনে তা এক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে বিমূর্ত চিত্রকলায়। গত শতাব্দীর শেষ দু'তিনটি দশকে চিত্রকলায় আধুনিকতার সূচনা হয়েছে এবং সেই সংগে চিত্রভাষার প্লাস্টিক উপাদানের সম্মুখীকরণ এবং সেমান্টিক বস্তুর অপরিচিতীকরণ শুরু হয়েছে। প্রথম পথিকৃৎ ছিলেন ইম্প্রেশনিস্টরা। বহুদিনের অভ্যস্ত (ফর্মালিস্টদের ভাষায় automatized) বাস্তবতাবাদী বা স্বাভাবিকতাবাদী (naturalistic) ভাষাই যখন ছবির একমাত্র এবং প্রাথমিক ভাষা বলে সর্বজনস্বীকৃতি পেয়ে এসেছে এবং দর্শক যখন ঐ ভাষার স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়ে দৃশ্যবাস্তবতার হুবহু অনুকরণ দেখতে দেখতে চিত্রভাষার ভূমিকার কথা বিস্মৃত হয়েছেন, তখন প্রয়োজন ছিল চিত্রভাষাকে রূপায়িত করার প্রক্রিয়া দুটির নবীকরণের। দৃশ্যজগতের হুবহু অনুকৃতি বর্জন করে, পরিচিত অবয়বের ভাঙচুর করে, বা অতিসরল করে, বাস্তবধর্মী ত্রিমাত্রিক জমির দ্বিমাত্রিক ব্যাখ্যা দিয়ে, স্বাভাবিক বর্ণ-ব্যবহার বিসর্জন দিয়ে, রেখার প্রয়োগ বাড়িয়ে দিয়ে, অমসৃণ বর্ণপ্রলেপে চিত্রপট ভরিয়ে দিয়ে এবং সর্বোপরি বিষয়ের ভার লাঘব করে সম্মুখীকরণ এবং অপরিচিতীকরণ প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে আধুনিক চিত্রকলার বিভিন্ন রীতি ও প্রকরণ আবিষ্কারে। বিমূর্ত চিত্রকলা যে পথ বেছেছে এই নবীকরণের তা হল ছবি থেকে দৃশ্যজগতের সার্বিক নির্বাসন। এই নির্বাসনের ফলে চিত্রভাষার নান্দনিক অভিঘাতে, প্রকরণ ইত্যাদিতে বিমূর্ত চিত্রকলা এক বৈপ্লবিক চরিত্র অর্জন করেছে। সেই জন্যেই বিমূর্ত চিত্রভাষার চরিত্রগত বিশ্লেষণে স্ট্রাকচারালিস্ট তত্ত্ব প্রয়োগের অবকাশ আছে। কিন্তু যে গভীর অন্বেষা এবং তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগ-কৌশলে সেই বিশ্লেষণের বিস্তৃত পরিসর পরিক্রমা করা উচিত তা বর্তমান লেখকের আয়ত্তে নেই এবং এই প্রবন্ধের পরিধিতে সম্ভবও নয়। কিন্তু সমস্যাটির রূপরেখা আমরা অনুমান করতে পারি।

সস্যুর এবং লেভি স্ট্রাউসের মতে মানুষের ভাষা হল একটি সুসংগঠিত চিহ্নব্যবস্থা যা কোনো ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, গোষ্ঠীর সৃষ্টি। চিহ্ন বা sign-এর দুটি উপাদান: চিহ্নকারী (signifier) এবং চিহ্নিত (signified) অর্থাৎ যথাক্রমে **শব্দ** এবং **শব্দ যে-অর্থ** বহন করে। চিহ্ন ব্যবস্থায় চিহ্ন ও চিহ্নিতের মধ্যে সম্পর্ক মূলত নির্বিচার (arbitrary) এবং প্রচলিত ও প্রথাসিদ্ধ সম্পর্কসমূহের বিচিত্র, জটিল কাঠামোর (structure) মধ্যেই চিহ্ন অর্থবহ হয়, চিহ্ন ব্যবস্থা কাজ করে। কথিত ভাষায় চিহ্নের দুটি বৈশিষ্ট্য— একটি ধ্বনিগত, অপরটি অর্থগত। অনুরূপভাবে, যেমন আগেই বলা হয়েছে, চিত্রভাষারও দুটি উপাদান— প্লাস্টিক বা রঙ রেখা, অবয়ব ইত্যাদি এবং সেমান্টিক— রঙে, রেখায়, অবয়বে চিহ্নিত বা রূপায়িত দৃশ্যবস্তুর সাদৃশ্য, উল্লেখ বা অনুকৃতি।

বিমূর্ত চিত্রভাষার সমস্যা এই যে আপাতদৃষ্টিতে চিহ্ন থাকলেও চিহ্নিত বলে কিছু নেই। অন্তত সেমান্টিক উপাদান না থাকাই বিমূর্ত চিত্রকলার প্রাথমিক শর্ত।

অর্থাৎ উপাদান বাদ দিয়ে যা থাকে—রঙ, রেখা ইত্যাদি—যাকে আমরা প্লাস্টিক উপাদান বলি তাকে কি আমরা sign বা অর্থযুক্ত চিহ্ন বলতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে স্ট্রাকচারালিস্ট ভাষাতত্ত্বের আলোয় বিমূর্ত চিত্রভাষার মৌল সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমাদের উত্তর যদি ইতিবাচকও হয় (অর্থাৎ বিমূর্ত ছবির প্লাস্টিক উপাদানকে আমরা অর্থযুক্ত চিহ্নের মর্যাদা দিই), লেভি স্ট্রাউস লক্ষ করেছিলেন, বিমূর্ত চিত্রকলায় কোনো সুসংগঠিত চিহ্নব্যবস্থা নেই, থাকলেও তা কোনো ব্যক্তির সৃষ্টি, গোষ্ঠীর নয় এবং একই শিল্পীর প্রথম জীবন এবং পরবর্তীকালের শিল্পকর্মে একই চিহ্নব্যবস্থা সক্রিয় না থাকতেও পারে। তাছাড়া প্রত্যেক শিল্পীই সচেতন প্রয়াসে একটি নিজস্ব শৈলী গড়ে তোলেন কিন্তু বিমূর্ত চিত্রকলায় অর্থহীন চিহ্নের প্রাতিস্বিক প্রয়োগ এতদূর স্বতন্ত্র হতে পারে তা একটি সার্বিক ব্যবস্থা বা langue-এর অধীন parole বা বিশিষ্ট প্রয়োগ না হয়ে এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থার জনক হতে পারে। কান্দিন্স্কির বিমূর্ত ভাষা, মন্দ্রিয়ান বা ডোয়েসবার্গের বিমূর্ত ভাষা থেকে একেবারে ভিন্ন চরিত্রের।

কিন্তু চিহ্নের যখন কোনো নির্দিষ্ট অর্থ থাকে না তাকে কি আমরা চিহ্ন বা sign বলতে পারি? মর্জিনা যখন আলিবাবার বাড়ির দরজার একটি খড়ির দাগ দেখেছিল তখন অবশ্যই তা অর্থবহ চিহ্ন ছিল। কিন্তু রাত্রে দস্যুরা যখন একই খড়ির দাগ সব বাড়ির দরজায় দেখতে পেল, তখন সে-দাগ তাদের কাছে নিছক দাগ হয়ে রইল, চিহ্ন হয়ে উঠল না, অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট বাড়িকে চিহ্নিত করতে পারল না। বিমূর্ত চিত্রভাষায় আমরা এমন অর্থযুক্ত চিহ্ন কি পেতে পারি, যে-অর্থে চল্লিশটি দস্যুর প্রত্যেকে চিনে নেবে কোন্‌টি আলিবাবার বাড়ি?

কিন্তু দস্যুদের মধ্যে যদি কোনো কলারসিক থাকত সে হয়তো চিনে ফেলতে পারত যে সবগুলির মধ্যে মাত্র একটি খড়ির দাগ কর্কশ, কঠোর পুরুষের হাতের, অন্যগুলি কোমল নারী-আঙুলে ধরা খড়ির টুকরোর দাগ। হয়তো তা সম্ভব ছিল না কারণ মর্জিনা খুব বুদ্ধিমতী নারী, দাগ দেওয়ার সময় সে নিশ্চয় প্রথম দাগটির হুবহু নকল করেছিল। (অন্তত তাকে তাই করতে হত যদি দস্যুদের মধ্যে তার চেয়ে বুদ্ধিতে দড় কোনো লোক থাকত। না হলে গল্পের পরিণতি অন্যরকম হত।) দাগগুলির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা খুঁজতে গেলে, চিহ্নিত নয়, চিহ্নের প্রতি নজর দেওয়ার প্রয়োজন হত। বিমূর্ত চিত্রকলায় ঐ চিহ্ন বা প্লাস্টিক উপাদানের শরীরী রূপটিই একমাত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য কনটেন্ট বা চিত্রবস্তু, কোনো অর্থ যদি তার খুঁজতেই হয় তবে তা তার মধ্যেই পাওয়া যাবে, তার বাইরে নয়। এবং তাকে কেবল অর্থ না বলে অভিব্যক্তি, ব্যঞ্জনা বলা চলে।

সরু মোটা বা চওড়া তুলি রঙে ডুবিয়ে সাদা ক্যানভাসের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টানলে একটি ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। সে-ব্যঞ্জনার তারতম্য ঘটে সেই আঁচড় তুলির না হয়ে যদি প্যালেট নাইফের হয়, সরু বা মোটা হয়, ভারি বা হাল্কা হয়, খুব দৃঢ়

কম্পমান হাতে, দ্রুত বা অলস ভঙ্গিতে সেই দাগ টানা হয় বা শুরুতে সরলরেখার মতো, মাঝখানে উত্তাল তরঙ্গের মতো, শেষে নিস্তরঙ্গ রূপ নেয় সেই দাগ। অভিব্যক্তির খুব বড় রকম পার্থক্য ধরা দেয় যদি সেই রঙের প্রলেপ বা রেখা খুব সুপরিকল্পিত হয় বা তাৎক্ষণিক প্রেরণা বা উদ্দীপনার ক্ষিপ্র স্বাচ্ছন্দ্যে আছড়ে পড়ে পটের গায়ে। তুলির আঁচড় বা প্যালেট নাইফের দাগ, নানা রঙের ছোপ অর্থবহ হয়ে ওঠে তাদের নিজস্ব বস্তুসত্তার জোরে, নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং বিভাজিত চিত্রপটের জমিতে তাদের অবস্থান-বিন্যাসে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে। সেই সম্পর্ক তীব্রতা, নম্রতা, সংঘাত বা সুষমার বিচিত্র মাত্রা পায় চড়া, নম্র, হাল্কা, গাঢ় ইত্যাদি বর্ণচ্ছায়ের বৈচিত্র্যে, মসৃণ বা অমসৃণ বর্ণপ্রলেপে, বিভিন্ন অবয়বের আয়তনে, আকারের অনিশ্চয়তায় বা তার নিশ্চিত, তীক্ষ্ণ জ্যামিতিক চরিত্রে। এমনিভাবে বিমূর্ত ছবির ফ্রেমে সৃষ্টি হয় এক চিত্র-কাঠামো যাকে জ্যাকবসন বলেছেন, কবিতার verbal structure-এর প্রসঙ্গে, ছবির pictorial structure। এই চিত্র-কাঠামোর মধ্যেই চিত্রবস্তুর রূপ ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে।

সেই জন্যে বিমূর্ত ছবির চিত্রবস্তুকে আমরা অর্থবহ চিহ্নে বা চিহ্নসমূহে রচিত চিত্ররূপ বলতে পারি। কোনো সেমান্টিক কনটেন্ট থাকে না বলে বিমূর্ত ভাষা বিশেষ রূপময়তা অর্জন করে মূলত সম্মুখীকরণ প্রক্রিয়ায়। বলা যেতে পারে মূর্ত চিত্রকলাতে যে বিমূর্তে উপাদান—যার উল্লেখ করেছেন অলডাস হাক্সলি— এতদিন দৃষ্টির অলক্ষ্যে ছিল চিহ্নিতের প্রবল দাপটে, বিমূর্ত চিত্রকলা তাকেই সম্মুখীকরণ করেছে চিহ্নিতকে আপাত নিশ্চিহ্ন করে। সস্যুর বলেছেন ভাষা একটি কাগজের মতো যার সম্মুখ পৃষ্ঠায় থাকে চিহ্নিত চিন্তাবস্তু বা অর্থ, পিছনের পৃষ্ঠায় থাকে চিহ্নকারী ধ্বনি। একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিমূর্ত চিত্রভাষায় ঐ কাগজটিকে উল্টে ধরা হয়েছে অর্থাৎ চিহ্নকারী এখন সামনের পৃষ্ঠায়। তাই চিহ্নিত নয়, চিহ্নকারী এবং চিহ্নকরণের (siginification) আধিপত্য বিমূর্ত ছবির ক্যানভাসে। কিন্তু চিহ্নিতের অবস্থান কোথায়? যে অর্থ বা ব্যঞ্জনা ঐ চিহ্ন থেকে উৎসারিত হয় তা— পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্টদের অনুসরণ করে বলা চলে— স্বতঃসিদ্ধভাবে চিহ্নেই সংলগ্ন থাকে না। যদি থাকত তাহলে চিহ্নকারীর গুরুত্ব কমে গিয়ে চিহ্নিতই প্রধান হয়ে উঠত। চিহ্নকারী কেবলমাত্র চিহ্নিতের অনুপস্থিতি উপস্থিতির নিছক পরিবর্ত হিসেবে কাজ করত। যেমন আমরা বাস্তবধর্মী ছবিতে প্লাসটিক উপাদানের উপস্থিতি ভুলে দিয়ে সেমান্টিক উপাদানকে ছবির সর্বস্ব মনে করি। বিমূর্ত চিত্রকলায় সে-সুযোগ নেই। চিহ্নিতের অনুপস্থিতি বা চিহ্নের নির্বিশেষ ব্যঞ্জনার জন্যে দর্শকের দৃষ্টি ধরে রাখে চিহ্নকারী। ক্যানভাসে প্রলিপ্ত রঙ, রঙের ছায়াপ্রচ্ছায়, বুনট, জমির বিভাজন, সাদৃশ্য বর্জিত অবয়বের বিচিত্র রূপ বিন্যাসে বিধৃত থাকে নির্বিশেষ অরূপের রূপ।

আমরা ইতিপূর্বে সস্যুর-আলোচিত langue এবং parole-এর উল্লেখ করেছি। নৈর্ব্যক্তিক নিয়মকানুনে নিয়ন্ত্রিত একটি সার্বিক চিহ্নব্যবস্থাকে সস্যুর বলেছেন

লাঙ্গে আর এই চিহ্নব্যবস্থার সক্রিয় অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে প্যারোলে বা ভাষার নির্দিষ্ট প্রয়োগে— কথায় বা লেখায়। বিমূর্ত চিত্রভাষায় এই সুসংগঠিত লাঙ্গের অস্তিত্ব কিছুটা অনিশ্চিত। কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে যা দিয়ে বিমূর্ত চিত্র ভাষার সাধারণ সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায়, অন্য চিত্ররীতির ভাষা থেকে আলাদা করা যায় কিন্তু তা দিয়ে একটি লাঙ্গের ধারণা গড়ে তোলা যায় না। কারণ, আমরা আগেই বলেছি বিমূর্ত চিত্রভাষা কোনো গোষ্ঠীর নয়, ব্যক্তির বা কয়েকজন ব্যক্তির সৃষ্টি বলে কোনো সুসংগঠিত নৈর্ব্যক্তিক চিহ্নব্যবস্থা হতে পারে না।

আবার যখন কোনো শিল্পীর বিমূর্ত চিত্রকলা আলোচ্য বিষয় হয়— কান্দিন্স্কি, টাটলিন, বা জ্যাকসন পোলক— তখন আমরা মোটামুটি একটি লাঙ্গের ধারণা নিয়ে শুরু করলেও প্যারোলের বিশ্লেষণেই মনোযোগী হতে হয়। নির্দিষ্ট ছবিতে বা নির্দিষ্ট কোনো শিল্পীর কোনো পর্বের ছবিতে বিধৃত চিত্রকাঠামোর মধ্যেই চিহ্নবস্তুর অর্থ বা ব্যঞ্জনার সন্ধান সীমিত রাখতে হয়। যে বিমূর্ত ভাষায় কান্দিন্স্কি আধ্যাত্মিক আবেগ প্রকাশ করেন, সেই বর্ণমালা, শব্দসম্ভারে (vocabulary) রোঠকোর ছবির আধ্যাত্মিকতা ব্যঞ্জিত হয় না। এই প্যারোলের প্রাধান্য আমরা বুঝতে পারি আরও দুজন রুশ ফর্মালিস্টের কাব্যভাষার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে। এঁরা দুজন হলেন ভোলোসিনভ এবং বাখতিন। এঁরা দুজনেই সস্যুরের মতো ভাষাকে নৈর্ব্যক্তিক, বিমূর্ত চিহ্নব্যবস্থা মনে করেন না যেখানে চিহ্নিত ও চিহ্নকারীর মধ্যে সম্পর্কের একটি অবিভাজ্য, অপরিবর্তনীয় কাঠামো থাকে। তাঁরা মনে করেন ভাষা নির্দিষ্ট সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কথক ও শ্রোতা, লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংলাপের মতো যাতে বিভিন্ন evaluative accents বা মূল্যসূচক জোর দেওয়ার জন্যে একটি নিশ্চল ব্যঞ্জনা বা নির্দিষ্ট অর্থের পরিবর্তে অর্থ একাধিক হতে পারে, ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিকতা অর্জন করে। বিমূর্ত ছবিতেও চিত্রভাষা এইরকম dialogic বা সংলাপধর্মী। সংলাপ চলে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তি দর্শকের। অর্থ ও ব্যঞ্জনা তাই দর্শকে দর্শকে ভিন্ন হয় এবং একই শিল্পীর ভিন্ন ভিন্ন ছবিতে চিহ্নকারী ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। বা চিহ্নের ভিন্নতা সত্ত্বেও চিহ্নিত একই হতে পারে।

তবু বিমূর্ত চিত্রকলার সামগ্রিক বয়ান বা discourse-এ এইরকম প্যারোলের লক্ষণাক্রান্ত স্বতন্ত্র দুটি কি তিনটি চিহ্নব্যবস্থা পেয়ে যেতে পারি— একটিতে চিহ্নের কাজ হল প্রবল আবেগমথিত অন্তঃসত্যকে রূপায়িত করা যেমন কান্দিন্স্কি, জ্যাকসন পোলক। আর অন্যটিতে চিহ্নিত হল সবরকম ব্যক্তিগত আবেগবর্জিত, বহিঃসত্যের দার্শনিক নির্মিতি যার দৃষ্টান্ত টাটলিন, রোডচেংকো, মন্দ্রিয়ান, ডোয়েসবার্গ। এমন নয় যে এই দুটি ঘরানাতে বিমূর্ত চিত্রকলার বহুধা বৈচিত্র্যকে ধরা যাবে। কিন্তু সেই বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। □

মূর্ত-বিমূর্ত সংবাদ

অমিতাভ সেনগুপ্ত

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে আজকের প্রসঙ্গ শিল্পের কোনো বিশেষ ধারার বিষয় নয়, অথবা আমার নিজের ছবির কথাও নয়। কারণ বিমূর্ততার চিন্তায় আমি শিল্প-ইতিহাসের দিকে যেতে চাই না। এই নিয়ে বিস্তর বইপত্র, আলোচনা আছে। আবার শিল্পী হিসাবে নিজের কাজের অভিজ্ঞতাকে বিমূর্ততা দিয়ে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী আমি নই। আপাতত ইতিহাস বা 'আমি'র কথা থাক।

আজকের প্রস্তাব কিছুটা শিল্পের দর্শন ঘেঁষা। চেষ্টা করা মূর্ত-বিমূর্ত ধারণা থেকে শিল্পের ইমেজে আসা, এই বিবর্তনটাকে বোঝা যায় কিনা। শিল্পের মূল-সূত্রকে চিনতে গেলে ভিন্নতাকে না দেখে অভিন্নতাকে দেখাও যে আরেকটা প্রয়োজন, প্রসঙ্গ সেইদিকে। তবুও প্রশ্ন থেকেই যায়, ভিন্নতা ছাড়া অভিন্নতা আসে কী করে? ভালো ছাড়া মন্দ? দিন ছাড়া রাত বা মূর্ত ছাড়া বিমূর্ত? এইভাবেই আলোচনা এগোতে পারে— মূর্ত থেকে বিমূর্ত, ইতিমধ্যে শিল্পের ইমেজ।

মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে কয়েকটি শব্দের মর্মার্থ ঠিক করে নেওয়া যাক। যেমন

শিল্পী, যার শিল্প-প্রসঙ্গ নিয়ে কথা। শিল্পী এখানে প্রধানত আর পাঁচজনের মতন 'মানুষ'। যার আছে একটি বহির্জগত এবং অন্তর্জগত। যেমন— একটা বস্তুর সীমিত রেখার বাইরের অংশ আউটার স্পেস, ভিতরের অংশ ইনার স্পেস, শিল্পীরও তাই। বাইরে ও ভিতর এই দুইয়ের সাধারণ সীমায় যে রেখা, সেটা তুলে দিলেই ভিতর-বাহির এক। কিন্তু সেই অবস্থায় বস্তুকে পাওয়া যায় না বা শিল্পী বলে বিশেষ ব্যক্তি নেই। অর্থাৎ ভিন্নতা একটা রেখা বা ব্যক্তিত্ব। এই রেখার দুইদিক থেকে যে ডায়ালগ তা থেকে আসে শিল্প বা মানুষের যে কোনো আচরণ।

মূর্ত

মূর্ত যা বাস্তব, আমাদের বহির্জগত। এই বহির্জগতের অনেকটাই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে। যেমন— বাতাস দেখতে পাই না— কিন্তু গায়ে লাগে।
এর গতির পরিমাপ করা যায়। রঙ দেখি গাছে, ফুলে, নানা বস্তুতে। আবার দেখি নিসর্গের যা কিছু সামনে তা পাল্টাতে থাকে দিগন্তের দিকে।
বস্তুজগতকে দেখা ও চেনার অভিজ্ঞতা মানুষের চিন্তাকে ক্রমে যেন প্রসারিত করে চলেছে। প্রকৃতির নানা ঘটনার কার্যকারণ, বস্তুর জৈব-অজৈব রূপ ইত্যাদির ধারণা এল সভ্যতা ও জ্ঞানের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এরই সঙ্গে এল মূল্যবোধ, উপলব্ধি ও প্রকাশের বিবর্তন। মূর্তজগতকে পরিপূর্ণভাবে চেনার চেষ্টা অনেকটা মানুষের নিজেকে চেনার চেষ্টা। এই ইচ্ছা বোধহয় মানুষের প্রকৃতিগত, কারণ এই বিবর্তনের গতি চলমান ও সক্রিয়।
শিল্পী কীভাবে মূর্তকে পায়? প্রথমত এই পাওয়াটা ঘটে চেতনায় এবং সংবাদটা আসে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি দিয়ে। হয়তো এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় প্রয়োগে। দুজন শিল্পীর মধ্যে একই বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার শারীরিক-মানসিক প্রক্রিয়াটা একই কিন্তু ভিন্নতা ঘটে উপলব্ধিতে। সুতরাং ব্যক্তিভেদে শিল্পের প্রকাশে বা দেখায় যে ভিন্নতা তা সত্য।
অর্থাৎ ব্যক্তির বাইরে বস্তুর এক প্রাকৃতিক সত্তা আছে যা স্বাধীনভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। সেই পরিপূর্ণ সত্যকে শিল্প খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ করে চলেছে। এই প্রসঙ্গটা আর একটু ভাবা যাক।
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়মে বস্তুকে দেখার ঘটনাটা নানা সীমিত অবস্থার অধীন। যেমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে যা দেখি তা ত্রিমাত্রিক বস্তুর সব নয়। অথবা ওই বস্তু সম্পর্কে আমার নানা ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে ইত্যাদি। এছাড়া ওই বস্তুর আপাত চেহারাটাও সব নয়, তার নানা সাব-স্ট্রাকচার আছে যার অস্তিত্ব আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মধ্যে পাবার কথা নয়।
দেখার এই আপাত সীমিত অবস্থাকে হয়তো আরো উন্নত করা সম্ভব। যদি বিজ্ঞানের নানা আধুনিক ধারণাকে মেনে নেওয়া যায়, যেমন সব বস্তুর সাব-স্ট্রাকচারকে ভাঙতে

ভাঙতে কয়েকটা মূল উপাদানে পৌঁছাই— তারপরেও আছে একটা বস্তুহীন এনার্জিতে মিলিয়ে যাওয়া। বস্তুজগতের আদি সূত্রপাতও, ধারণা করা হচ্ছে, এনার্জির একটা প্রচন্ড আলোড়ন থেকে। সেই আদি উপাদানের নানা মিলিত ঘটনার ফল আবার বস্তুজগতের বিবর্তন— তার মধ্যে মানুষও আছে। অর্থাৎ বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপ অসীম এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

তাহলে বস্তুর শুরুতে এবং শেষে যে অসীমতা, মাঝখানে থাকে রূপের বিবর্তন। দর্শনের ধারণাও অনেকটা একইভাবে বলা, এক থেকে বহু হওয়া। অথবা এক আদিসত্তার বহু প্রকাশ ইত্যাদি।

যদি বিজ্ঞান ও দর্শনের এই ধারণাকে পূর্ণ সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়, অন্তত বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে, তাহলেও শিল্পীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষমতার সীমিত অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে না। মানুষ হিসাবে শিল্পী প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্গ, সাব-স্ট্রাকচারের অধীন এবং উপাদানগতভাবে সে নিজে গাছপালা-জল-পাহাড়ের সঙ্গে একটা বিবর্তনের সুরে বাঁধা। এই কসমিক ও অ্যাকসমিক ধারণা এক জ্ঞানলব্ধ চিন্তা, যার কিছুটা ছাপ হয়তো পড়ে শিল্পীর মনে। কারণ, শিল্পীও সচেতন সামাজিক জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে।

সুতরাং পূর্ণ সত্য বা অ্যাবসোলুট ট্রুথ বলে যদি কিছু থাকে তা অনুভূতি ও ধারণার মধ্যে। এই অবস্থায় দর্শন ও বিজ্ঞান যদি সত্য হয় তাহলে প্রাকৃতিক সত্য এবং ধারণার সত্য একই স্তরে এসে পৌঁছাতে পারে মানুষের সুপারকনশাস স্তরে।

তাহলে, মূর্তজগতকে শিল্পী বোঝে দুই ভাবে— প্রথমত দেহের সীমিত অভিজ্ঞতায়, দ্বিতীয়ত— যা আরো পরিব্যাপ্ত তা হল মনের উপলব্ধিতে, জ্ঞানে, বা বোধে। এর মিলিত সম্ভাবনা অসীম।

তবুও মূর্তকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় কি শিল্পীর প্রকাশে? লক্ষ করার, শিল্পীর মাধ্যমের বস্তুগত, আঙ্গিকগত এবং ইমেজের চরিত্র। রঙ, ক্যানভাসের ছবি বস্তুজগতের আপাত দৃশ্য অথবা ইঙ্গিতময় ইমেজ বহন করে। কোনোটাই একেবারে পরিপূর্ণ সত্য নয়। ছবিও হয় একটি আলাদা বস্তু, প্রাকৃতিক বস্তুরও প্রচ্ছায়া হয়ে। শিল্পী নিজে কোনো একটি বিশেষ অনুভূতিকে অবলম্বন করে ছবি শুরু করেন, কিন্তু মনে মনে চিন্তার বিবর্তনে বা রঙ-তুলির আবর্তনে অনেক আকস্মিকতার সম্মুখীন হন। অনেকটা ভেসে চলার মতন, কাজ গতি নেয় আকস্মিকতার স্রোতে। অবশেষে ফর্ম এবং কনটেন্টের একটা আভাস দেখা দেয়। শিল্পী শেষ করেন কাজ এক নান্দনিক পরিণতিতে। এই অবস্থার নানা ব্যতিক্রমও আছে, পূর্বপরিকল্পিত যেমন রিলিজিয়াস ও ইকনগ্রাফিক কাজে। সেখানে নিয়মভঙ্গ নেই। কিন্তু আকস্মিকতার ব্যবহার, অবচেতনকে মুক্তিতে আনা, আধুনিক অনেক ধারায় লক্ষ করা যায়।

কিন্তু তবুও শিল্পের কোনো ধারাতেই, গুহাচিত্র থেকে আধুনিককাল, স্থান-কাল-

সংস্কৃতিভেদে শিল্পের কোনো প্রকাশেরই বাস্তবের পূর্ণতা নেই। সবক্ষেত্রেই শিল্পের বিভিন্ন এক 'আইডিয়াল'কে মানা হয়েছে। শিল্প সেই চূড়ায় পৌঁছাতে চেয়েছে। কিন্তু এক এক আইডিয়াল এক একটা মাপকাঠি যা দিয়ে অসীমকে মেপে যাওয়া যায় অনন্তকাল ধরে। শিল্প তাই বিবর্তিত হয়ে চলেছে খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্য দিয়ে আপন নিয়মে।

তাহলে মূর্ত যা আমাদের চিরপরিচিত এবং ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে, আসলে তা আছে এক অসীম পরিস্থিতির মধ্যে।

বিমূর্ত

বাস্তবতার পূর্ণতায় যদি শিল্প কোনো সময়ই পৌঁছাতে না পারে, তাহলে পূর্ণতার খোঁজ কেন? মানুষ ও প্রকৃতি, এই সম্পর্কের পরিপূর্ণ অর্থকে মানুষ জানতে চায়— আগেই বলেছি। এখন প্রশ্ন আসে, শিল্প যদি মূর্ত বা বাস্তবের প্রচ্ছায়া হয়, ইঙ্গিতবহ হয়, তাহলে শিল্প কি মূলত বিমূর্ত?

তাহলে তো বিমূর্ততা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে, শিল্পে প্রকাশ্য? তাই কি?

এ প্রসঙ্গে মূর্তকে আর একটু দেখা যাক। যেমন বস্তুর নানারূপ, এই বিশেষ রূপ ও নাম দিয়ে তৈরি হয় মানুষের পরিচিত জগত। এভাবে ভাবা যায় গাছ, পাথর, মানুষ··· ইত্যাদি অসংখ্য বস্তু থেকে সাধারণভাবে যে ধারণা তা হল বস্তু ও তার বিশেষত্ব অর্থাৎ রূপ। কিন্তু বস্তু বা রূপ এই দুই শব্দই বিমূর্ত ধারণা। রূপ বা ফর্ম বলতে অসীম সংখ্যক অবস্থা, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আবার রূপ এই বিমূর্ত ধারণাকে পাই— আমগাছ, ফুল বা পরিচিত কোনো বস্তুকে ভেবে বা দেখে। এসবই রূপ— এই ধারণার সীমিত অর্থ বা প্রকাশ।

ভাবা যাক রঙ আরেক বিমূর্ত ধারণা। আবার লাল নীল বা হলুদও বিমূর্ত ধারণা, যতক্ষণ না বিশেষ রূপের মধ্যে তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা হচ্ছে। এই রঙ বলতে কোনো আলাদা বাস্তব অস্তিত্ব নেই, আমাদের চিন্তায় ছাড়া। কিন্তু বাস্তব করা হয় বস্তুর রঙ-এ, ক্যানভাসে হলুদ দিয়ে।

সময় বলতে কীভাবে বুঝি? সময় এক অসীম বা বিমূর্ত ধারণা মাত্র। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সময়কে দরকার, তাই পাওয়া ঘড়ির কাঁটায়, মৃত্যুর সীমায়, বা আনন্দ-বেদনার মুহূর্তে গুনে গুনে। তবুও সময় চলতে থাকে। বিমূর্তের এই ধারণা থেকেই মূর্তকে বোঝা।

তাহলে মানুষ মূর্তের মধ্য দিয়ে বা রূপ থেকে রূপের বিমূর্তে পৌঁছায়। অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধিতে, তারপর জ্ঞান, মূল্যবোধ, বিচার ও আচরণ অর্থাৎ শিল্পের প্রকাশ। অন্তর ও বহির্জগতের এই আদান-প্রদান সক্রিয় ও চলমান।

বিমূর্তকে প্রকাশে পেতে গেলে মূর্তে পৌঁছাতে হয়। আবার মূর্তকে দেখারও যেন শেষ নেই। শিল্পের কোনো এক ফ্রেমে মূর্ত তার পূর্ণতায় প্রকাশিত হয়।

এই পরিস্থিতিতে শিল্পী যা খোঁজে তা মূর্তের আরো ব্যাপ্ত, আরো পূর্ণতর অর্থাৎ— বিমূর্তের ইঙ্গিতবহ কোনো ইমেজ। শুরু হয় ইমেজের সন্ধান নানাভাবে।

[বক্তব্যের এই পর্যায়ে এসে চৌদ্দটি কালার স্লাইড দেখানো হয়। রেনোয়াঁস (মাইকেল এনজেলো) আধুনিক পাশ্চাত্য অ্যাবস্ট্রাকট (ভিকটর ভাসারেল্লী), নাইজেরিয়ার ট্রাইবাল আর্ট ফর্ম (নক, ইফে, ইবো ইত্যাদি), একটি বাগানের লাল ক্যাকটাস ফুল এবং কিছু ভারতীয় সমকালীন কাজ (প্রবীর গুপ্তের 'মুখ', সোমনাথ হোরের 'ক্ষত' সিরিজের কিছু ব্রোঞ্জ এবং অমিতাভ সেনগুপ্তর দুটি কাজ)। উদ্দেশ্য, খুব সংক্ষেপে শ্রোতাদের মনে ধরিয়ে দেওয়া সময়-সমাজ-সংস্কৃতিভেদে শিল্পের ইমেজের বিবর্তন এবং সব ইমেজই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিন্তু বিমূর্তের ইঙ্গিতবহ, ইত্যাদি।]

ইমেজ

আউটার স্পেস ও ইনার স্পেস যেখানে মিলিত ইচ্ছে সেই সীমারেখা দিয়ে ইমেজ পায় রূপ। সেই রেখার গতিকে, দিককে পাল্টালেই রূপ বিবর্তিত হয়। এই গতিকে সরলীকৃত অবস্থায় আনা যায়, রূপ হয় এক সরল মূল আকৃতি যেমন গোল, চতুষ্কোণ, সরল বা বক্ররেখা ইত্যাদি।

কিন্তু, এই ইমেজকে এভাবে পাল্টানোর চিন্তা কেন? কারণ বস্তুর আপাত দৃশ্য থেকে গভীরে যাওয়ার চেষ্টা। এটা কীভাবে নানা শিল্পরীতি নানাভাবে চেষ্টা করে তার আভাস পাওয়া গেল স্লাইডগুলিতে। এই গভীরতায় পৌঁছানোর চেষ্টাতেও দেখা যাচ্ছে যুগচিন্তার উপলব্ধি। সব যুগেই উপলব্ধির এক 'আইডিয়াল'কে খাড়া করা হয়েছে, আর সেই যুগশিল্পী তার ইমেজ দিয়ে পৌঁছাতে চেয়েছে সেই আইডিয়ালে। 'আইডিয়াল' যা তা চিন্তার, অসীম বা পূর্ণতা সম্পর্কে ধারণার, অর্থাৎ শিল্পের ভাবসত্য। ভারতীয় জীবনধারাতেও এই আইডিয়ালের বিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় বস্তুজগতকে স্বীকার করা হলেও প্রধান খোঁজ যেন অসীমের। অন্তর্জগত ও বহির্জগতকে নানাভাবে বলা— পুরুষ ও প্রকৃতি, আত্মা ও ব্রহ্ম, দ্বৈত ও অ-দ্বৈত, ইত্যাদি। এসব বিশ্লেষণের মধ্যে ব্রহ্মকেই যেন বেশি ভাবা হয়েছে। জৈন বা বৌদ্ধ চিন্তায়ও যেন ভাবা হয়েছে জীবনের পূর্ণতা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, উদ্দেশ্য চেতনার বিকাশে। পূর্ণ জ্ঞান বা মোক্ষ যা হল জীবন থেকে মুক্তি।

যেহেতু ভারতীয় উপলব্ধিতে মূর্ত গৌণ, বিমূর্তই পূর্ণতা, ইমেজ এখানে এক সরলীকৃত ধারণা। এমনকি ইমেজ ইঙ্গিতবহ হয়ে সরলীকরণের এক চরম পর্যায়ে এসেছে। যেমন বিন্দু, স্বস্তিক চিহ্ন, ইত্যাদি। রিয়ালিজমের যে লক্ষণগুলি— ত্রিমাত্রিকতা, আলোছায়া, পারস্পেকটিভ, ইত্যাদি— তার বিশেষ চর্চা ভারতীয় ধারায় বহুদিন ধরে দেখা যায়নি। রঙ-এরও যে সংক্ষিপ্ততা তাও একই চিন্তার ইঙ্গিত। অর্থাৎ আইডিয়াল এখানে অনন্ত সুন্দরের ধ্যানে। ছবিতে গাছ, মেঘ, পাহাড়, জল, মানুষ সব যেন প্রাকৃতিক রহস্যের এক মূল ছন্দে বাঁধা।

মনে হয় এই মূল চিন্তাধারা পরবর্তী বেশ কিছুটা সময় ধরে ইসলামিক ও পাশ্চাত্য চিন্তার সঙ্গে মিশে গেলেও একটা স্রোতের মত বহমান। নানা প্রভিন্সিয়াল কোর্ট-আর্ট এবং কোম্পানী আর্ট, এর পরে পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক আর্ট-এর মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিল্পের যে বিবর্তন তা মূলত সমাজ ও রীতিগত বিবর্তন। কারণ সমকালীন শিল্পে এসে নানা রীতির মিশ্রণ ঘটলেও আইডিয়ালের সেই মূল চিন্তা এখনও অবিচ্ছিন্ন।

সুতরাং শিল্পে বিবর্তন দুইভাবে, ভাবসত্যের যা চিন্তায় এবং ইমেজের যা প্রকাশে। শিল্পীর বাইরে বস্তু বা মূর্ত জগত আবার দাঁড়িয়ে আছে আর এক অনন্ত সত্য নিয়ে, স্বাধীন। এই দুই সমান্তরাল স্রোত, ভাবসত্য ও প্রাকৃতিক সত্যের মাঝখানে যে আদান-প্রদান, তার মধ্য দিয়ে শিল্প কোনো অ্যাবসোলুট স্টেট-এ পৌঁছাতে পারে কি? পূর্ণতা? সেখানে কোনো ইমেজ থাকে? সে অবস্থা যেহেতু প্রকৃত নয়, যা প্রকৃত তা হল ক্ষণিক বা খণ্ড অবস্থা। ইমেজ কখনোই মূর্তের পরিপূর্ণ রূপ নয়, বা পরিপূর্ণ বিমূর্তকরণ নয়— শুধু মূর্ত-বিমূর্তের বিবর্তন সংবাদ। □

Amitava Thar '95

Amitava Sher '95

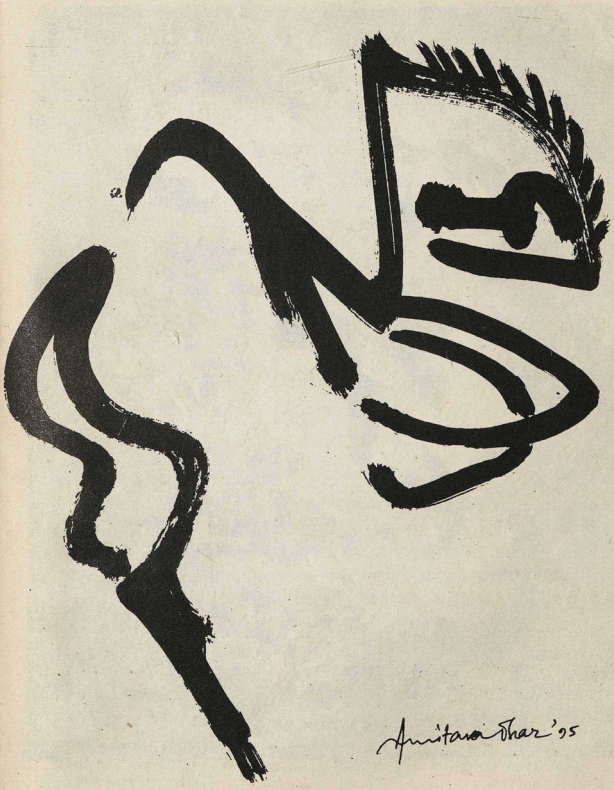
Amitava Thar '95

Amitava Dhar '95

বিমূর্ততা এবং বাস্তবিকতা

যোগেন চৌধুরী

'অ্যাবস্ট্রাক্ট'— এই কথাটি আমরা নানা অর্থে ব্যবহার করি। এর ব্যাকরণগত অর্থ হল সারাংশ অর্থাৎ কোনো বস্তু বা বিষয়কে ছেঁকে তার সার অর্থাৎ মূল বা মূল্যবান অংশটিকে বার করে আনলে যা পাই তা হল 'অ্যাবস্ট্রাক্ট'। এর প্রক্রিয়াকে বলি 'অ্যাবস্ট্রাকশন' ও শব্দটির চলতি অর্থও কত রকমের, বিমূর্ত, অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে, দুর্বোধ্য, ভাববাদী অবাস্তব ইত্যাদি। আমরা বলি 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া' অর্থাৎ অস্পষ্ট ধারণা, বিমূর্ত ধারণা— বা ভাববাদী ধারণা। সাহিত্য, দর্শনে, বিজ্ঞানে এবং চিত্রকলার ক্ষেত্রে এ কথাটি নানা কারণে বহু ব্যবহৃত। শিল্পীদের কাছে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট' কথাটি অত্যন্ত পরিচিত। চিত্রকলার ইতিহাসে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট' একটি আন্দোলন বিশেষ। এভাবেই আমরা 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' কথাটির সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত। 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' কথাটির যে সমস্ত চলতি অর্থগুলি জানি, যেমন সারাংশ, কখনও কখনও বিমূর্ত, কিংবা অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য— তা খুবই ন্যায়সংগত কারণে ঘটেছে। কারণ হল কোনো বস্তু বা বিষয়-এর যে বাহ্যিক রূপ বা আকার আমরা দেখি

তাকে যদি বিশ্লেষণ করে, বিভাজন করে সারাংশকে আলাদা করে ছেঁকে বার করি তাহলে অনেক সময়েই সেই বস্তুর রূপ বা আকার এমনকি স্বাভাবিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়।

যেমন জল। জলের অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ— অবস্থা বা সারাংশ হল :

H_2O অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণু ২, অক্সিজেন পরমাণু ১।

দুটোই বায়বীয় পদার্থ। তখন সে তার রূপ ও ধর্ম দুটোই হারিয়ে বসে— তখন তাকে আর জল বলে চেনা যায় না। সে হয়ে ওঠে বিমূর্ত কিংবা অস্পষ্ট এবং অবাস্তব, আমাদের চোখে, লৌকিক অর্থে। কিন্তু ঐ দুই অদেখা বায়বীয় পদার্থ দুটির মধ্যেই তো জলের মূল গুণগুলি লুকিয়ে আছে।

এভাবে যদি একটি ছবি কিংবা ভাস্কর্যকে, তার গড়নকে উদাহরণ হিসেবে নিই তাহলেও এ বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

একটি ছবির বাইরের রূপ হল পাহাড়, গাছপালা, আকাশ, ঘরবাড়ি, মানুষ নদী-নালা কত কী। ছবিতে এই সব উপকরণ— দৃশ্যগ্রাহ্য বিষয়বস্তু থাকে যাকে আমরা চিনতে পারি। চিত্রকলার ইতিহাসে দেখতে পাই, দীর্ঘকাল ধরে অন্যান্য নানা প্রকারের ছবির সঙ্গে এই সব দৃশ্যগ্রাহ্য বস্তুকে নির্ভর করেই অসংখ্য ছবি আঁকা হয়েছে। ক্রমে আধুনিক শিল্পীরা অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানলেন যে ছবি যখন শিল্প হয়ে ওঠে তখন ঐ চেনা রূপগুলি, বিষয়বস্তুগুলি নিমিত্ত মাত্র। এ চেনা রূপ বা বিষয়-বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে বা তার নিচে চাপা থাকে কতগুলি ভাব ও আঙ্গিকগত উপাদান

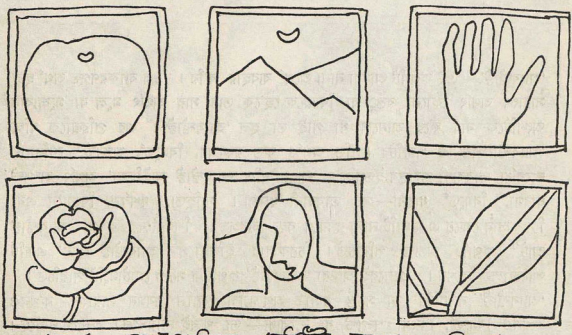

(এলিমেন্টস) যা শেষ পর্যন্ত ছবিটির নান্দনিক সৌন্দর্য গড়ে তোলে। যেমন লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা', কিংবা রেমব্রান্টের 'নাইট ওয়াচ' কিংবা ভ্যান গগের 'সান ফ্লাওয়ার'— এই সব ছবিগুলিই কিন্তু সার্থক ছবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে শুধুমাত্র তার বাস্তব আকৃতির সঠিক রূপায়নের জন্য নয় বরং চিত্রিত আকৃতির সঙ্গে জড়িত থাকা আঙ্গিকগত নান্দনিক উপাদানগুলির যথাযথ প্রকাশের জন্য। ক্রমে আধুনিক শিল্পীরা বাস্তব বিষয় ও রূপকে কোনো একসময় সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে

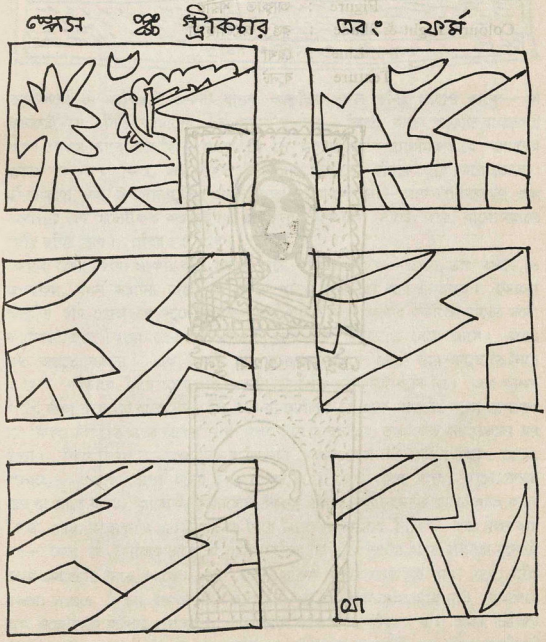

শুধুমাত্র ঐ সব ভাব ও আঙ্গিকগত নান্দনিক উপাদানগুলিকে নিয়েই ছবি আঁকলেন— যা বিমূর্ত এবং অনেক দর্শকের কাছে স্বভাবতই যা দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। জলের গঠন যেমন কতগুলি অমূর্ত বস্তু নিয়ে, এই বিমূর্ত ছবিগুলোর গড়নের পিছনেও রয়েছে কয়েকটি আঙ্গিকগত উপাদান যা অবশ্যই বিশেষ ভাব ও অনুভূতি-সঞ্জাত। সেগুলি হল :—

Space	:	জমি / জমি বিভাজন
Structure / Form	:	কাঠামো / গড়ন
Figure	:	আকৃতি / শরীর
Colour / Light & Shade	:	রঙ / আলোছায়া
Line	:	রেখা
Texture	:	বুনট

টেক্সচার অথবা বুনট

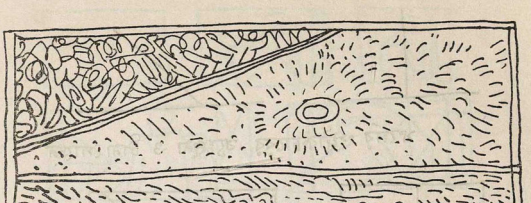

প্রকৃতপক্ষে এ সবকিছুই একটি বাস্তব আকৃতির সফল ছবির মধ্যেও থাকে— সে কারণেই সে ছবিটি আমাদের এত আকর্ষণ করে— কিন্তু বাস্তব আকৃতি বা রূপের সঙ্গে তা এমনভাবে মিলেমিশে থাকে যে সে কারণে তাকে প্রাথমিকভাবে আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু এই সকল উপাদানগুলিই তো ছবিকে 'ছবি' করে তোলে। ছবির মধ্যে এই উপাদানগুলির ছন্দোবদ্ধতা, টানা-পোড়েন— আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং সর্বোপরি এক অলৌকিক ব্যঞ্জনাই তো ছবির নান্দনিক রূপ সৃষ্টি করে, যাকে বলতে পারি ছবির প্রাণ। ছবির হার্ট থবে।

কোনো রেখা কিংবা আকার যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— তখন তার অনুভূতি একরকম, যখন সামান্য হেলে বা বেঁকে থাকে তখন তা আর একরকম। কোনো আকৃতি যদি গোল এবং সুডৌল হয়— তার এক ভাব। আবার করাতের দাঁতের মতো কাটাকাটা হলে কিংবা তে-কোণা হলে তা আর এক অনুভূতি নিয়ে আসে। রঙের কত অদ্ভুত ব্যঞ্জনা। এক একটা রঙ মনের মধ্যে এক একটা ভাব অনুভূতি নিয়ে আসে। কীভাবে নিয়ে আসে তার কিছুটা বুঝলেও অনেকটাই বুঝি না। আর পাশা-পাশি যখন কয়েকটি বা অনেকগুলি মিশ্র বা মৌলিক রঙ একে অপরের সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ হয় কিংবা বিপরীত রঙের আকর্ষণে বা বিকর্ষণে আবদ্ধ হয়, তাও কত অদ্ভুতভাবে মন টানে। কিন্তু কেন? তাও ঠিক বুঝি না। অথবা কেন এই লাল গোলাপ ভালো লাগছে? এসবের সঙ্গে মনের কিংবা অনুভবের যোগ আছে বুঝি, কোনো বস্তুর সাদৃশ্য আছে বুঝি, ব্যালেন্স-ইমব্যালেন্স কিংবা সিমেট্রি-অ্যাসিমেট্রির যোগ আছে বুঝি কিন্তু আরো কাছাকাছি একটু গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করলে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না— কেন যে মৌলিকভাবে ঐ গোলাকৃতির মসৃণতা কিংবা রঙের রঙিনতা মনে ঐ রকম অনুভূতি নিয়ে আসে। তার কোনো সঠিক কারণ স্পষ্ট হয় না। শুধু বুঝি ভালো লাগছে কিংবা কেমন যেন লাগছে। তা ঠিক ধরা-ছোঁয়া যায় না। অবশেষে এক অলৌকিক ব্যাপার মনে হয়। একইভাবে যাকে ছবির টেক্সচার বলি অর্থাৎ চিত্রপটে রঙের বুনট— সেসব দেখামাত্র বা স্পর্শমাত্র আমাদের অনুভূতি হয়, ব্রেন সারকিটে

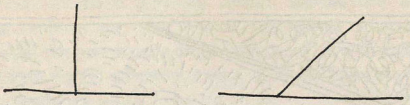

ফর্মের স্ট্রাকচারের ব্যঞ্জনা ও টানা পোড়েন

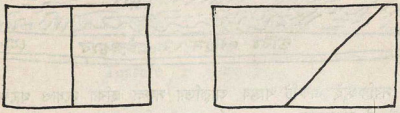

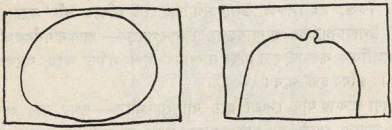

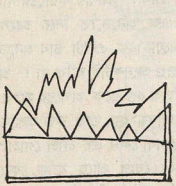

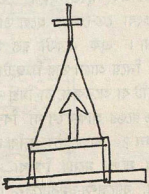

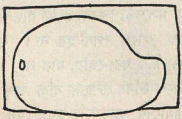

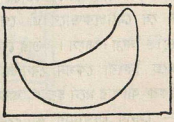

তা গ্রাহ্য হয়, কখনো মসৃণ বা মোলায়েম, কখনো কর্কশ। এই সব অনুভূতি-গ্রাহ্যতা ছবির দৃশ্যগত রূপ অর্থাৎ ভিসুয়াল ইমেজ কিংবা আকৃতির ক্ষেত্রে কত নতুনতর রূপ ও অনুভব সৃষ্টি করে। গানের সুরেও দেখি গলার কাজ, গিটকিরি কিংবা মীড়, ছোট ছোট অসংখ্য ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে যেন সমুদ্রের জলের ওপর। বিতোফেনের সংগীতের কথা মনে পড়ে, কী অস্থির তার উত্তাল ওঠানামা— টানা-পোড়েন। কিংবা যদি অনুভব করি মসলিন কাপড়ের অথবা ভেলভেটের মসৃণতা। ভাস্কর্যেও সেই একই ব্যাপার। বাঙ্কুসীর 'উড়ন্ত পাখী' গায়ে হাত লাগালে কিংবা চাক্ষুষ দেখলে এক নরম অনুভূতি। আবার রামকিংকরের গড়া 'সাঁওতাল পরিবার' যা কাঁকুরে মাটিতে গড়া— তার কর্কশ অনুভূতি। এ সবই তো টেক্সচার বা বুনটের ব্যাপার। গভীর অনুভবের বিষয় সেখানেও। কিন্তু এ সবের মূল কারণ কি আমরা বুঝতে পারছি ? আর একটি উদাহরণ দেব তাতে স্পষ্ট হবে বিষয়বস্তু নয়— প্রকৃতপক্ষে আকার বা গড়নের কী অসাধারণ আকর্ষণীয় ক্ষমতা। নারীশরীরের স্তন কিংবা তার সামগ্রিক

গানের সুরেও দেখি গলার ঢেউ

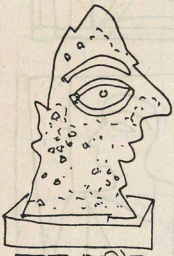

কাঁকুরে মাটিতে গড়া

মসৃন উড়ন্ত পাখীর মত

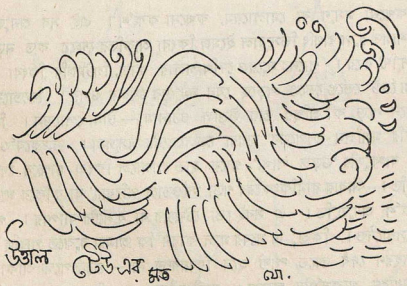

উত্তাল ঢেউ এর মত

যো.

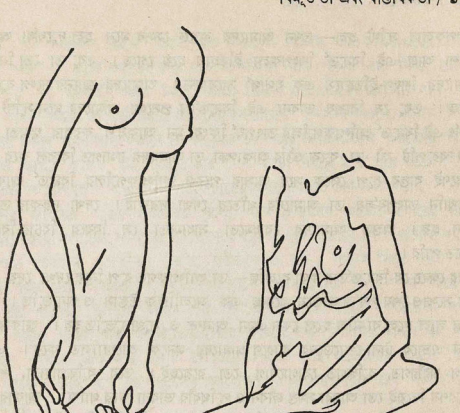

← শরীরের গড়ন যখন সুডৌল

শরীর যখন সুডৌল, তাজা, মসৃণ থাকে যৌবনে— তখন তা মনকে কী আকর্ষণ করে। কিন্তু পরে তার সেই আকৃতি থাকে না— তা ভেঙে পড়ে, যদিও সে নারীই থাকে তবু তা আর মনকে টানে না। কিন্তু কেন? এই বিমূর্ত আকার, রঙ, বুনট, এ-সবের মধ্যে কী এমন রহস্যময়তা রয়েছে— যা আমরা বুঝে উঠতে পারি না অথচ ভাল লাগছে কিংবা লাগছে না। শুধু বুঝতে পারছি এই সব মৌলিক আঙ্গিকগত বিষয় বা উপাদান বা এলিমেন্টসগুলিই চিত্রকলা কিংবা ভাস্কর্য কিংবা সকল নান্দনিক সৃষ্টির মূল বাঁধন এবং মূল আধার। তাই একথা মেনে নিতে পারি যে ছবি ও ভাস্কর্যের বাস্তব রূপের আড়ালে লুকোনো তার আকার, রঙ, রেখা, বুনট ইত্যাদি বিমূর্ত মৌলিক বিষয়গুলির ভূমিকা মূলত অনেক বেশি মূল্যবান এবং অর্থপূর্ণ। যদিও আমরা যখন বাস্তব বিষয়বস্তুগত কোনো ছবি দেখি তখন কখনো মনে হয় না যে এই সব আঙ্গিকগত উপাদানগুলিই প্রকৃতপক্ষে সেই ছবিকে গড়ে তুলেছে— তার সহজগ্রাহ্য বাস্তবতা নান্দনিক ছবির জন্য উপলক্ষ মাত্র। এভাবে ছবির আঙ্গিকগত মৌলিক উপাদানগুলিকে আশ্রয় করে যখন শিল্পচর্চা শুরু হল— অর্থাৎ বিমূর্ত

শিল্পকলার সৃষ্টি হল— তখন আমাদের কাছে সেসব মনে হল দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট। অবশ্য আজ এই বিমূর্ত শিল্পকলা ইতিহাস হয়ে গেছে। তবু তা তো নিশ্চিতই আমাদের শিল্প-ইতিহাসে এক যথার্থ সংযোজন। আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। তবু যে বিশেষ ভাবনা এই বিমূর্ততা প্রসঙ্গে আমাদের মনে সৃষ্টি হচ্ছে, অর্থাৎ এই বিমূর্ত আঙ্গিকগুলির তাৎপর্য কিংবা মন আকর্ষণ করবার ক্ষমতা অথবা তার স্বরূপটি কী তা বুঝে ওঠার আকাঙ্ক্ষা, তা আমাদের ক্রমাগত বিহ্বল করে। সে কারণেই বাস্তব রূপ থেকে সরে আসার পরেও আঙ্গিকগুলির বিমূর্ত আকার যে কতখানি তাৎপর্যময় তা আমাদের খতিয়ে দেখা দরকার। দেখা দরকার তা কেন এমন হয়। অন্তত আমাদের বোধমতো সাধ্যমতো সে বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি।

ছবির ক্ষেত্রে যে বিমূর্ততার কথা বলেছি— তা আঙ্গিকগত রূপ নিয়ে দেখা দেয় কিন্তু তার সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে রয়েছে এক অলৌকিক উদ্ভাস ও অনুভূতি। অর্থাৎ ফুল লাল হলে বা নীল হলে কেন এমন আনন্দ ও সুখানুভূতি হয়। আকারগুলি কেন এভাবে টানা-পোড়েনের কারণে আমাদের মনকে আন্দোলিত করে। এসবের সঙ্গে শরীরগত, বুদ্ধিগত যোগাযোগ তো রয়েছেই। তবে বুদ্ধিগ্রাহ্যতা, শরীরের অনুরণন দিয়েই তো আমরা সমস্ত জীবন ও পৃথিবীর ভাবনা করে থাকি। আকার, রঙ, রূপ এ সবের পিছনে শুধুমাত্র আঙ্গিকগত অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিমূর্ততা নয়— বরং একটি অখণ্ড বিমূর্ততা যা আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্ভবত সবসময় জড়িয়ে রয়েছে, তা সমস্ত ভাব অনুভূতিরই কেন্দ্রভূমি। শুধুমাত্র চিত্র-শিল্পকলার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সমস্ত পরিসরে, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য— সমস্ত রকম সম্ভাব্য শিল্পকলা থেকে শুরু করে অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব বোধের সঙ্গে তা সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। শব্দ, আকার, রঙ, অনুভূতি এ সবকিছু যখন সার্থক হয়ে প্রকাশ পায় তখন তার গুণগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এমন একটা জায়গায় আমরা পৌঁছাই যেখানে আমরা স্পর্শ করি ইটারনিটিকে, অলৌকিক আশ্চর্য এক অনুভব। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি, সৃষ্টিশীলতা যখন সার্থক রূপ নেয় ছবির ক্ষেত্রে, তখন আকার, রঙ, বুনট এবং বিষয়ানুভূতি এ সবকিছু তখন অলৌকিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়, তা অসীমকে স্পর্শ করে— এই সকল আঙ্গিক ও রূপের মধ্য দিয়ে। বরং বলা যায় শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত করেন অসীমকে, অলৌককে। রূপ প্রাণ পায় অরূপের স্পর্শে। তখনই এইসব ছকে বাঁধা হিসেবের আঙ্গিকগুলো নড়ে চড়ে ওঠে। তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। তার হৃদয় কেঁপে ওঠে। যেন এক ম্যাজিক। অর্থাৎ সীমা যখন গুণগতভাবে যুক্ত হয় অসীমের সঙ্গে, রূপ যখন অরূপকে ধারণ করে, লৌকিক ভাব যখন হয়ে ওঠে অলৌকিক— তখনই সব সঠিকভাবে প্রকাশ পায়। তখনই ঐ সব আকার, প্রকার, রঙ, রেখা, আলোছায়া— তার হিসেবনিকেশ ছেড়ে দিয়ে প্রাণবন্ত

হয়ে ওঠে এক সর্বাঙ্গীণ বিমূর্ত অলৌকিক অপরূপ নিঃসীম অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের জীয়ন-কাঠির স্পর্শে। তাকে অনুভব করা যায়, মাপা যায় না। দেখা যায় কিন্তু ছোঁওয়া যায় না। তা আকর্ষণ করে কিন্তু তাকে নিজস্ব করে যেন পাওয়া যায় না। তবু বোঝা যায়— কারণ তা গভীরভাবে আমাদের মন টানে। কোনো ছবিতে, গানে কিংবা কবিতায় সেসব যখন সার্থকভাবে প্রকাশ পায় তখন তার টানাপোড়েন আমাদের অস্থির আবেগে আপ্লুত করে। এই বিমূর্ততার স্পর্শ ছাড়া কিছুই মূর্ত হয়ে ওঠে না— যা গুণগতভাবে প্রাণবন্ত। এখানেই অ্যাবস্ট্রাক্টের অথবা বিমূর্ততার সার্থকতা।

আমাদের জীবনের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সঙ্গে, দিন ও রাত্রির আলো-আঁধারের সঙ্গে, চিত্রকলা কিংবা সংগীতের সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এর অভাবে শিল্প-সংগীত-কবিতা হয়ে ওঠে প্রাণহীন, অর্থহীন। কিন্তু কীভাবে তা ঘটে? ভেবে নিতে পারি স্রষ্টা শিল্পী যখন সেই অসীমতাকে অলৌকিকতাকে চেতনার মধ্য দিয়ে স্পর্শ করেন— তখন তাঁর স্পর্শের ছোঁওয়া লাগে তাঁর কাজে, ছবিতে কিংবা কবিতায়। দর্শক কিংবা পাঠক তখন তাঁর অনুভূতিগ্রাহ্যতার কারণে স্রষ্টা শিল্পীর অনুভবের সঙ্গে যুক্ত হন, কখনো একাকার হন। পৌঁছতে পারেন সেই অলৌকিক জগতে কিংবা স্পর্শ করেন সেই রূপ ও অরূপের আলোছায়া, আকার-নিরাকারের সীমাহীনতার সৌন্দর্যকে।

এতো গেল শিল্পীর অনুভবের, চিত্রের, কবিতার, সংগীতের বিমূর্ততার কথা। এবার আসা যাক অন্য কথায়। মূর্ত এবং বিমূর্ততার অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং কংক্রিট— এ বিষয়টিতে। আমরা কংক্রিটকে খুঁজি এবং পেতে চাই। অবাস্তবতা থেকে বাস্তবকে শ্রেয় মনে করি। এখন বাস্তবিক জীবনে এই মূর্ত ও বিমূর্ততার অথবা অ্যাবস্ট্রাক্ট ও কংক্রিটের স্বরূপটি কী এবং তা কতখানি যথার্থ তাই খতিয়ে দেখা যাক। যদিও এ বিষয়টিকে আমরা বুঝতে গিয়ে প্রায় সবসময়ই ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে চলে যাই। এই বাস্তব-অবাস্তবতা, আকার-নিরাকার, মূর্ত ও বিমূর্ততা এ বিষয়টি আমরা দৈনন্দিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যখন ভাবি তখন আমাদের ইচ্ছে হয় তাকে বাস্তবিকভাবে মূর্তভাবে পেতে। স্বভাবতই তাকে কংক্রিটভাবে পেতে চাই। বরং বলা যায়, অধিকাংশ মানুষই মনে করেন এ জীবন ও জগতের সবকিছুই বাস্তবিক কংক্রিট। অর্থাৎ এ জীবনের সঙ্গে যা কিছু যুক্ত বা বাস্তবিক বলে আমরা জানি অর্থাৎ ঘরবাড়ি, চেয়ার-টেবিল, ফুলদানি, নিয়মকানুন, ধর্মনীতি, রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা— এ সব-কিছুই আমাদের কাছে বাস্তবিক অর্থাৎ কংক্রিট এবং মূর্ত। কারণ, তার ওপর নির্ভর করে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা চলি, চলতে চাই। এই সব জীবনযাপনের উপকরণ বিধিব্যবস্থা এ সবই আমাদের বাস্তব বন্দোবস্ত— এ ছাড়া যেন আর কিছু হতেই পারে না। আমরা এসব নিয়ে নিবিড়ভাবে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ি, খুনোখুনি করতেও ছাড়ি না। অর্থকরী উপার্জনের চেষ্টায় আমাদের মনের সমস্ত সুখশান্তি বিসর্জন দিই। আমরা যদি গভীরভাবে এর বাস্তব রূপকে বিশ্লেষণ করতে বসি তাহলে ধরা পড়বে

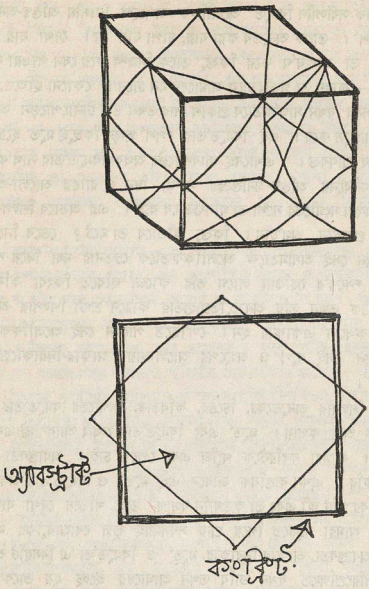

এর প্রকৃত রূপ কী। এখন আমরা খুঁজে দেখব এই সব বস্তু ও বিষয়গুলি সত্যিই কতখানি বাস্তবিক বা concrete বা কতখানি abstract কিংবা বিমূর্ততার সঙ্গে যুক্ত।

যদি জীবনযাপনের কথা ধরি উদাহরণ হিসেবে, এই বাস্তব জীবন এবং অস্তিত্ব-অনাস্তিত্বের বিষয়টি কিংবা এই জন্ম-মৃত্যুর কথা এ সবই অত্যন্ত রহস্যময়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি মৃত্যু, যা অজানা যা বুঝি না, তার বাস্তবিকতা স্বীকার না করি তা হলে ভুল করা হবে। প্রকৃত ভাবনায় জন্ম যতখানি অলৌকিক— এ জীবনযাত্রা যতখানি বিস্ময়কর, মৃত্যুও তাই। কিছুই কংক্রিট নয়, তা আমরা প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছি। সবই অনিত্য মনে হয়। প্রাচুর্যের মধ্যেও কোনো সুখশান্তি নেই। হেনরি ফোর্ডের বংশধর আলফ্রেড ব্রুশফোর্ড বলছেন, "I seem to have everything,

but do I have happiness ?" আবার জীবনকে যতখানি নিয়মকানুন দিয়ে বাঁধতে চাই— তা যেন আরও গভীর কোনো নিয়মের কারণে ভেঙে যায়। তার বিমূর্ততা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। যদি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথাও ধরি, আত্মীয়, কাছের লোকজন, বন্ধুত্বের কথা, তা হলে সেখানেও দেখি অদ্ভুত এক টানাপোড়েন। সে টানাপোড়েনও বিমূর্ততায় ভরা, যেন বিমূর্ত এক ছবি রচনা করে যায় সারা জীবন। এ বিশ্বের সঙ্গে তার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, বেঁচে থাকা, প্রতিষ্ঠা-সুখ-শান্তি-সমস্ত কিছু এক গভীরতর অনুভবের বিষয়। সেখানে মূলত 'বাস্তবিকতা' থাকে না, থাকে এক প্রগাঢ় অলৌকিক অনুভূতি ও অস্থিরতার জগত, যাকে আমরা বুঝে উঠতে পারি না, ছুঁতে পারি না, আমাদের ক্রমাগত বিপন্ন করে। জীবনানন্দের কবিতায় সচরাচর সেই অনুভবের কথা দেখতে পাই—

"...অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;..."

কিংবা

"দেয়ালে তাদের ছায়া তবু,
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা বলে মনে হয়।
এ সব শূন্যতা ছাড়া কোনোদিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।"

ক' দিন আগে এক সন্ধ্যায় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে। কবিতা ও গানের আয়োজন হয়েছিল। আরো অনেকে এসেছিলেন। তার ছ' দিন পর তিনি হঠাৎ 'চলে' গেলেন। তবু তাঁর লেখা পড়ে থাকল অলৌকিক অনুভূতি নিয়ে। সেই জীবন্ত মানুষটির সমস্ত চেতনা ও বোধ তার মধ্যে কী প্রখরভাবে উচ্চারিত হতে থাকে— শুধুমাত্র কথা ও শব্দের—

"...তার সবই চাই,
সে হাত বাড়ায় চারিদিকে
লোলুপ অগ্নির মতো সে হাত বাড়ায় চারিদিকে
হাতে ও জিহ্বায় চাই বাগানের ফুল
গভীর, বিষণ্ণ, কালো— মানুষের ভুল
সমস্ত, সমস্ত, সব।

অথবা

"এখন যাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে, ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়

যেতে পারি
যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো ?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো।"

জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো সম্পর্কেও সেই একই কথা। ঘরবাড়ি, চেয়ার, টেবিল, ফুলদানি এগুলোর বাইরের রূপের মধ্যেও যে সৌন্দর্য তা ছবি বা শিল্পকলার মতোই। রূপ ও গড়নের মধ্যেকার বিমূর্ততার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আবার এই বস্তুগুলোকে ভাঙলে, বিচ্ছিন্ন করলে, বিয়োজন করলেও সেই একই বিমূর্ততার দিকে আমরা পৌঁছব। তখন দেখতে পাই এসব বস্তুগুলো সবই কতগুলি বিশেষ বস্তুর যোগসাজসে নির্মিত এবং আরো গভীরে গেলে দেখব কতগুলি মৌলিক পদার্থ দিয়ে সে সব গড়া। শেষ পর্যন্ত যা খুঁজে পাই তা হল— অণু-পরমাণুর যোগসাজস, যাকে ভাঙতে গেলে আর শেষ খুঁজে পাই না। সব রহস্যময় হয়ে ওঠে। দেখতে পাচ্ছি বাস্তবিকভাবে এখানেও সেই অলৌকিকতা প্রচ্ছন্নভাবে বা বলি, স্পষ্টভাবেই সমস্ত বস্তু ও পদার্থগুলির মধ্যে। এতো বৈজ্ঞানিকভাবেই সত্য। এই বিশ্বজগতে সমস্ত কিছুর মধ্যে চলছে এক অণু-পরমাণুর খেলা। ভাবতে অবাক লাগে— এই যে হাতের কলমটি তার প্রতিটি পদার্থই অণু-পরমাণু দিয়ে গড়া এবং সেগুলির মধ্যে নিরন্তর নিউট্রন-প্রোটন ও ইলেকট্রন চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বের, এ জগতের প্রতিটি বস্তু— জল, হাওয়া, আলো, গাছপালা, মনুষ্য-শরীর সবকিছুতেই সেই একই ব্যাপার। এক মহাজাগতিক জীবন-স্রোত বয়ে চলেছে যেন। যাকে বুঝতে গেলে সেই অলৌকিক অসীমতার সঙ্গেই এ-সবের যোগ খুঁজতে হয়। শুধু এই সব বস্তু, ঘরবাড়ি এ সবকিছু আমাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলে বাস্তবিক বলে মনে হয় এবং সেই আপাত বাস্তবতার কারণে এ সবের অলৌকিক রূপটিকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে। আসলে সারা বিশ্বভুবন জুড়ে সবই পদার্থ-অণু-পরমাণুর খেলা। বীজ, মাটি, জল, আলো, হাওয়া থেকে নির্মাণ পেল গাছ, সেই গাছ বড় হয়ে ফুল-ফলে ভরে গেল— আবার তা মাটিতে মিশে গেল। মৃত্যুর পর মানুষ যেমন বিলীন হয় পঞ্চভূতে। মেঘ থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে নদী,

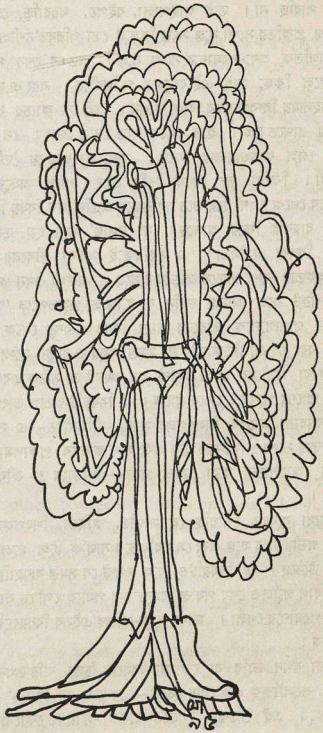

সমুদ্র। আবার সমুদ্র থেকে মেঘ। এ সব তো আমরা দেখছি। সমস্ত বস্তুগুলি প্রতিনিয়ত বারবার তার অন্তর্নিহিত অলৌকিক রূপের আধারে ঘুরে ফিরে প্রকাশিত হচ্ছে। তাই বস্তুকে, তার বাইরের রূপকে, আমরা খুব পরিচিতভাবে চিনলে, জানলেও শেষ পর্যন্ত সে সবকিছুকে কখনোই আর বস্তুগতভাবেও বাস্তবিক বা কংক্রিট বলে ধরতে পারছি না। তাই গাছপালা, বইপত্র, ঘরবাড়ি, চেয়ার-টেবিল—জীবন-যাপনের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কিছুই তো পরিবর্তনশীল এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-ভাবে মহাজাগতিক অণু-পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত। অতএব শেষ পর্যন্ত কংক্রিট অর্থাৎ 'বাস্তবিক' বলে কিছু নেই এই বস্তুগত পৃথিবীতে। বরং এ সবকিছুই তো অসীম অলৌকিক রহস্যময় বিশ্বজগতের অংশবিশেষ। এই যে কাচের ফুলদানিটি। তাকে কত যত্ন করে রাখতে চাই। হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। সে ভাঙা কাচের টুকরো গুলো চলে গেল কাচওয়ালার কাছে। সেগুলো গলিয়ে তৈরি হল জানলার কাচ কিংবা চিমনী। কিংবা জল থেকে তৈরি হতে পারে অফুরন্ত শক্তি। এভাবে বিমূর্ততাই সব থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সবকিছুর অন্তর্নিহিত বিষয় হিসেবে।

একটা কথা বারবার ফিরে আসছে। যা যথার্থ মনে হয় তা হল বিমূর্ততা এবং অলৌকিকতা কিংবা অসীমতা। এ সবকিছুই সর্বদা জীবনের ও জাগতিক সমস্ত রকমের বাস্তবিকতার সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছে। একথা এখন পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে যাকে কংক্রিট বলে আমরা জানি বা বুঝি তা প্রকৃতপক্ষে 'কংক্রিট' নয়। অর্থাৎ এ বিমূর্ততার গুণাগুণকে জীবনের সমস্ত বিষয় ও বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা মূলত সম্ভবই নয়। বরং এই জাগতিক জীবনের সমস্ত বিষয় ও বস্তুর সঙ্গে যখন অলৌকিকতা, বিমূর্ততা কিংবা অসীমের যোগ সৃষ্টি হয় তখনই তা সঠিক এবং তার সঠিক রূপ ও লাবণ্য কিংবা প্রাণের পূর্ণতা পেয়ে থাকে। এ বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যময়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আচরণ, শিল্পকলা, সৃষ্টি, রীতিনীতি—এ সবকিছুই বিমূর্ততা ও অলৌকিকতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুক্ত এবং সার্থকভাবে প্রকাশমান। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে— কীভাবে তা জীবনযাত্রা ও সমাজকে প্রভাবিত করে।

আমরা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছি যে সংগীত, কবিতা, শিল্পকলা ইত্যাদির সঙ্গে বিমূর্ততা কী গভীরভাবে যুক্ত এবং সে সবকিছুর সার্থক রূপ মূলত এই বিমূর্ততার ওপরই গড়ে উঠেছে। এ বিষয়টিও খুব স্পষ্ট যে সমস্ত ব্যবহারিক বা মহাজাগতিক বস্তু কিংবা পদার্থগুলিও শেষ পর্যন্ত বিমূর্ততার পর্যায়ে পৌঁছে যায় যখন তা শুধুমাত্র রহস্যময় অণু-পরমাণুর খেলা। জীবন-মৃত্যু-অস্তিত্ব এইসব বিষয়গুলিও কত বিস্ময়কর এবং অলৌকিক।

এমনকি আমরা যখন ভাবি বা কোনো বিষয়ে চিন্তা করি তখনও কোনো সীমাহীন শূন্যতা থেকে, অলৌকিক এক বোধ থেকে— কোনো এক বিমূর্ত আলোর মধ্য থেকে যেন তার শুরু। এই প্রক্রিয়ার পিছনে যদিও শরীরগত কোনো চেতনা কাজ করছে

তবুও আমরা বুঝি এই সমস্ত বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি বিমূর্ত মনের কারসাজি। যে কোনো সৃষ্টিশীল ভাবনার পিছনেও তাই। এমনকি অঙ্কের মতো প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর সূত্র ও মনের এমন কোনো এক অ্যাবস্ট্রাক্ট স্তর বা চেতনা থেকে উঠে আসে। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো তার শুরুর, কখন কীভাবে ঘটে যায় তা যেন ব্যাখ্যা করে বলা যায় না।

বিমূর্ত চেতনা ও অনুভবের এই বিষয়টি নিয়ে অবশ্য আমরা বার বার বুঝতে ভুল করি। মহাভারতের সেই গল্পটি মনে পড়ে। পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসকালে বকাসুর যখন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সব থেকে আশ্চর্যজনক ব্যাপার কী, তখন যুধিষ্ঠির বলেছিলেন যে মানুষ এত মৃত্যু দেখছে প্রতিনিয়ত, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝে উঠতে চায় না যে সেও একদিন বা যে কোনো দিন মরে যেতে পারে। এ ঘটনাটির মধ্য দিয়ে মৃত্যু বিষয়ে যতখানি বলা হয়েছে তার থেকেও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আমাদের বোধের অভাবের কথা। আমরা প্রতিনিয়ত ভুল বুঝি। বাস্তব সম্পর্কে এবং বাস্তবের সঙ্গে এই বিমূর্ত চেতনা ও অলৌকিকতার যোগাযোগের বিষয়টি যে কত ব্যাপক এবং সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখনও অসম্পূর্ণ বলেই আমাদের সমাজনীতি, রাজনীতি ও জীবনযাপন বিষয়ে এত অস্পষ্টতা। আমরা জীবনে, সমাজে, সমাজ-ব্যবস্থায় সর্বাকছু বাস্তবিকভাবে, কংক্রিটভাবে পেতে চাই। পশ্চিমী এবং ইয়োরোপীয় চিন্তাধারায় কিংবা মার্ক্সীয় চিন্তা-ভাবনা প্রায় সে রকমই। বিমূর্ত চেতনাকে তথাকথিত প্রগতিশীল মার্ক্সবাদীরা কখনোই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি এবং এখনও করেন না। তাদের ধারণা ভাববাদী বিষয়-ভাবনা সবই জীবনের পরিপন্থী। তা অবাস্তব। বিমূর্ত চেতনাও তাই। তারা জীবনকে পরিমাপের মধ্য দিয়ে বাস্তবিকভাবে পেতে চেয়েছেন। তারা মনে করেন ভাববাদী চিন্তা-ভাবনা মানুষকে যুক্তিবাদী ভাবনা থেকে বিচ্যুত করে, অস্পষ্ট করে তোলে, বিভ্রান্ত করে সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রে। বিমূর্ততা সেখানে অত্যন্ত অবহেলিত।

"Our policy in art, a policy of rejection of *abstractionism*, formalism and any other bourgeois distortions— is a Leninist policy which we have been unswervingly pursuing and will continue to pursue in the future" (Nikita Khrushchov, 8 March 1963).

তাঁরা বুঝতে পারেননি যে বিমূর্ত চেতনা, বিমূর্ততা বা ভাববাদী বিষয়গুলি— শুধুমাত্র বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের বিষয় নয়— তা আরও গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি ব্যাপার। বাহ্যত মানুষ ও সমাজের কথা ভাবতে চাইলেও, তারা জাগতিক এবং মানবিক বিষয় সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়কে সত্যিই অবহেলা করেছেন— ভুল বুঝেছেন। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে বিমূর্ত চেতনা, বিমূর্ততা কিংবা ভাববাদ জীবনের সঙ্গে, প্রকৃত বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে বিমূর্ততাকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনকে কল্পনা করা সম্ভব নয়। মার্ক্সবাদীরা তাঁদের

জীবনের রূপ ও রীতিনীতির মধ্যে বাস্তবিক হওয়ার 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতির মধ্যে নিজেদের অজ্ঞাতে সত্যিই অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

এইরকম একটি অসম্পূর্ণ চিন্তা নিয়ে যথার্থভাবে কোনো শিল্প-সংগীত-সাহিত্য চর্চা কিংবা সৃষ্টিশীলতা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় কোনো সঠিক ভাবনা। সম্ভব নয় জীবনকে, সমাজকে সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা। ঐতিহাসিকভাবে তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট জমানায় প্রচুর দক্ষতার সঙ্গে বড় বড় আকৃতির ছবি, ভাস্কর্যের কাজ হয়েছে কিন্তু মহৎ শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয়নি প্রায় কিছুই। একথা একই সঙ্গে ধারণা করে নিতে পারি যে বিমূর্ততা, বিমূর্ত চেতনা, অলৌকিকতা বা ভাববাদকে সমাজজীবনের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তাঁরা সমাজ গঠনের একটি প্রয়োজনীয় এবং মৌলিক সূত্রকে অবহেলা করেছেন। ফলে রেজিমেন্টেশন প্রশ্রয় পেয়েছে। সব কিছুকে নিয়মকানুনের কঠিন বেড়াজালে শক্ত হাতে বেঁধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অগ্রাহ্য করে একটি 'মানবিক' সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যা অনড় মনোলিথিক স্ট্রাকচারের মতো 'কংক্রিট'— যেখানে স্থান পায়নি জীবনের, সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিময়তা, মানবিক অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত বিমূর্ত ভাব-ভাবনা, রূপ-অরূপ কিংবা অলৌকিকতার অবিশ্বাসযোগ্য ভূমিকা— যাকে বাদ দিয়ে কোনো রূপ, ভাবনা, গড়ন কিছুই সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। সে কারণেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত মার্ক্সবাদী সমাজব্যবস্থা হঠাৎ ভেঙে পড়ে। বাস্তবের সঠিক রূপ বিষয়ে তাদের ধারণার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। উন্নত আধুনিক কোনো সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে গেলে, সঠিক রাস্তা খুঁজে পেতে গেলে বিমূর্ত চেতনার ভূমিকাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। পশ্চিমী সভ্যতার তথাকথিত যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-প্রেমিক বাস্তববাদী-দেরও সেকথা মনে রাখতে হবে। কারণ মূর্তকে সম্পূর্ণ করতে গেলে বিমূর্ততার ছোঁওয়া, বিমূর্ত চেতনার যোগ তাতে চাই। লৌকিকের মধ্যে অলৌকিকের যোগ হওয়া চাই। রূপ সম্পূর্ণ হয় অরূপের স্পর্শে। সমস্ত বাস্তবিক বিষয়গুলি সব সময়েই অলৌকিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে— যথার্থ বাস্তবতা সেভাবেই গড়ে ওঠে।

রূপ যা কিছু দেখছি তার মধ্যে অরূপের যোগ থাকে বলেই রূপের এত বাহার। ইনফিনিটনেস কিংবা ইটারনিটির যোগ হয় সবকিছুর সঙ্গে তখনই তা প্রাণ পেয়ে ওঠে। এক অতীন্দ্রিয় চেতনার সঙ্গে যুক্ত সেই বিমূর্ত চেতনা— যা সবকিছুর সারাৎসার তার যোগাযোগেই সমস্ত বাস্তবিক বিষয়গুলি প্রাণ পেয়ে ওঠে। তখনই তার আত্মা গড়ে ওঠে। ছবিতে গানে, কবিতায়— সমস্ত শিল্পে, জীবনেও, সমাজব্যবস্থাতেও। রূপের সঙ্গে অরূপ মিলেমিশে থাকে, বাস্তবের সঙ্গে অলৌকিক জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে, মূর্তর সঙ্গে অমূর্ত একাকার থাকে— এই চেতনা ছাড়া বাস্তবকে বোঝা যায় না। তাই বাস্তবিকভাবে কিছু ভাবতে গেলে, বাস্তবিকভাবে কিছু করতে গেলে বা গড়তে গেলে সেই চেতনা থাকা প্রয়োজন। এমনকি এও সত্যি যে ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা

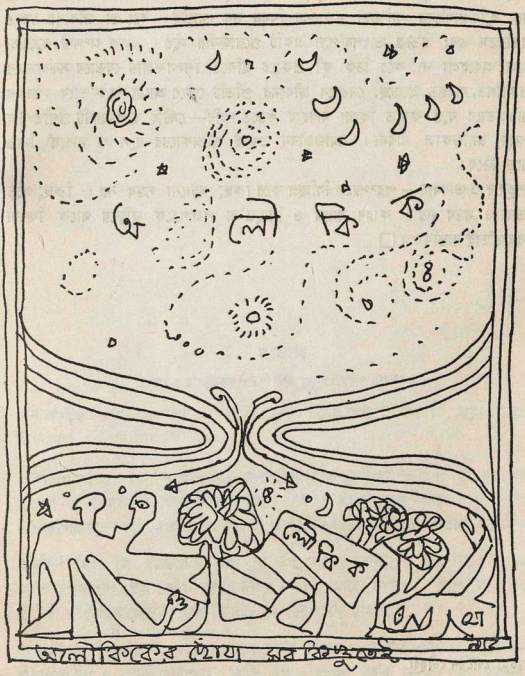
অলৌকিকের ছোঁয়া
লৌকিক

সামাজিক ভাবে সমস্ত দৈনন্দিন সমস্যাগুলির সমাধানের ক্ষেত্রেও এই বোধ অত্যন্ত সঠিক সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করে। আপাত 'বাস্তবতা'কে অতিক্রম করে তখন আমরা পূর্ণতর বাস্তবতাকে ধারণা করতে পারি। শিল্পসৃষ্টি থেকে শুরু করে ব্যক্তিজীবন, সংসার কিংবা সমাজ, তার কাঠামো— রাজনীতি, সমাজনীতি— ইত্যাদি যা কিছু ইহজগতে আমাদের প্রয়োজন সে সবকিছু গড়তে গেলে এই বোধ ও ভাবনাই আমাদের সঠিক রাস্তায় নিয়ে যাবে। যেমন আমরা দেখেছি চিত্রকলায় এর যোগাযোগ— জীবনেও তাই। তাই বিমূর্ততার বিষয়টি শুধুমাত্র স্পিরিচুয়ালিজম নয়; ধর্মীয় একটি বিষয় নয়, বুদ্ধিজীবীদের পাণ্ডিত্য প্রকাশের বিষয় নয় মোটেই— বরং তা জীবনের ক্ষেত্রে গভীরতম এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রয়োজনীয় সূত্র। একে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য বলে অবহেলা না করে ঠিক কী প্রকারে ছবিতে, শিল্পকলায় যেভাবে সফলভাবে প্রকাশিত, ব্যবহৃত হয়েছে, সেভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আরো সতর্কভাবে, সজ্ঞানে সঠিকভাবে যুক্ত করতে কিংবা ব্যবহার করতে পারি— সেটাই হবে একটি প্রগতিশীল কিংবা র‍্যাডিকাল ভাবনা। সমাজজীবন তখনই সত্যিকারের রূপ ও মাধুর্য নিয়ে গড়ে উঠবে।

বস্তুবাদ ও ভাববাদ— পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে কিছু ঘটানো সম্ভব নয়। কিছু গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। কারণ বাস্তব ও বিমূর্ততা পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে কিংবা বিমূর্ততাই বাস্তবিক। □

স্কেচ: যোগেন চৌধুরী

ডায়েরি থেকে

গণেশ হালুই

মাতাল

[ভাস্কর রামকিঙ্কর স্মরণে তাঁর মৃত্যুর পরদিন লিখিত]

যেন শায়িত অনড় ভাস্কর্য। আমার প্রথম ও শেষ দেখা। পি. জি. হাসপাতালের হিমঘরে।

গ্রন্থিতেই শক্তি। তেমনি বেদনাসিক্ত অভিব্যক্তিতেই অনুভূতির জোর। লোকটা মারা গেল! ভরা হাঁড়িটা কাত হয়ে গেছে। ভেজা মাটির রঙ আরও গাঢ় হয়েছে। উই-ঢিপির মতো ভুঁইফোড় মাটির গন্ধ। মানুষজন গাছগাছালিদের মাতাল করেছে।

একদিন ছিল সে দাঁড়িয়ে। নড়ি না তবু মারো কেন? উপর-নিচ। আমার চতুর্দিক দিয়েছি তোমাদের। আমি নিঃস্ব এখন। মারো কোপ। লাগে না। ভরা হাঁড়িটা কাত হয়ে গেছে। ভেজা মাটির রঙ আরও গাঢ় হয়েছে।

থোয়াই-এর উঁচু-নিচু। আমি চাইনি সমান করতে। চাইনি প্রকৃতির বুকে বালি কাগজের ঘষা। আমি আদিম। আমি নগ্ন। অসভ্য বর্বর আমি। যা পেয়েছি—

ঘুমিয়েছি তার চেয়েও বেশি। আমি আর উঠব না। ভরা হাঁড়িটা কাত হয়ে গেছে। ভেজা মাটির রঙ আরও গাঢ় হয়েছে।

সত্যকে চাইনি মিথ্যার প্রলেপে ঢেকে দেব। ছিলাম যা তাই আছি। উলঙ্গ তোমার সম্মুখে। দেখো— কাঁকড় বিছানো ওই রাঙা মাটিটাকে মাড়িয়ে। উঁচু-মাথা তালগাছের শীর্ণ ছায়ায়। পোড়-খাওয়া ধূসর চাপড়ার আবরণে। পাবে আমাকে।

উই-ঢিপির মতো ভুঁইফোড় মাটির গন্ধ। মানুষজন গাছগাছালিদের মাতাল করেছে। □

শিল্প-প্রসঙ্গে

[ডায়েরি থেকে]

চিত্রে ষড়ঙ্গ

আমাকে দেখো = রূপ ও প্রমাণ
আমাকে জানো = বর্ণ ও সাদৃশ্য
আমাকে নাও = ভাব ও লাবণ্য
আমাকে রাখো = শিল্প-সৃষ্টি

শিল্পে যথার্থতা

কলসি ভরে গেলে কানা বেয়ে উপছিয়ে যে জলের ধারা বয়— তাই হল শিল্প। শিল্পে ঘাটতির কোনো স্থান নেই।
বিচ্যুতি যেখানেই ঘটে সেখানেই একটি টানের সঞ্চার হয়। এই টানেই একপ্রকার তীব্র বেদনার উদ্রেক হয়। এই টানেই চুম্বকের মতো পুনরায় সস্থানে ফিরে যাওয়ার একটা আকুতি আমাদের আজীবন তাড়িয়ে মারে। আপেলটি গাছে ছিল— মাটিতে পড়ে গেল। গাছে থাকা ও মাটিতে পড়ার মাঝে যে দূরত্ব বা ব্যবধান তার যেমন একটি সীমা আছে— সময়ও জড়িত থাকে সেইভাবে। সুতরাং টান বলতে বেদনার সঙ্গে সময় ও সীমা সেখানে অনিবার্যরূপে উপস্থিত থাকে। ছবি তাই আমাদের ভাবায়।

ছবিতে ভাঙন (Distortion in Painting)

আমি যখন চলি— পথ ভাঙি। পথ ভাঙি বলেই আমি চলি। আমার চলার গতি-প্রকৃতির উপর আমার ভাঙনের স্বরূপ নির্ধারিত হয়। এই প্রকৃতিতে উৎপত্তিতেও যেমন ভাঙন— অবলুপ্তিতেও ভাঙন তেমনি অব্যাহত থাকে। এর সঙ্গে সময় ও সীমা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাড়া ও কমা এই দুয়ের মধ্যে ভাঙন নিয়ত ক্রিয়াশীল। নদীর পাড় ভাঙে, আমার হাত থেকে কাঁচের গ্লাসটি পড়ে গিয়ে ভাঙে। এই দু'য়ের

মধ্যে দৃশ্যত কোনো সাদৃশ্য নেই। যে কোনো ভাঙন কোনো বস্তু-সত্তার অন্তর্নিহিত চরিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। আমার কৈশোরের বাড়-বাড়ন্তের স্বরূপ, যৌবন কিংবা বৃদ্ধ অবস্থার কোনো মিল নেই। তবু আমার মতো করেই আমি ভাঙি। কিছু সরবে ভাঙে আবার নীরবে ভাঙে। সরবে পাড় ভেঙে পড়ার সঙ্গে কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনে তার ভাঙনের দৃশ্যরূপ আমার চোখ বন্ধ করেও বুঝে নিতে পারি। কিন্তু যা নীরবে ভাঙে তাকে সহজে দেখি না। কান্নায় ভেঙে পড়লে দেখি ও শুনিও। মন ভেঙে পড়লে কেউ দেখে না। একে বুঝে নিতে হয়। সরবে ভাঙার আর্তনাদ শুনি। নীরব মর্ম-বেদনায় পরিণত হয়।

ভাঙন সর্বত্র। ভাঙনেই সংহিত শক্তি বিস্ফোরিত হয়। দৃশ্যত যা কিছু দেখা যায় তাই আমরা দেখি না। আমাদের মানসিক ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে দৃশ্যপটটি ভেঙে আর একটি রূপ পরিগ্রহ করে। "আসমান হইল টুডা টুডা জমিন হইল ফাডা" এখানে দৃশ্য জগতের সঙ্গে মানসিক জগতের যে ভাঙন তাই আকাশ ভেঙে চৌচির হল। তেমনি— 'আহ্লাদে আটখান' কথাটিতে ভেঙে আট টুকরো হয়ে যাওয়াকে বোঝায় না— কারুর মনের গভীর অভিব্যক্তির ব্যাপ্তিকে বোঝায়। ছবিতে ভাঙন (distortion) সংগত কারণেই সংহিত মানসিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশের স্বরূপ। জলেতে হাওয়া লেগে ঢেউ ভাঙার মতো ছন্দায়িত হয়। এর সাথে পঙ্গুতার (disability)-র কোনো সম্পর্ক নেই।

পাড়েতে বসে শান্ত পুকুরে ঢিল ছুড়ে ঢেউ তোলার মধ্যে যে ভাঙন— এর সাথে ঝড়ে ভরা নদীতে নৌকায় বসা উত্তাল-ঢেউ-এর ভাঙনের সাথে মানসিক অবস্থার কোনো সাদৃশ্য নেই। ছবিতে তাই ভাঙনের স্বরূপ মানসিক অবস্থার সঙ্গে নির্ধারিত হয়ে চলে। অবান্তর কষ্টকল্পিত ভাঙনে জটিল ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না।

Texture in Painting

Texture is an integral part of an object. It is also the ups and downs of one's inner and outer existence. Even it exists in time, space, sound, smell, taste, touch and sights. Time and space are the textural continuity of pain, suffering and happiness keeping relation with the past, present and future moment of thoughts. Sound is the ups and downs of beating time in space. Smell and taste have sensational movement of time such as feeling of touch and sights generate an energy of our existence. The very existence of this universe is in movement and faces constant obstacle resulting in textural quality. Any sort of texture needs a kind of pressure facing obstacles and creates momentum. In painting while applying a gentle flow of colour, pressure is needed with a feeling of touch,

movement, time, space and tension. Pencil, crayon, charcoal will have no image without touch or pressure on a surface. The bold strokes with heavy impasto in a painting are the result of greater pressure in relation with the emotion and the materials used. It is the counter-force in form of obstacle that creates texture. The very stored energy in a seed longing for its being creates a pressure to break the shell of its own. Shell being the counter-force acts as an obstacle. In this way the whole phenomena of an organic and inorganic substance from the begining of their tender age to an old stage of existence tend to form from finer to coarser textural appearence facing continuous obstacle during the process of their growth.

Any art object being the emotional force emerged from feeling and inner experiences facing charges of time, space and tension get textured in process of its growth. Texture is the natural growth of any real work of art. It is neither superficial nor motivated action thought beforehand. It is the movement of the leaves as the wind blows.

It is the vibration of soul that creates texture.

It is the action that creates counter-action resulting in textural quality.

It is the mental and emotional strain that is followed by texture.

আকাঙ্ক্ষা

Abstraction

Abstraction মাত্রই আমাদের মনে অভিপ্রেত কোনো পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুসারে এই দৃশ্য-জগতের সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষা করে চলে না। ভাবমাত্রই মানসিক এবং আকারহীন। ভাবের যে কোনো অভিপ্রেত আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হতে চায়। ব্যক্ত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাতেই ভাব আকারগ্রস্ত হয়। যা কিছু অদৃশ্যমান তাই আকাঙ্ক্ষার এইরূপ প্রবল শক্তিতেই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এটা নিমজ্জমানতা থেকে ভেসে উদ্ভাসিত হওয়ারই স্বরূপ। বীজের মধ্যে অদৃশ্যমান যে সময় ও সীমার বৈচিত্র্যময় আকার রঙ, ফল, ফুল নিহিত থাকে তাই বাইরের আবরণটিকে ভেদ করে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষাতেই আকারগ্রস্ত হয়। তেমনি মানসিক আকাঙ্ক্ষার আকুতিকে আমরা অস্বীকার করতে

পারি না। আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ abstraction আছে বলেই কল্পলোক বলে একটি জগত আমাদের জীবনকে আরও বৈচিত্র্যময় করে গেলে। অভ্যাসগত আবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষাই হল abstraction.

It is salvation from the bondage of preoccupied thoughts which makes us delighted.

It is from 'formless' to 'formbound'. It is the only desire in terms of energy that generates a power to grow and takes shapes of its own.

Abstraction is nothing but a kind of distortion and intensification of desire.

It is the desire which may be called abstraction in art form. □

□ সংযোজন □

সাধের পুতুল

(গণেশ হালুই বন্ধুবরেষু)

ইমামুর রশীদ

তোমার পত্র পেয়ে ঠিক কাছে চলে আসে জল
আসে সেই নদী ফিরে যা তোমার স্বপ্নের, হারানো
সময় মানে না বাধা, ফিরে পেতে চায় সে পুরনো
কৈশোরের স্মৃতিগুলি হয়ে উঠে ক্রমশ উজ্জ্বল
চিৎকার ধ্বনি ওঠে, 'আয় তুই ফিরে এ ধবল
জ্যোৎস্নার তীরতায়, ফিরে হয়তো পাবি রে তখনো
সেই সব দিনগুলি মধুময় স্মৃতিতে জড়ানো
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, এ সঞ্চয়ই বড়ো সম্বল'

আমরা এ কথা জানি, সময় আর স্রোত সহোদর
অননুবর্তনীয়, একবার চলে গেলে আর
কখনো ফেরে না, তবু শিশুর মতন বারবার
সাধের পুতুলটুকু ধরে রাখি মুঠোর ভিতর

সে মুঠো করিনা আলগা, পাছে খসে পড়ে সে পুতুল
ধরে রাখি শক্ত করে সব কথা, সব স্মৃতি, ভুল। □

অস্তিত্ব, অতিথি তুমি

কালীকৃষ্ণ গুহ

মানুষের মাথার উপরে অনন্ত আকাশ রয়েছে— যা শূন্যতা মাত্র, যা অস্তিত্বহীন অথচ সত্য। ওই শূন্যতায় মাথা রেখে মানুষ বাঁচে, ওই না-থাকা আকাশেই তার মুক্তি। এটা কোনো দার্শনিকতা থেকে বলার মতো কথা নয়, কোনোরকম আলংকারিকভাবে বলার কথা এটা নয়। এ একটা অতি সামান্য কথা— অনিবার্য কথা একটা। 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' একজন চাষী বা মজুরও বলতে পারতেন, যেহেতু এই কথাটা বলার জন্য কোনো বুদ্ধি লাগে না। অসংখ্য মানুষ বহু যুগ ধরে কথাটা বলে এসেছেন নিশ্চয়। আমরা স্পষ্ট করে শুনতে পাইনি। কথাটা আমরা স্পষ্ট করে শুনতে পেলাম তাঁদের একজন প্রতিনিধির মুখ থেকে, যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একেবারে প্রাথমিক স্তরের সত্য বলার জন্য বা বোঝার জন্য প্রায় কোনো বুদ্ধি লাগে না। বেহালা থেকে গড়িয়াহাট যাচ্ছে এমন প্রায় প্রতিটি লোকই বলবে 'গড়িয়াহাট যাচ্ছি' যদিও দু'-একজন 'শেয়ালদা যাচ্ছি'-ও বলতে পারে, যদি তারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে বোঝে যে 'গড়িয়াহাট যাচ্ছি' বলাটা ঠিক হবে না

কোনো কারণে— ঠিক হবে 'শেয়ালদা যাচ্ছি' বলা। এখন, এই না-থাকা অস্তিত্বহীন আকাশটাকে মাথার উপরে নিয়ে মানুষ বাঁচে, শান্তি পায়, মুক্তিবোধ পায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে আকাশটাকে পেয়ে মানুষ বস্তুজগৎ থেকেই পেয়ে গেল বিপুল এক বিমূর্ততা, যা বস্তুহীন, অস্তিত্বহীন, শূন্য, কিন্তু সত্য।

২.

কিন্তু এতেও তার সবটা প্রয়োজন মিটল না। সে মন থেকে আরো একটা বিমূর্ততা তৈরি করল যা আরো বিচিত্র ও গভীর। সে তৈরি করল 'সর্বশক্তিমান' ঈশ্বরকে, যে স্রষ্টা এবং দাতা, সবকিছুর নিয়ন্তা। অবশ্য এই ঈশ্বরের জন্ম খুব বেশি দিন আগে ঘটেনি। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের ভিন্ন-ভিন্ন ঈশ্বরের জন্ম ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে— এবং মাত্র পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে সমস্তরকম গ্রন্থভুক্ত ঈশ্বরের জন্ম ঘটে গেছে। এই গ্রহে বহু লক্ষ বছর কাটানোর পর, বুদ্ধিচর্চার অনেকখানি উন্নতি ঘটার পর, বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পাওয়ার পর, সমস্তরকম প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য মানুষ সৃষ্টি করে নিল ঈশ্বরকে। কীভাবে সৃষ্টি হল মহাবিশ্ব, পৃথিবী, জল, হাওয়া, উদ্ভিদজগৎ, আলো, শব্দ প্রাণ? ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন। উত্তর পাওয়া গেল। কেন জীবনকে বিদীর্ণ করে ও জীবনের অবসান ঘটায় দুঃখ জরা মৃত্যু? ঈশ্বরের ইচ্ছায়। উত্তর পাওয়া গেল। কেন বাঁচার এই অনির্বচনীয় আনন্দ, কেন অনন্তকাল বেঁচে থাকার বাসনা? ঈশ্বরের দান। উত্তর পাওয়া গেল। তবু, মনে হয়, উত্তর পাওয়াটাই শেষ কথা নয়। শেষ কথা, ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে একটি বিমূর্ততার সঙ্গে সংযোগস্থাপন। বিমূর্ততার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দুটি সার্বজনীন উপায় রয়েছে মানুষের হাতে। প্রথমটি আকাশ, দ্বিতীয়টি ঈশ্বর। 'যদি কালপুরুষের দেখা / আর না পাই মধ্যরাতে / তবে পৌষালি পার হয়ে / বলো কীভাবে দাঁড়াবো একা?' আকাশে তাকিয়ে কালপুরুষকে পেতে হবে মধ্যরাতে। উন্মাদ হওয়া চলবে না, সুস্থিরভাবে বাঁচতে হবে। 'হে ঈশ্বর, আমিও তোমার মতো নন্দিত, উদ্ভাসিত একটি দিঘির।'

এইভাবে নিজের অবস্থান বুঝে নিতে হবে। উন্মাদ হয়ে যাওয়া চলবে না। আকাশ এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করে, অর্থাৎ বিমূর্ততার সঙ্গে সংযোগস্থাপন করে, উন্মাদের পথ থেকে প্রতিদিন ফিরে আসতে হবে সুস্থিরতায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ঈশ্বরকে পাওয়ার প্রশ্ন নেই, যেহেতু, বলাই বাহুল্য, ঈশ্বর নেই। ঈশ্বরকে না-পাওয়ার ফলে যে কান্না জমে উঠেছে মানুষের মধ্যে, যুগ-যুগ ধ'রে, তা থেকে মহত্তম সাহিত্যের জন্ম হয়েছে মহত্তম সংগীত ও শিল্পকলার জন্ম হয়েছে। শুধু এই কারণেই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ঈশ্বরের জন্যই মানুষ অংশত উন্মাদ হতে পেরেছে, পেরে, মুক্তির স্বাদ পেয়েছে এবং ঈশ্বরই চেতনাবিদ্ধ মানুষকে সম্পূর্ণভাবে উন্মাদ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। ঈশ্বরকে কালো পঙ্গু ও বধির নাস্তিকের কম্পমান ধন্যবাদ জানাই। সেই মহত্তম বিমূর্ততাকে ধন্যবাদ!

৩.

বাঁচা কী? বা, কীরকম? 'ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি' যিনি বলেন তাঁর ওই ঘুমিয়ে-পড়া নিয়ে যে বাঁচা তা কীরকম? বাঁচতে-বাঁচতে একদিন বাঁচার কৃতজ্ঞতার ঘোষণা করে 'সব জন্ম শুদ্ধ জন্মঋণ' তার কাছে জীবন কেমন? এইসব কথা বুঝে-নেয়ার প্রশ্নে মৃতদের দিক থেকে কুয়াশা নেমে আসে। সবটা বোঝা যায় না। এই বোঝা-না-বোঝা থেকে, এইসব প্রশ্নের আলোড়ন থেকে, বেদনাবোধ থেকে, শিল্পের জন্ম— সাহিত্য সংগীত চিত্রকলার জন্ম। এখন, যদি কোনো সান্ধ্যসভার একটি প্রান্তিক চেয়ার থেকে চাঁদ কিংবা মিহির তাঁদের আলস্য বজায় রেখেই প্রশ্ন করেন 'জানলেন কী করে?' তাহলে ওঠে দাঁড়িয়ে বলতে হবে আমাকে, 'জানা থেকে বলছি না কিছু, না-জানা থেকে বললাম কথাটা।' অথবা যদি সন্দীপন তাঁর আশ্বাসচ্যুত অনুনাসিকতার ঘোষণা করেন 'এসব ঠিক বলছো না হে' তাহলেও বলতে হবে প্রায় একই কথা, 'অনেকরকম ভুল বলার মধ্যে এটি একটি। এই বলারও বিমূর্ততা আছে দাদা।' এইসব আছে। তা সত্ত্বেও আমি ভাবি যাঁরা বলেছিলেন 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর' বা 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল' বা 'মানুষের সন্দেহ ঘৃণায় আমার অস্তিত্ব আজো উবে যায় নি তো?' বা 'মৃত কিশোরীর অশ্রুত সুরে যাত্রা আবার' বা 'রমণীদের রক্তক্ষরণ হচ্ছে আজ মহাউৎসবের দিনে' বা 'প্রবাহিত মনুষ্যত্ব, কে কাকে পাথর ছুঁড়ে মারতে চায়?' বা শেষ পর্যন্ত 'মাথার ভিতরে এক বোধ কাজ করে', কী হয়েছিল তাঁদের, অথবা, কী দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা? জানিনা, তাকিয়ে থাকি, যেভাবে উন্মাদ তাকিয়েছে ঘোরতর উন্মাদের দিকে!

শিল্পের মধ্য দিয়েও— সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে— মানুষ চেয়েছে বিমূর্ততার সঙ্গে সংযোগস্থাপন। এটি তার তৃতীয় উপায়। যাদের সামনে দ্বিতীয় উপায়টি খোলা নেই আর, তাদের কাছে এটি দ্বিতীয় উপায়। সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা ভাস্কর্য মানুষের সত্যিই কোনো কাজে আসে না, যে কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার অসহায়ভাবে বলার চেষ্টা করেছেন। খবরের কাগজের 'আধুনিক' লেখক এসব কথা নিয়ে ব্যঙ্গ করে আত্মতৃপ্তি পেতে চাইলেও কিছু করার নেই! শিল্প-সাহিত্য মানুষের 'কাজে' লাগে না বলেই অধিকাংশ মানুষ শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে কোনোরকম যোগা-যোগ না রেখেই তাঁদের জীবন কাটিয়ে দেন। কিন্তু বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ মানুষের জীবন কাটে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতের আশ্রয়ে, অনিবার্য প্রয়োজনবোধ থেকেই। অনুভূতিদেশ থেকে আলো না পেলে কোনো সার্থক শিল্পই রচিত হতে পারে না, আমি এই আর্ষবাক্যে বিশ্বাস করি। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতো বড়ো বুদ্ধিকেই কাজে লাগানো হোক না কেন তা শেষপর্যন্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি। যে শিল্প রচনা করে অংশত উন্মাদ হতে হয় তাকে। বুদ্ধির একটি স্তর ধসে না গেলে কেউ উন্মাদ হয় না, এবং বুদ্ধির একটি স্তরকে ধসিয়ে দিতে না পারলে অনুভূতিদেশ থেকে আলো পাওয়া সম্ভব নয়। নিরন্তর যত শিল্প-সাহিত্য রচিত হয়ে চলেছে এই যুগে

অজস্র শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের হাতে তার প্রায় সবটাই যে আবর্জনা তার কারণ এই যে ওইসব রচয়িতারা উন্মাদ হতে পারেন না, অনুভূতিদেশ থেকে আলো পান না এবং এইজন্য, যে, তাঁদের রচনা বিমূর্ততা অর্জন করতে পারে না, অর্থাৎ, তা এমন একটি ভাঙন খুঁজে পায় না যা অসীম একটি বিস্তার গড়ে দেবে। কী ঘটেছিল, তা সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে বলে দেয় যে লেখা, তা মূল্যবান রচনা হতে পারে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তা সাহিত্য হয়ে ওঠে তখনই যখন সার্থকভাবে বলা থাকে কী মনে হয়েছিল লেখকের বা সেইসব লোকদের, যারা ঘটনাবলির সঙ্গে জড়িত ছিল। ইতিহাস-পাঠ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ইতিহাস ব্যক্তির অন্তর্লোকের অবস্থান বিষয়ে উদাসীন বলেই তা সাহিত্য নয়। আবার ইতিহাস-পাঠ সাহিত্যপাঠের তুল্যমূল্য এইজন্য, যে, তা সময়ের বা গতির অনুচিন্তা জাগায়, জাতিচরিত্রের অনুচিন্তা জাগায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবর্ষের প্রাসঙ্গিকতায় বলি, তার রচনাবলির যে-কোনো একটি পৃষ্ঠা পড়লেই আমার মনে হয় এক পৃষ্ঠা সাহিত্য পড়া হল— যেহেতু প্রায় প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাতেই থাকে এই লেখকের অনুভূতির গোপন আলোড়ন। ইনিই বোধহয় একমাত্র লেখক যাঁর গল্প বা উপন্যাসের শুরু বা শেষ না পড়লেও আমার বেশ চলে যায়। শুধু সাহিত্য নয়, সমস্তরকম শিল্পই ব্যক্তির অন্তর্লোককে প্রকাশ করে—যা বিমূর্ত, অর্থাৎ অনিশ্চিত, দ্বন্দ্বময়, গতিতাড়িত, রূপমুগ্ধ, ধ্বনিসচেতন, অভুক্ত, বিমূঢ়, বেদনাহত। এই সূত্রে, সমস্তরকম শিল্পবস্তুই বিমূর্ততার প্রকাশ ঘটায়। যে শিল্প-বস্তুতে বিমূর্ততা প্রকাশ পায়নি তা শিল্প নয়, এই হল আমার বিনীত বক্তব্য। কৃষ্ণনগরের পুতুল শিল্প নয় যেহেতু তা বাস্তবের অনুকৃতি মাত্র একধরনের বুদ্ধি-নির্ভর কারিগরি কুশলতায় নির্মিত। বাঁকুড়ার ঘোড়া শিল্পকর্ম, যেহেতু তার রূপের মধ্যে ঘোড়ার শক্তি গতি এবং রূপের ধারণা সঞ্চারিত হতে পেরেছে—তাতে রয়েছে অতিগঠন ও ভাঙন, যা তাকে দিয়েছে একধরনের বিমূর্ততা।

৪.

আকাশ ঈশ্বর শিল্প, বিমূর্ততার এই তিনটি উৎসের সঙ্গে প্রতিটি মানুষই জড়িত। আকাশ নেই, ঈশ্বর নেই, শিল্প ও জীবনের নির্মিত বা কাল্পনিক অবস্থান নিয়ে— না-থাকা অবস্থান নিয়ে— গড়ে-ওঠা জিনিস। যে শিল্প যা আছে তার বর্ণনা মাত্র, তা শিল্প হিসেবে সার্থক হতে পারে না। প্রকৃতিতে যা আছে তার প্রতি-ফলনের পাশাপাশি শিল্পীকে জুড়ে দিতে হয় তাঁর আবেগ যা বিমূর্ততা তৈরি করে, শিল্পকে সার্থক করে। এই আবেগ অভিজ্ঞতা এবং প্রাকৃতিক রূপের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে, তাকে অপ্রাকৃত করে, রহস্যময় করে, ব্যাখ্যার অতীতে নিয়ে যায়। বিরহবোধ, যা সংগীত এবং সাহিত্যের প্রধান ও স্থায়ী ভিত্তি তাতো আকাশের মতোই প্রাকৃতিকভাবে অস্তিত্বহীন সত্য জিনিস! ভাবতে অবাক লাগে যে মানুষ বস্তুপৃথিবীর বাইরে— আকাশে ঈশ্বরে শিল্পে—অর্থাৎ একটা শূন্যতায় মাথা ডুবিয়ে বাঁচতে চায়। তার বাঁচা শেষপর্যন্ত বিমূর্ত, রহস্যময়, বিরহকাতর, ব্যাখ্যাতীত। অস্তিত্ব, অতিথি তুমি! ☐

[নিবন্ধটির নামকরণের জন্য সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লেখকের ঋণ রইল]

মল্লিনাথের সঙ্গে তর্কাতর্কি

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

সময়ের কবুলনামা একের পর এক পোশাক খুলে ফেলায় এখন উদোম, প্রেমপ্রমাদের ধর্ষণ আছে সুদ বাবদ, আর যত লাভালাভ সমস্তই ধ্বংসবীজ— মৃতের মতো মুক্ত এখন…

১.১.৯৫। স্থান : কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস। সময় : দুপুর। লোকজন কম, আড্ডাস্থলটি তাই কোলাহলমুক্ত। উল্টে একটা ঘুমঘুমভাব, টেবিল-চেয়ারের বস্তুময়তা, নিজস্বগন্ধ, আয়তন ও আকার-সহ এমন এক ক্ষুদ্র অথচ সম্পূর্ণ বিশ্ব রচনা করে রেখেছিল যে তার আবহে ডুবে মনে হচ্ছিল এর বাইরে কিছু নেই। সেইসময় হাতে ধরা পেঙ্গুইন বুক অফ ফ্রেঞ্চ ভার্স ফোর-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটি পংক্তি পড়ে ফেলি। শুরুর অনুচ্ছেদটি ঠিক সেই পংক্তিটি নয়। বিন্দুর পর বিন্দুতে গড়ে তোলা অক্ষর, অক্ষরে অক্ষরে শব্দ, শব্দমালায় যে প্রকাশ ছিল, পড়তে পড়তেই তারা দুর্বোধ্য হচ্ছিল, বিন্দুতে ফিরে যাচ্ছিল। এইরকম চলতে থাকলেও কিছু শব্দ মাথায় গেঁথে গেল, উত্তেজিত লাগছিল, ওই শব্দরা এখানকার পরিবেশ ও আমার

ফাঁকা মাথাটি (মড়ার খুলি) নিয়ে এমন গেণ্ডুয়া খেল শুরু করল যা বলবার নয়। পেণ্গুইন পুস্তকটি ইংরেজিতে রচিত, সেখানকার ওই পংক্তিটিতে 'কনফেসন' শব্দটি ছিল, আমাদের সংস্কৃতিতে কনফেসন নেই। কনফেসন কনফেসন— বিড়বিড় করতে-করতে নিরর্থক ও বেড়ে আনন্দে বেঁচে থাকা এই আমির এক প্রতিবিম্ব দেখে ফেলি মানস আয়নায়। জেট গতিতে নিষ্পন্ন হয় মধ্য চল্লিশের এক জীবন পরিক্রমা। একেক-সময় একেক আদর্শ ও তদনুযায়ী মূর্তি ছিল অনুসরণযোগ্য : চে-কাকা-মাণিক-ঋত্বিক-শেফালি-মহুয়া··· । আদর্শ ও প্রেম সেইরকম রূপকথা যা আমার শৈশবই প্রলম্বিত করেছিল শুধু। বীর নই, প্রেমিক নই, অতিভীতু, মৃত্যুডরানো এক গর্তের জীব, যার ভবিতব্য মৃত্যু, শুধু মৃত্যু— বোধে এ-জিনিস সঞ্চারিত হতে এতদিন লেগে গেল !

৪.১.৯৫। সময় সন্ধ্যা। স্থান ঐ। সবকটি টেবিল উপছে পড়ছে, সমস্ত মুখ কথার জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। এই কথা স্রোতে স্বপ্ন, বিষণ্ণতা, দুঃখ, নৈর্ব্যক্তিক সংবাদ, আশানিরাশা, প্রকল্প, ইতিহাস, ব্যক্তিগত অনুভব কী নেই। বহুর এই কণ্ঠস্বরকে মোটেই কোলাহল মনে হচ্ছিল না। দু জন কৃষ্ণাঙ্গ ও একজন শ্বেতাঙ্গিনীও সমাবেশে থাকায় মনে হচ্ছিল বিশ্ব কথা বলছে। বহুর কণ্ঠস্বরকে কিছুক্ষণ পরেই একটি গীতের সহায়ক বাদ্য মনে হল আর গীতের কলিটি উঠে আসছিল আমার পাশের এক প্রেমিকযুগলের কণ্ঠ থেকে।

মেয়েটি : আতুতুতু করার কিছু নেই।

ছেলেটি : কতদিন অপেক্ষা করব বলো ? এবারও ফার্স্ট লিস্টে আমার নাম নেই।

মেয়েটি : ভাল করে পড়োনি, পরীক্ষা দাওনি কী করে হবে।

ছেলেটি : তাহলে সব ভুলে এই করে যাই।

মেয়েটি : হ্যাঁ দয়া করে তাই করো। এইসব প্রেমট্রেম ফিলিং টিলিং বাদ দাও এখন, এড়িয়ে চল।

ছেলেটি : কী বলছ !

মেয়েটি : ঠিকই বলছি, অনুভূতি এখন আমাদের কাছে বিলাসিতা, এই জিনিসটি কেনার মতো যথেষ্ট টাকা পকেটে নেই।

অনুভূতি পণ্য। পণ্যটির ক্রয়ক্ষমতা প্রেমিকপ্রেমিকার নেই, অন্তত এখন। তাই এড়ানোর প্রশ্ন, অর্থাৎ নিজেদের তারা বিচ্ছিন্ন করে নেবে অনুভূতি থেকে। মস্তিষ্ক-প্রসূত এক বাস্তবানুগ ব্যবস্থা— এই সিদ্ধান্ত। এবং এমনটা করতে পারা আদৌ অসম্ভব কিছু নয়।

প্রেম নয়, অনুভূতি নয়, এই তরুণতরুণী মৃত্যু নির্মাণে মগ্ন ; একথা কেউ ভাবতেই পারেন। আবার এঁদের ব্যক্তিজীবনের উপর বাধ্যতামূলক সমাজ প্রভুত্বকে নতুন প্রজন্ম নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী মোকাবিলা করছেন এমনও হতে পারে। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনে কিছুটা পরিমাণে স্বাধীনতা পেতে হলে এই ছাড়পত্রটি ছিনিয়ে আনা ছাড়া হয়তো তাঁদের কোনও উপায় নেই।

কোনো এক গ্রিক নাট্যকারের উক্তি এইরকম দৃশ্য ও সংলাপের পাশে মন্তব্যের আকারে লিখে রাখা যেতে পারে : কে জানে হয়তো জীবন মৃত্যু আর মৃত্যুই জীবন।

কফি হাউসে দেখা শোনা প্রেমিকপ্রেমিকারা স্বল্পকালে বা সেই মুহূর্তে ভাষায় নিজেদের প্রেম / আশ্লেষ / সংশ্লেষ যেভাবে প্রকাশ করেছিল তাতে আপাতভাবে মনে হবে : পরস্পরের প্রতি অনুরাগ / অনুভব তাদের কাছে প্রধান নয়।

বরং সেই অনুভূতি যেন পুরাণের আপেল। যা রয়েছে কিছু দূরে, অন্য কোথাও। সেই প্রেমফল বা ফুলটি দেখে তারা যা অনুভব করছে সেইটি প্রকাশ করল শুধু। এ যেন অনুভবের অনুভব এবং চিন্তা। কিছু যুক্তি, নিরাপত্তাবোধ ও সতর্কতা মিশে আছে এতে। জীবন প্রলম্বিত। ভবিষ্যত জীবন বর্তমানের খোপের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। অন্ধ নয় তারা, মোহান্ধ তো নয়ই। ফলে জিনিসটা জটিল, সূক্ষ্ম এবং বেদনার হল। শ্যাম বাঁশি নয় আর। কেউ ভাবতেই পারেন এতে প্রেমজীবনের মৃত্যু হল। আবার কেউ এই দৃশ্য ও সংলাপে আবিষ্কার করে ফেলতে পারেন ভিন্ন এবং সম্ভাবনা : যখন অন্য কোনও প্রেমিকপ্রেমিকা দায়মুক্ত হওয়ার কথা ভাববে। সম্পর্কের সৌধ নির্মাণ তথা তাকে জীবনের সমান সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় করার কথা কল্পনাতেও স্থান দেবে না। এবং সেইদিন ব্যক্তির অমর প্রেমকাহিনীর লৌহবাসর ভেঙে তারা নির্ভার, মুক্ত ও প্রেমের যোগ্য হয়ে উঠবে।

[বাংলা ভাষার রচিত বহু গল্প ও উপন্যাসে প্রেম বীজ বস্তু। রাধাকৃষ্ণের গল্প তো জানেন সর্বজন। লেখাটির এইখানে পৌঁছে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেইসব লেখকের কথা এবং একটি ক্যাপশন :]

অনুভূতির ফেরিওয়ালা

যে কোনও লেখার খসড়া আর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটা তফাত থাকবেই আর তা হল কন্টিনিউইটি সংক্রান্ত। সময়, চিন্তা এসব সগোত্রধর্মা, ছেদ, খাত বদল থাকবেই। প্রেমকে ঘিরে প্রতিদ্বন্দ্বী জগৎচিত্রের ইশারায় রাস্তা হারালাম, সংশয় তথা অসম্পূর্ণ জ্ঞান হল। আবার জানা একটি ক্রিয়াপদ বলে সে পুনরাবৃত্তিমূলক এবং অসম্পূর্ণই… আমরা বরং ফেরিওয়ালাটিকে লক্ষ করি, কারণ জগৎ বদলে এখন দোকানদার ও ফেরিওয়ালাই সাধক। শিল্পায়ন, উদারনীতির দৌলতে বিশ্ব আজ আর রঙ্গমঞ্চ নয়, এক বৃহৎ বাজার বিশেষ।

ফেরিওয়ালাটির পরিচয় জানা বেশ জরুরি, রক্তমাংসের মানুষ ও তার পার্থিব প্রেমকে ইনি বিমূর্ত করেছেন, গল্প করে তুলেছেন। সুতরাং দেহিপদপল্লব…

প্রেমের গল্প, প্রেমের অনুভূতি (তার বর্ণনা) সাহিত্যিক বিক্রির জন্য বাজারে ছেড়েছেন অনেক আগে— সাহিত্যে এ জিনিসটা পণ্য হওয়ার এতদিন পরে বাঙালি প্রেমিকযুগল অনুভূতির ক্রেতা হল। পণ্য খদ্দের খুঁজে পেল। খদ্দেরের জন্ম দিল। মৌখিক সাহিত্যে / কীর্তনে / বাউল গানে / কথকতায়ও প্রেম ছিল কিন্তু তখনও পণ্যচরিত্র অর্জন করেনি।

SUNEEL '94

SUMEEL '94

আমাদের শৈশবে / কৈশোরে সাহিত্য অনুযায়ী জীবনের এক নামগান চালু ছিল। সেইটি শুনতে-শুনতে আমরা স্কুল পালিয়ে হান্টারবালি ছবির নায়িকার বিপুল বিশাল বুকের ঢেউ, কুয়োর মতো নাভি দেখেছি, সিগারেট ফুঁকেছি, এস এফ আইয়ে নাম লিখিয়েছি, ভূতপ্রেতভগবানকে অমান্য করেছি কিন্তু অমর প্রেমকথা চোরা স্রোতের মতো বয়ে বেড়াতাম। বালবাচ্চা-বৌ নিয়ে নাটাঝামটা খাওয়া মানুষকেও দেখেছি নর-নারীর এক পতি-পত্নী সম্বন্ধীয় প্রেমের নামে মূর্ছা যেতে।...

ছেদ।

এক সপ্তাহ এক লাইনও লেখা হয়নি। ভাল লাগেনি লিখতে, জরুরি বলেও মনে হয়নি। কিছুটা বিরক্তও লাগছিল। উৎপল-মিহিরের নির্দেশ পালন করতে হবে কিন্তু নির্দেশটি ছিল এইরকম : সাহিত্যে বিমূর্তায়ন কী ভাবে ঘটে— লিখতে হবে। এর জবাবী আদর্শ লেখা এরকম হতে পারত বলে মনে হচ্ছে :

(এক) ভাষা চিহ্ন ঠিকই কিন্তু সাইন সিম্বল হয়ে ওঠে— রুমাল লিখলাম— কিন্তু সেইটি তাতে নরম একটুকরো কাপড় হয়ে গেল এমন নয়, আগুনের রুমাল নেড়েও তো কতজন চলে যায় কিংবা সেই বিড়ালের কথা ভাবুন যে ছিল আসলে একটি রুমাল। শব্দ যখন যেমন সঙ্গী পাচ্ছে তখন সেই রূপ নিচ্ছে, শব্দ বা স্থান বদলালে সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাবে তাৎপর্য।

(দুই) বাস্তববাদী বা পরাবাস্তববাদী সমস্ত লেখাতেই এই বিমূর্তায়ন ঘটে থাকে। বিমূর্ত শিল্পসাহিত্যের একচেটে নয় এ জিনিস।

(তিন) এর বাইরে কিস্‌সু বলার-লেখার নেই— মানস আয়নার খেলা এটা। ম্যাজিক।

(চার) ফর্ম-কনটেন্ট / সমাজ বাস্তবতা এসব নিয়ে বরং পাতার পর পাতা লেখা যায়। শিক্ষিত পাঠকরা এরকম বহু লেখা পড়েছেনও দেশি বিদেশি ভাষায়।

(পাঁচ) ঐসব লেখকরা যথেষ্ট পণ্ডিত। বিমূর্তায়নের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে লেখা সম্ভব হলে তাঁরা নিশ্চয়ই লেখা উৎপাদনের এই ভয়ঙ্কর চাপের দিনে অমন একটা জমি ফাঁকা ফেলে রাখতেন না।

(ছয়) আমি সেই মশা এবং বলছি : কত জল ?

১৩.১.৯৫

গতরাত্রে পার্ক স্ট্রিটের অলিম্পিয়া বারে সাহিত্যরসিক বন্ধু মল্লিনাথের সঙ্গে উপন্যাস সম্পর্কে (আমরা অবশ্য বরাবর 'নভেল' শব্দটিই উচ্চারণ করেছি) বিস্তর কথা, তর্ক, আলোচনা হল। আমরা একটা কোণ বেছে নিয়েছিলাম, পান করছিলাম খুব ধীরে ; আলোচনা-তর্কের স্বার্থে। অলিম্পিয়া দরে-দস্তুরে এখনো মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে। যদিও পাশের টেবিল থেকে কেবলই শেয়ার-ইউ টি আই ইনভেস্টমেন্ট প্রভৃতি শব্দ ভেসে আসছিল।

গতকালের কথাবার্তা যতটা মনে আছে লিখে ফেলা যাক :

[ঠিক যে ভাষায়, যেভাবে কথা হয়েছিল হুবহু তা মনে করতে পারব না। পাঠক এর সঙ্গে পরিবেশ মিশিয়ে নেবেন। মাঝেমধ্যেই আমরা নভেল আলোচনা থেকে সরে গিয়ে অন্যান্য বিষয়েও কথা বলেছি, যথা খাদ্য, পানীয়, পোশাক, পেশা, রাজনীতি, এমনকি মৃত্যু। কিন্তু এখানে আমি সেসব বাদ দিয়ে যাব। যেমন ছিপছিপে শরীর, ডিম মুখের লম্বাটে একটি মেয়েকে নিয়েও আমরা কথা বলেছি, এই প্রসঙ্গে খুব খুশি হয়ে, শিশুর মতো হাততালি দিয়ে উঠেছিলাম প্রায়, দুজনে একসঙ্গে প্রশস্তি করেছি তার 'কী নির্মেদ শরীর— হাল্কা ঢেউ তাই না'…]

ম ॥ বাংলা ভাষায় দেখেছি নভেল বলতে বেশ মোটাসোটা বইকেই বোঝায় এই মেয়েটির মতো নয়

রা ॥ কবিতা ছিপছিপে— দিবারাত্রির কাব্য

ম ॥ ব্যতিক্রম। এক অন্য ধরনের নির্মাণ

রা ॥ নির্মাণ মানে কী রে, নভেল নিয়ে কথা উঠলেই দেখেছি স্থাপত্য-নির্মাণ এইসব কথা বলা হয়।

ম ॥ নির্মাণ আর সৃষ্টি এতে গুলিয়ে যাচ্ছে, সমার্থক হয়ে যাচ্ছে— বাড়ি বানানো, ব্রিজ বানানোও তো নির্মাণ। আসলে সৃষ্টি জিনিসটার মধ্যে একটা গঠনশৈলী, কাঠামো হয়তো থাকে, সন্তুর বাদক শিবকুমার বা অন্য যে কেউ একটি রাগকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন যে ভাবে— মজা হল সৃষ্টির মধ্যে এই গঠন নির্মাণ থাকে কিন্তু সেটাই সৃষ্টি নয়— তার অতিরিক্ত কিছু, একটা উদ্বৃত্ত থাকে। তুই দিবারাত্রির কাব্যের কথা বলছিলি, ধ্যাত, কারুবাসনা পড়, আরুপরতন আমাকে বলেছিলেন 'দেখুন ওই নামটাই বইটির ফার্স্ট সেন্টেন্স— কারুকামনা নয়, কামনা ভোগে শেষ আবার তার জন্ম হতে পারে কিন্তু বাসনা এক অনন্ত তৃষ্ণা'। দস্তয়েভস্কি থেকে বর্হেজ…একটা কন্টিনিউইটি। কারুবাসনা হে

রা ॥ অ্যাতো নেম ড্রপ করিস…

ম ॥ বেশ জীবনানন্দেই থাকি, দেশজ হবে, নেমড্রপের প্রশ্নও উঠবে না।

রা ॥ না, মানে আমি তোর যুক্তিটা বুঝতে চাইছি। আসলে অনেক বই পড়ে ফেলা আর চেতনার সমৃদ্ধি এক কথা নয়। বই পড়ার অসভ্যতাও কম দেখিনি। মুগুর ভাঁজা পেশী দেখানোর পর্যায়েও তো নিয়ে যায় অনেকে। প্রতিপক্ষকে চুপ করাতে, ভয় দেখাতে বিশ-পঁচিশটা বইয়ের নাম করল ধর— এরকম তো করে লোকে ; না কি ?

ম ॥ হ্যাঁ, তা করে। আমরা বই-বই কথাও বলে ফেলি, আবার সেটা পাত পেয়ে যায় বলে সাফল্যের যে সর্বনাশ তাতে মেতে আরো বেশি করে বই হয়ে উঠি দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন সমেত।

রা ॥ আবার উল্টোটাও আছে। জীবনপাত করে লেখা কেতাবটি কী বলতে চায় ধৈর্যের সঙ্গে মাথার পরিশ্রম করে সেটা বোঝার চেষ্টা করলাম না ভাল করে—

আইটালিক্সের আই-এর তাড়নায়— প্রায় রিপন তাড়নার মতো নিজের মনগড়া একখানা জম্পেশ ব্যাখ্যা-মন্তব্য হাজির করতে অতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

ম ॥ বড্ড ডাইগ্রেশন হচ্ছে।

রা ॥ নভেলে সেটা শুধু পারমিটেড নয়, এ একটা শৈলী— যা উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টির সহায়ক।

ম ॥ তুই যাকে উদ্‌বৃত্ত বলছিস সেটা আসলে কী

রা ॥ সাহিত্যে, গদ্যে পদ্যে অক্ষরমালায় রচিত বাক্য, পংক্তি, অনুচ্ছেদে যা আমরা বাহ্যত পাই সেটা জগৎচিত্র। জানার পাল্লা যে এতে ভারী হচ্ছে তা কিন্তু নয়। যদিও সাহিত্যে এই জগৎচিত্র বহুস্তরের— পাঠকের যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে এসবের ভাগ পায়। কেউ কেউ সব ক'টা পর্দা ছুঁতে পারে না। কেউ-বা অনেকটাই পারে।

ম ॥ পুরনো কথা। এটুকু সবাই জানে। এক স্প্যানিশ লেখকের কথা মনে পড়ছে, তাঁর কথাটা ছিল প্রায় এরকম: সাহিত্যের অভ্যাস হল পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করা, তার বিশদ বিবরণ পেশ, লেখায় কিছু শীর্ষবিন্দু সৃষ্টি করা এবং সেগুলো ভাল করে দেগে দেওয়া

রা ॥ কার কথা বলছিস জানি না তবে ঐ লেখকটি যদি সাহিত্যের অভ্যাসের বাইরে যেতে চান

ম ॥ হ্যাঁ আর বাইরে মানে এমনকি দেশকালেরও বাইরে, কাল্পনিক জগৎ সেটা, ইউটোপিয়া মানে নেইদেশ কিন্তু মিথ্যে নয়, একে বলা যেতে পারে প্রতীকী বিশ্ব।

রা ॥ একটা স্ট্রেঞ্জনেস দেখতে পাচ্ছি

ম ॥ হ্যাঁ, আর উদ্‌বৃত্তের, সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের অনন্ত উৎস সেটাই।

রা ॥ একে কী করে ব্যাখ্যা করা যায়

ম ॥ টেক্সটে এ জিনিসটা মায়ার মতো, ধর, সে নিজে সশরীরে হাজির নয় কিন্তু তার অস্পষ্ট ছায়া আছে। যেমন সিম্ফনির একটা জাঁকজমকের অংশ শুনতে শুনতে ঝুপ করে স্তব্ধতা নেমে এল কিন্তু তখনো চূড়ান্ত ক্ষীণ শব্দে ফ্লুট বাজছে হয়তো, আবার বাজছেও না, তবু এমন একটা রেশ সৃষ্টি হচ্ছে যে মনে হচ্ছে আছে তো। অন্যরকম ভাবে বললে আমরা যখন সাহিত্য পড়ি তখন কোনও বিশেষ একটা জায়গায় এসে বই থেকে চোখ তুলে নিই অর্থাৎ অক্ষর তখন মুছে যায়। কামুবাসনার একটি লাইন এরকম: 'চিঠিগুলো উইয়ের পেটের ভিতর গিয়ে তাদের শরীরের মাংস ও রস জোগাচ্ছে, নীড় বাঁধতে সহায়তা করছে তাদের, তাদের ডিম ও সন্তানসন্ততির কাজে লাগছে' —এই বাক্যটিতে জীবনানন্দ সেই মুছে ফেলার কাজটা সারলেন যত্নে, নৈপুণ্যে। এটি কালান্তক, যম। বিনাশ সৌন্দর্য। এর আগে সাদা পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সমস্ত অক্ষর উইয়ের পেটে গেল, তারা নিশ্চিহ্ন হল।

ধ্বংস কিন্তু সৃষ্টি··· আগুন···

রা ॥ বলছি, কারুবাসনায় এরকম বাক্যও আছে, দাঁড়া মনে করি··· হ্যাঁ—
'নানারকম কষ্টার্জিত বইয়ের, প্রিয় জিনিসের ছিবড়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে, তারপর আগুন জ্বালি ও চিন্তা করি'—
হাজার মানুষের পড়া, ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন প্রকার মতের সিলমোহরে আমাদের প্রিয় বইগুলি হারিয়ে গিয়েছে। পড়তে গেলেই সেইসব এঁটো চিন্তা মাথায় ভর করে, কিছুতেই ঠেলে সরানো যায় না। রবিঠাকুরের আঁকা ছবি দেখতে, বা করিম খাঁর গান শুনতে গেলেও এই হাল হচ্ছে।

ম ॥ তোদের মুশকিল কী জানিস বাজার চলতি যা পেলি গোগ্রাসে গিলে ফেলিস। মেজাজটা খিঁচড়ে দিলি। নামধাম না করে দেরিদা টেনে আনছিস। আমি অন্য কথা বলছিলাম— সাহিত্যের অন্তর্জগৎ নিয়ে কথা হচ্ছে। এ দিকটায় কখনোই তেমন আলো ফেলা হয়নি। এই যে আগুন প্রসঙ্গ তা আসলে আলোকিত করছে অন্যকিছু। মনন মন্থনের ব্যাপার এটা— তার প্রসার ও গভীরতা সাহিত্যে রূপায়িত— চিন্তা এখানে অনুভবও— এইরকম সাহিত্য ও তার সোর্সের একটা আভাস পাচ্ছি আমরা।

রা ॥ দাঁড়া আমার ঝোলায় কারুবাসনা আছে, একটা অনুচ্ছেদ শোন, তারপর গাল দিস—

'.....কয়েকটা কাজ করতে তোমাকে নিষেধ করছি আমি, তুমি করতে যেও না। চাকরি-বাকরি না পেয়ে অলস হয়ে থাকতে হচ্ছে বলে মিছিমিছি নিজেকে নির্যাতিত করতে যেও না, তোমার চেয়ে কম শক্তি নিয়ে অজস্র লোক সংসারের কাছ থেকে ঢের বেশি পুরস্কার পাচ্ছে বলে। কলকাতায় অহরহই এই জিনিশ দেখবে তুমি, দুঃখ পেতে যেও না, কারু প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, ট্রাম-বাস-লরি-মোটর ব্যস্ত-সমস্ত নিরবচ্ছিন্ন ভিড়ের সমাবেশ নিয়ে কলকাতা শহরের কাজের চাকা দিনরাত ঘুরে চলেছে বলে নিজের মনের স্থৈর্য নষ্ট করে বসো না···ফ্যাকরা হচ্ছে এই যে চারদিকের ঘাতপ্রতিঘাতের সম্পর্কে তারা মুহূর্তে-মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে ঠিকরে বেরোয়; নিজের প্রকৃত পথ ভুলে যায়, আগুনের মুখে দেওয়ালি পোকার মত জীবনের যথার্থ সম্ভাবনাগুলোকে বারংবার অন্ধভাবে নষ্ট করে ফেলে'—
হেমের বাবা বলছেন।

ম ॥ মজার ব্যাপার আগুন কিন্তু এখানেও আছে। আছে পোকাও। আর সম্ভাবনা। বাংলা থেকে বহুদূরের প্রাগে বসে একজন কাফকা যা মন্ত্র জপেছেন— শিল্প

এই সম্ভাবনা, তার জন্ম…

রা ॥ বেশি কাব্যি হয়ে যাচ্ছে বস্…

ম ॥ হ্যাঁ থামতে জানা চাই, ভাষায় এই দাঁড়ি চিহ্নটির, ফুলস্টপের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস খুব কম আছে…

[অলিম্পিয়ায় এরপরও আমরা অনেকক্ষণ ছিলাম— তবে পরের কথা হয় খুব এলোমেলো, আমাদের মনঃসংযোগের ক্ষমতাও দ্রুত কমে আসছিল, আর সেসব ভাল মনেও নেই।]

লেখাই জন্ম

মল্লিনাথের সঙ্গে তক্কে জীবনে কখনো জিতিনি। অবশ্য হারজিৎ গৌণ, ওকে শুধু উস্কে দিতে হয়, জ্বলে তেল, কিন্তু সলতেও চাই। অফিসকরা হাবিজাবি কাজে চাপা পড়া অবস্থায়ও সেদিনের আলোচনা মাথার মধ্যে ভুরভুর কাটছিল আর ঘুরে-ফিরেই মনে হচ্ছিল : লেখার গোটা প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়েই আমরা জন্মাই— আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করি।

তীক্ষ্ণ এক উদ্বেগ ভাষা অধিকারীর— এই উদ্বেগের করুণা গভীর, বিশদ ও ব্যাপক-ভাবে বর্ষিত হলে না লিখে উপায় থাকে না— লেখা এক সন্ধান তখন, মুক্তিসন্ধানও বলতে পারি একে, সেই অসম্ভবের রূপ নির্মাণ, মানে ভাল ভাল কথা ও অনুভূতিমালা নয়— জাঁ জেনের নরকও তাতে উদ্ভাসিত হতে পারে— আর তাতেই সংঘটিত হয়, রূপ পরিগ্রহ করে স্ট্রেঞ্জনেস—যার বাংলা উদ্ভটত্ব নয় আবার অলৌকিক বললেও গোলমালের আশঙ্কা থাকে— বরং এ-দুয়ের অন্তর্বর্তী কিছু।

আদি সাহিত্য কাব্য / স্তোত্র। সত্যকথনের সম্ভাবনা, বা ঐসব শ্লোককে সত্যের লিপিরূপে ভাবতেই অভ্যস্ত আমরা— এর মূলে আছে সম্ভবত সেসবের অতর্কিত, সহসা আবির্ভূত হওয়ার ক্ষমতা, তার বিদ্যুৎ ঝলক। গল্প আছে :

দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ পেরোনোর সময় নিতান্ত বালক বয়সে আকাশ চেরা বিদ্যুৎ ঝলক দেখেই রামকৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বর চেতনার জন্ম হয়। এখানে ঈশ্বরকে 'সত্য' ধরতে হবে—

গল্প আরো আছে : মিউজ/সরস্বতীর ; সাহিত্যের জননী নাকি এরা। প্রেরণাও ভাবা হয়েছে একে। আর এখন আমরা ভাবি নিশ্চেতনার কথা। নিশ্চেতনার হাত ধরে ভাষার প্রতিটি দানাকে লক্ষ করলে দেখব শব্দ মন্ত্রে ছিল, তারও আগে শব্দমন্ত্র, জাদু শব্দ তখন। সেই জাদুশক্তির পুনরুদ্ধারে মেতে আছি একদল পাগল। জাদুপ্রতীক শব্দ একটি মুহূর্ত, ঘটনা, পরিস্থিতির চিত্রাঙ্কনেই নিঃশেষ হয়ে যায় না, সে বস্তু, প্রকৃতি অনুভব ও চিন্তাকে জীবনদান করে— আলো আসুক বলা মাত্র চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, প্রতিটি রোমকূপ ধন্য হবে ওই স্পর্শে।

রেখা সান্যাল কাঁদছেন

এখন সমাজ দূরে, বিভিন্ন কর্মব্যস্ততা যানগতি মাত্র, যা কখনো যানজটও বটে। সফল-অসফল কলকাতার মানব-মানবীরা নিজেদের নয়, অন্য কারো, অন্য কিছুর মস্তিষ্ক-নির্দেশে আত্মপ্রচার, আত্মশ্লাঘা বা নিদারুণ অপমানে বিকৃত, কুঁকড়ে যাচ্ছে দেখি, তাদের দেহ-মন-মনন তালগোল। তবু ভাষা আছে, শেষ হয়নি সে, মরে যায়নি, বারবার বেঁচে ওঠার, নবযৌবনের প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তার কম্পন সেই জরুরি বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে শ্বাসাঘাতে। ঐ তালগোল থেকে উঠে আসছে গোঙানি ও আর্তস্বর, শোনা যাচ্ছে চিৎকারও। শব্দরা পরস্পরের উপর হুমড়ি খেয়ে, এ ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, একে অপরকে লোপাট করে কুরুক্ষেত্র করছে, সিম্ফনির ঝঙ্কার তা, ক্ল্যাইম্যাক্স, এক মুহূর্ত পরে ফ্লুট বেজে উঠবে। কিন্তু কোথায় সেই বাঁশি শব্দ, কোথায়ই-বা ক্ল্যাইম্যাক্স। এ তো শুধুই কোলাহল। তারা এর নাম দিয়েছে জীবনমুখী গান/জীবনমুখী সাহিত্য।

রচনাকর্তা, পদকর্তা হওয়ার যে মহাজনী স্বপ্ন, উচ্চাশা বাংলার জলের দেশে, সবুজের দেশে শ্লোমুভিচিত্রে, কীর্তনসুরে ভক্তি গদগদ ছিল, সেই দেশ ভাঙনে শেষ। তা সুন্দরবনের ঘোড়ামারা দ্বীপ, জল সহস্র ফণা, তাড়া করছে আর গ্রাম ভেঙে পড়ছে। জলেরও যে দুপাটি দাঁত আছে, সবুজস্নিগ্ধতায় আছে পচন— ইত্যাকার জ্ঞান কে চায়! স্নিগ্ধ সাহিত্য, যা পড়লে মন ভাল হয়ে যায়, যা প্রতিদিনের ক্লেদ, পচা রক্ত, বসা মাছি থেকে দূরে, হিংসা আর লোভ আর মরুর আগুন বালির শুষ্কতা ভোজবাজির মতো উড়িয়ে নিয়ে যায় কোথায় সেই ঘুমের বড়ি, স্নিগ্ধ সাহিত্য! এই কথা বলে ফার্স্ট জেনারেশন মহিলা এক্‌জিকিউটিভ মোটা ঠোঁটের রেখা সান্যাল কেঁদে ফেলে-ছিলেন (ভাবা যায়!) মিস রেখা সান্যালের দেহ কলাগাছবৎ আমার বুকে, তাঁর মাথা আমার কাঁধে ঝুলে পড়েছিল, আমার চিবুক ও কণ্ঠার মাঝখানটায় আটকে যায় রেখা সান্যালের মাথা, কার্নিশে চাঁদিয়াল ঘুড়ির বাতাসতাড়িত ঘসটানি মনে পড়ে, রেখা কাঁদছেন, ফোঁপাচ্ছেন, সর্দি আর লালায় আর চোখের ঘন আঠালো জলে আমার সার্টটির বারো বেজে গেল।

[বিশ্বাস করুন, একশোভাগ সত্যি, সত্যি এরকম ঘটেছিল। আমি এ ঘটনা টুকে দিলাম রেখা সান্যালের কান্না সাহিত্য সম্বন্ধীয় বলে নয়— শুধু বৈচিত্র্যের লোভেও নয়— লেখাটিকে প্রবন্ধের হাত থেকে বাঁচাতেই এই প্রক্ষেপণ।]

রেখা সান্যাল নিঃসঙ্গ নন; সাহিত্যে দর্শন, সত্য, সমাজ খুঁজে হয়রান বহু লেখক পাঠককেও প্রায়ই আক্ষেপ করতে দেখি, এসব যথেষ্ট মাত্রায় না-পাওয়ায় তাঁরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ হন। তাক থেকে বই পেড়ে ধুলো ঝেড়ে সাহিত্যের সংজ্ঞা দেখান এবং বিড়বিড় করেন: এসব কোথায়? যশের জন্য নয়, ক্ষমতার জন্য নয়, লিখে দেশের মানুষের উপকার করতে হবে। নীতিকথামালা চাই। সাহিত্যে যে এরকম

কোনও উপযোগিতা পূরণের ব্যাপার নেই, এ যে কোনও পরিষেবা নয়, রেখা সান্যাল তা শুনতে নারাজ। আবার উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে যেমন শাস্ত্রজ্ঞান ভাল না থাকলে প্রশ্ন করার অধিকার জন্মায় না সেভাবে, সাহিত্য তো তা নয়। আমি পড়তে পারি, সমস্ত শব্দের অর্থ জানি— এটাই যথেষ্ট। যদি তুমি তা মেনে না নাও তাহলে এলিটিজম করছ।

এত সব প্রশ্ন, দ্বিধা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কেউ লিখতেই পারেন, লেখেনও বটে। কার জন্য লিখি, কেন লিখির জবাব হরলিক্সের বিজ্ঞাপনের শিশুটিই দিতে সক্ষম : আমি তো এমনি-এমনি লিখি।

লেখার টেবিলের উল্টো দিকে কেউ শ্যেনদৃষ্টির পাঠক বসিয়ে রাখেন না এ যেমন সত্য তেমনি খাতার উপর ঝুঁকে পড়া হাত, কফির ধোঁয়া, ভুতে পাওয়া এক মুখমণ্ডলও কোনও ব্যক্তি লেখকের নয়, ঐ হাত নগ্ন, নির্জন :

'কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।'

পাটিগণিতের সাধ্য নয় বোধ-বুদ্ধির এই স্তর স্পর্শ করে। অতএব, দুর্বোধ্য। কেননা সহজ বুদ্ধিতে এই তিনটি লাইন তিনটি অক্ষর মাত্র : অ তী ত। কিন্তু তা মূর্ত নয়, স্পষ্ট নয়, অস্পষ্টের অস্পষ্ট, এমনকি সেই ক্ষীণেরও আভাস মাত্র। বোঝার জন্য, ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি পরম্পরায় বোঝার মতো কিছুই নেই এখানে, শব্দের এই মূর্ছনা তার প্রায় সংগীত হয়ে ওঠা আমাদের সজাগসচল সাংসারিক বুদ্ধির সঙ্গে কোনও সংলাপের অবতারণা করতে পারে না— তাই এ ব্যর্থ।

এই ব্যর্থতা, এভাবে গভীর বেদনার্ত অথচ একান্ত সংগোপনে ব্যর্থ হওয়া এক প্রেম-সম্ভাষণ— একার শিল্প। পাঠক সমাজ, লেখক সমাজে এর স্থান নেই এবং এর অস্তিত্বই নেই— এর অস্তিত্ব
ঘোষণা নেই বক্তব্য নেই যেন শরীরও নেই ক্ষয়ের বলয়…

মুখমুখোশ

জোজো দু বছরের এক দামাল শিশু, আমাকে কাঁদিয়ে ছাড়ল।

ঘটনাটি এরকম :

বাঘ সিংহ বাঁদরের মুখোশ এঁটে জোজোকে ভয় দেখাচ্ছিলাম আর ও বারবার ছুটে এসে টান মেরে খুলে দিচ্ছিল সেসব। এই খেলায় ছুটোছুটিতে শেষতক ক্লান্ত আমি, হাঁফাচ্ছিলাম। মুখোশহীন আমাকে কিছুক্ষণ নজর করে হঠাৎ-ই ও ছুটে এসে আমার দাড়ি ধরে ঝুলে পড়ল। যত বলি ওটা আমার দাড়ি, মুখোশ নয়, ছাড় জোজো, ও ততই জোরে টানতে থাকে।

অভ্যাস, রেওয়াজ, প্রথা সাহিত্যের উপর এরকমই একের পর এক মুখোশ চাপিয়েছে।

পরিস্থিতি এমনই এখন সেসব ছাড়াতে গেলে ছালচামড়া অবধি উঠে যাবে। সামাজিক মানুষ, সভ্য মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, দলের মানুষ, পারিবারিক মানুষের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক মানুষকে খুঁড়ে আনা যেমন আজ প্রায় অসম্ভব।

মূর্তি ভাঙার রাজনীতি ধোপে টেঁকেনি কিন্তু সে গোপন ও সাঙ্কেতিক রাণীর মতো হাতে গুঁজে দিয়েছিল মূর্তিভাঙার সংস্কৃতির একটি চিরকুট। সেটি আজও অম্লান। সাহিত্য বনাম সাহিত্য— এই লড়াই বহুদিনের, একেক প্রকার সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে সাহিত্যের এই কুণ্ঠার যে বারবার ঝলসে উঠেছে তার মূলে রয়েছে বিমূর্তের টান। ক্রমাগত আবরণ উন্মোচন। সমাজসেবামূলক সাহিত্য এই গোত্রভুক্ত নয় বলা বাহুল্য। বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলে অতীতে একটা কথা চালু ছিল, এখন আর কারো মুখে সেই কথাটি বিশেষ শুনি না। সাহিত্য সেবা, সাহিত্য সাধনা নামে চিহ্নিত করা হত লেখালিখিকে। এতে একটা পুজোপুজো গন্ধ আছে ঠিকই কিন্তু তার বিকল্প লেখালিখি শব্দে খাটাখাটনি ছাড়া যেন আর কিছুই নেই। আর সত্যি মোটা মোটা উপন্যাসের দিকে তাকালে, হাতে নিয়ে তার ওজন পরখ করলে খাটনির গতিক দেখে রীতিমতো ভয় লাগে। আবার শ্রদ্ধাও জাগে— লেখক ভদ্রলোক না জানি কত দিন কত রাত টানা লিখে গিয়েছেন, বিরক্তি ক্লান্তিতে নিঃশোষিত না হওয়া পর্যন্ত। এই কেজো স্বভাব, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে উপন্যাসের শৈশবযুগের সেই একটি গল্পকে পরম্পরায় সাজানোর রীতির প্রতি সশ্রদ্ধ থেকে খেটে চলার মধ্যে বেচারা লেখক উদ্ভাবনের নেশা এবং সুখ থেকেও বঞ্চিত করেছেন নিজেকে শুধু পাঠকের চাঁদপানা মুখের কথা ভেবে। এই পাঠক পরিষেবা গুণমানের দিক থেকে সমাজে প্রচলিত সমস্ত পরিষেবার মধ্যে যে সেরা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুঃখ হয় এঁরা কিন্তু সেই অনুযায়ী পারিশ্রমিক পান না। দু-একটি পুরস্কার জোটাতে পর্যন্ত কত না খিদমত করতে হয়, কত লোকের মন জোগাতে হয়। পাঠক পরিষেবা কেড়ে নিয়েছে সাহিত্য সেবা, সাধনা— কেড়ে নিয়েছে আনন্দ— এ আনন্দের ফল নয়, প্রেমিকপ্রেমিকার আনন্দমথিত সন্তান নয়, হৃদয়হীন নিরুত্তাপ মিলনের উৎপাদন মাত্র।

শয়তানকেও তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা অনুচিত : পাঠক তথা বাজার-দাস সাহিত্যেও কিন্তু এরকম নজির মিলবে যেখানে বস্তুজগৎ তার বাহির্ভাগ খসিয়ে বিমূর্তায়নের হাত ধরে হাজির হয়েছে কিছুটা নবরূপে। তবে সেখানে এই লক্ষণ সাধারণ, ব্যাপক নয়। এই প্রক্রিয়ার সৃষ্টিধর্মই তার বাধা। ঐ ধর্ম ব্যক্তি পাঠকের জন্য বহু সাঙ্কেতিক চিহ্ন রেখে দেয়— দুটি বাক্য ও পংক্তির মাঝখানেও থেকে যায় কিছু লেখা কিছু পড়া। ঐটি সৃষ্টিশীল পাঠকেরই লেখার ও পড়ার কথা এবং এতে সাহিত্য থেকে যাচ্ছে জায়মান। এই উন্মুক্ত স্বভাব, এই সম্ভাবনা তাকে শেষ হতে দেয় না। আবার এ জন্যই সে কোমল, ভঙ্গুর। কাঠামো-সর্বস্ব লৌহবাসর নয়, চূড়ান্ত নয়, মৃত্যু নয়।

অনন্ত উন্মোচন।

সাহিত্যের জগৎচিত্রে যেজন্য ভবিষ্যৎ, বর্তমান নেই। সময় এখানে একমাত্রিক, শুধুই

অতীত। কখনো সে সুদূর কখনো প্রায় নাগালের মধ্যে, কখনো ঘাড়ে তার তপ্ত শ্বাস টের পাই। অতীত জাদুঘরটির নব্বুই শতাংশ প্রত্নসম্পদই রয়ে গিয়েছে অন্ধকারে। আর যাদের দেখেছি তারাও পূর্ণ আলোকিত নয়। আলো আর ছায়ার সেই অতীতের সঙ্গে ঘর করাকে দ্রুতগতির জীবনের একবিংশের কোনও নাগরিক শবসাধনা বলে চিহ্নিত করলেও কিছু বলার নেই— হ্যাঁ, হয়তো তাই। এবং সর্বজনীনতার গর্ভও বোধহয় এটাই। নতুন তাৎপর্য, ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিকোণের ছোঁয়ায় পুরনোর নতুন হয়ে ওঠা বা এতকাল গোপন ছিল এমন কিছু বাণী ও রূপ প্রকাশ করা— ইত্যাদি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যুগলবন্দিও বলা যেতে পারে। অনাগত সময় এতে স্বীকৃতি পেল, আবার তাকে কোল দেবার জন্যও রইল একজন, সে আদি। আদি আর অন্ত সৃষ্টি করল অন্তহীন। শেষেরও যে শুরু আছে, শুরুরও শুরু আছে, আমরা এক লহমায় চলে গেলাম সেই মৌখিক সাহিত্যের কালে। সংগীতের, স্তবের দিনে, শিল্প যখন প্রার্থনা।

জীবনকে কোনও আলাদা জগতে নিয়ে নতুন করে তাকে সৃষ্টি করা —সমান্তরাল ভিন্ন এক জীবন…

এ সৃষ্টি ভাষার। কিন্তু এ কোন্ ভাষা? একালের অনেকেই সাহিত্যের ভাষার বিরুদ্ধে। তাঁদের অভিযোগ এ কৃত্রিম। এখানে সব কিছু বানানো এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রের শিকলে আবদ্ধ। দ্বন্দ্বের নিরসনে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিই আমি। এই রচনাটির চিন্তা রবারের বলের মতো হাত থেকে পড়ে যায় সিঁড়ির উপর, ড্রপ খেতে-খেতে, মৃদু শব্দ তুলে দৃষ্টির বাইরে একেবারে। পাঁচ পাবলিকের সঙ্গে অন্য নানা প্রসঙ্গে কেটে গেল একটি সপ্তাহ। রবিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি মল্লিনাথ এল ঝুলিঝাম্পা নিয়ে, একথায়-সেকথায় উঠে পড়ল সাহিত্যের ভাষা প্রসঙ্গ (যদিও এপাশ-ওপাশ দু-চার কথা হয় প্রথমে):

ম ॥ দ্যাখো সমালোচকের সংস্কার ও রুচির কথাটা খেয়াল রাখা দরকার, ঐটি তার সীমা। আমার তো মনে হয় সমালোচনা সাহিত্য খুব কমই লেজুড়ের বেশি কিছু হতে পেরেছে, নিরানব্বুই ভাগ ক্ষেত্রেই সে হাঁটতে চেষ্টা করে সাহিত্যের ফেলে যাওয়া পায়ের ছাপ ও চিহ্ন ধরে এবং নিরানব্বুই দশমিক পাঁচ শতাংশ ক্ষেত্রে চিহ্নগুলি ভুলভাবে পড়ে ও বোঝে— যেজন্য সে সমর্থন কুড়োতে গাদা-গাদা নাম টেনে আনে…

রা ॥ অ্যাতো মারমুখী হবার কোনও মানে হয় না, বিশেষ করে এখন তো মনে হয় দেশেবিদেশে সমালোচনা সাহিত্যে যৌবনের বন্যা বইছে— ভাষার ইস্যুটা তাঁরাই বেশি করে তুলে ধরছেন…

ম ॥ এরকম একেকটা সময় আসে ঠিকই কিন্তু এঁরা আশ্রয় করছেন যা, যা ধরে ধরে এগোচ্ছেন সেটা তো গদ্য বা পদ্য…

রা ॥ ধ্যাত, যা তা বলছিস, এতে কী এসে গেল, এও তো একটা সৃষ্টি, সৃষ্টিরই কাজ— এ তো সমালোচনার নামে তথাকথিত নোটবই নয়, ভাষা ও রূপ সন্ধান, পুনরাবিষ্কার।

ম ॥ কিন্তু যে অন্তর্নিঃসহায়তা সাহিত্যের প্রেরণা···

রা ॥ বিশ্বাস নয় ? বিশ্বাসের নিশ্চয়তা নয় ?

ম ॥ এ তর্কে যাব না, তাতে ভাষা প্রসঙ্গ থেকে সরে যাব আমরা এবং শেষ পর্যন্ত জীবনের জন্য সাহিত্য না সাহিত্যের জন্য জীবন এ জাতীয় বোকাবোকা জায়গায় এসে ঠেকব, বিরক্তিতে গলা তেতো হয়ে যাবে।

রা ॥ রাইট।

ম ॥ ভাষা-ব্যবহার সংক্রান্ত একটা মজার গল্প মনে পড়ছে। ধর তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস, যাকে সংলাপ বলা হয়, সেটাই চলছে। কিন্তু চলছে বেশ অদ্ভুতভাবে। কথা বলছিস তুই একাই, আমি এক নীরব-নিষ্ক্রিয় শ্রোতা— বা তাও নয়, জাস্ট বসে আছি তোর সামনে একটা ফিজিক্যাল এক্‌জিস্টেন্সমাত্র। এবার তুই নিজের কথা বলছিস, আবার আমার হয়েও তুই কথা বলে যাচ্ছিস। ফলে তুই যে শুধু আমারই নকল করছিস তাই নয় তোর নিজের বলাটাও নকল হয়ে যাচ্ছে— এটা দুজনের কথাবার্তা নয় ; দুজনের একজনেরও নয়— এক তৃতীয় এসে যাচ্ছে— ধরা যাক সে ভূত···

র ॥ গল্প-উপন্যাসের সংলাপ অংশে একরকমই ভূতের ভাষা থাকে বলতে চাইছিস ?

ম ॥ বিষণ্ণ রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তোমার উচ্চাশাই কি কারণ নয়, সেজন্যই তো দেশটাকে নরক মনে হচ্ছে। তোমার মনের প্রসার— বিস্তারের কাছে এ নেহাতই সংকীর্ণ। রাজপুত্রের জবাবে— জেলখানার কথা এবং দুঃস্বপ্নের প্রসঙ্গ এলে তাকে ফের জেরা করা হয় : স্বপ্ন তো প্রকৃতপ্রস্তাবে উচ্চাশা। জবাব : স্বপ্ন শুধু ছায়া— কথা আরো এগোলে উচ্চাশা হয়ে ওঠে ছায়ার ছায়া— মহাবীর/সম্রাট/সুলতানরা তাহলে রাস্তার ভিখিরির ছায়া···

রা ॥ এইসব কথা রাজপুত্র বলছেন না, আর এতো জেরাও বাস্তবে কোনও রাজপুত্রকে কখনো করা হয়েছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু এ ধরনের কথাবার্তা-আলোচনা হওয়া সম্ভব ছিল— তার জন্য রাজপুত্রের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই ভিখারিরও, স্বপ্ন, উচ্চাশা, কীর্তি, জয় ইত্যাদি শব্দের থলেয় বন্দি কালচারাল কনটেন্টই যথেষ্ট— তারা হই হই করে বেরিয়ে এসেছে থলের মুখ খোলা পেয়ে— কোথাও এরকম কথা ছিল, এরকম কণ্ঠস্বর নিকট অতীতে, ভবিষ্যত অতীতে আছে—

ম ॥ বালকের সন্তুষ্টির জন্যই শুধু সংলাপের ব্যবস্থা— গপ্‌পো বোনা— গপ্‌পো এখানে কিছু নয়, সংলাপও নেই—ভিন্ন এক জগৎবিবরণ পেশ করা হচ্ছে পটচিত্রে···

রা ॥ হ্যামলেটের ওই বচনের প্রতিমূর্তি আবার রাজা লিয়র— মানে ধর লিয়র,

হ্যামলেট ইত্যাদি কুশীলবদের নিয়ে রয়ে গেছে আমাদের না দেখা একটি নাটক। লিয়র হ্যামলেটের বিস্তার বা দোলাচলের প্রতিমূর্তি। হ্যামলেট লিয়রের বীজ।

কথার বোঝা

যেভাবে হোক এই বোঝা ঝেড়ে ফেললেই সাহিত্য হল এমন নয়, প্রিয়জনকে চিঠি লেখার সময় কত সংযতবাক মানুষও বাচাল হয়ে ওঠে এবং তাতে সেইসব চিঠির পত্রসাহিত্য গোত্রভুক্ত হওয়াটা যে আটকে যাচ্ছে এমনও নয়। তাহলে কেন সংযতবাক, মিতকথনের প্রসঙ্গ বারবার ওঠে? বরং লোকসাহিত্যে অতিকথনের, পুনরাবৃত্তির ব্যবহার দারুণ অভিঘাত সৃষ্টি করছে এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এমন অনেক উপন্যাস, নাটক আছে যেখানে দীর্ঘ ও অনুপুঙ্খ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে, কথা হচ্ছে বেশ উচ্চগ্রামে, এমনই যে তার বানানো চরিত্রটি মাঝে মধ্যে ঝলসেও উঠছে— তবু সেইসব সাহিত্য আজও আমরা ঘুরে ফিরে পড়ি এবং জায়মান থেকে যাওয়ার যে ধর্মের কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি এইসব সাহিত্যে তা যথেষ্টমাত্রায় আছে। ফলে অতীতের পাঠক সেইসব রচনাকে তাজা বলে অনুভব করেছে, তার পরের পাঠকের কাছেও সেসব এসেছে নবরূপে, আজ আমাদের কাছেও তা নবীন এমনকি ভবিষ্যতের পাঠকের চোখেও তা নবরূপেই আবির্ভূত হবে।

সাহিত্যে সত্য, দর্শন, সমাজচিন্তার জন্য যে এটা ঘটছে না তা আমরা জানি। এসবের গল্পশরীরও গৌণ হয়ে যায় একসময় বা হয়ে যেতে পারত যদি না কথার সঞ্জীবনী শক্তি প্রতি মুহূর্তে তাকে জীবনদান করত।

এই পর্যন্ত এসে আমি ঠেকে গেলাম। মনে হচ্ছে একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছি, তবে কেমন একটা বিশ্বাসও অনুভব করছি, না নিষ্ক্রমণ পথ আছে। প্রক্রিয়া, বা রসায়ন যাই বলা হোক সৃষ্টির ব্যাপারটা আর একটু নিশ্চয়ই বোঝা যাবে, দেওয়াল এখনো বেশ দূরেই আছে…

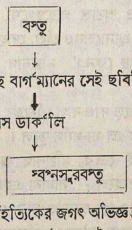

শিল্পীর/সাহিত্যিকের জগৎ অভিজ্ঞতা=শিল্প-সাহিত্য—নিঃসন্দেহে এক ভুল সমীকরণ। তবে একটা সম্পর্ক অবশ্যই আছে। যদিও সেই সম্পর্কের ধরন ও তার জটিলতার খুব সামান্য অংশই প্রকাশিত। সাহিত্যের আলোর সবটাই এসে পড়ল হয়তো অভিজ্ঞতার

কোনও এক বিশেষ অংশের বিশেষ বিন্দুর উপর। বা কল্পনা করুন এই দৃষ্টি-অনুভব হয়ে উঠল আরো প্রান্তিক, এমনকি ফ্রেমের বাইরে চলে গেল—
সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি থেমে গেল, স্পষ্টতাও আর এগোতে পারল না।
হয়-না এমন জিনিস হল।
বাউলরা এটা মর্মে মর্মে বোঝেন, কারণ এঁরা প্রক্রিয়ার সাধক, সিদ্ধ।
দৃষ্টি অর্জনের কথাটাও এসে যায় এই সূত্রে, আমরা শিল্পের-সাহিত্যের সংসারে এর বহু পাগলামি, আতিশয্য দেখেছি। দ্রষ্টার বিশেষ ক্ষমতা পেতে তথা দ্রষ্টা হয়ে ওঠার জন্য র‍্যাঁবো থেকে গিনসবার্গ, মধ্য কলকাতার তুষারকেও দেখেছি মাদকের দ্বারস্থ হতে। বাউলরা বিস্তর গাঁজা খান আজও। কবি জীবনানন্দ নেশাভাঙ করতেন বলে শুনিনি কিন্তু প্রতিমার তৃতীয় নেত্রের অধিকারী যে পূর্ণমাত্রায় ছিলেন তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। অমদাপ ঐ মাতালের নেশার প্রয়োজন হয়নি।
তাহলে নেশা কেন? দিব্য নজরটির, তৃতীয় চোখের খোঁজ, আর আবশ্যকতা সম্পর্কে র‍্যাঁবো থেকে গিনসবার্গ-তুষার এবং নাম না জানা এ পথের বহু যাত্রীর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না, সেই কথাটাই শুধু প্রামাণ্য করে তোলে নেশার হাত ধরার এই চেষ্টা। [নেশার ভাল-মন্দ বা উচিত অনুচিতের প্রশ্ন নয় এটা। কল্পনার তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কবির অনায়াস সন্তরণ ও নেশাগ্রস্তের খাবিখাওয়া, তার অকালমৃত্যুর আমরা তো প্রত্যক্ষদর্শী।] নেশা এখানে ওই দৃষ্টির জন্য আকুতি বিশেষ। অন্য কেউ যা পেতে চেষ্টা করেছেন আত্মপ্রহারে। ভবঘুরে, সমাজবিরোধী হয়েছেন কেউ। নিথর সত্য দেখতে পেলেন ভিখিরি হওয়ার পর। প্রাচ্যের এক কবি বলতে পারেন, আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়…

রেখা সান্যাল, মল্লিনাথ প্রমুখ

কল্পনা করুন মিস রেখা সান্যাল ও মল্লিনাথ বাস্তব চরিত্র। এবং তাঁরা এই অকিঞ্চিৎকর লেখাটির খড়কুটো হওয়া অপেক্ষা হাই তোলাকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেন। সেই কথাটি আমাকে খুব কর্কশভাবে জানালেনও তাঁরা, দোহাই দিলেন স্বাধীনতার, 'তোমার যা ইচ্ছে লেখ, আমাদের টানছ কেন।' মল্লিনাথ তো পারলে খুন করে ফেলে :
'লেখা-ব্যাধি তোর, সুতরাং নিজে মর, আমার ঠ্যাংটি ছেড়ে দাও বাপ। নিজের নামে বলা/লেখা সাহসে কুলোচ্ছে না…' এবং খুব কাঁচা খিস্তি করল মা-মাসি তুলে। এতে আমি যত না চটেছিলাম তার থেকে বেশি মুষড়ে পড়ি এই ভেবে, মল্লিনাথ আমাকে এত ঘৃণা করে জেনে। ভালবাসা-ঘৃণা চক্র কি সত্য তাহলে? সামান্য একটা লেখা যা ২০/২৫ জন পড়বেন কিনা সন্দেহ। পড়ার পর ২/৩ জনেরও মনে থাকবে না, যা হারিয়ে যেতে ৬ মাসও লাগবে না, এমন একটি কাগজ-নৌকা। মল্লিনাথ ও রেখা আক্রমণ করেন গত ২৩ ফেব্রুয়ারি। আজ ২৫ তারিখে কলম ধরেছি তার বিবরণ

লেখার জন্য নয়। আমাদের সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছে— এ নিয়ে কোনও মন্তব্যও লিখে রাখতে চাই না। আবার কপি করা, নতুন করে লেখার মতো মনের জোর ও ইচ্ছে কোনোটাই নেই। তাই একটি পাঠনির্দেশ দিয়ে রাখছি : যে সমস্ত সংলাপ অংশ এবং অন্যত্র মল্লিনাথ ও ম আছে সে সবই ভূত ও ভূ পড়তে হবে। রেখা সান্যাল স্থলে পড়বেন বৃত্ত রায় (সারনেম নয়— কোর্টের রায় অর্থাৎ গোল্লাই সত্য এই রায়)।

মল্লিনাথই যখন নেই এবং রচনামাত্রের একটা নাম থাকা নিয়ম/রীতি বলে নামের সাইনবোর্ডটিও পাল্টানো দরকার, পাঠকের প্রতি অনুরোধ যা হোক একটা নাম বসিয়ে নেবেন, আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে 'নিবোধের শিল্পশাস্ত্র' মন্দ হবে না।

বালুকারাশি

বা, বালির রাশি। কে কবে এমন রাশি দেখেছে স্বপ্ন ছাড়া। বাস্তবে এ দুইই আছে, বালি এবং রাশি ; যেমন আছে নর এবং সিংহ কিন্তু নরসিংহ নেই। জল থাকলেও পরী নেই, রূপকথার জাদুঘরটি সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারের অন্তর্গত বলেই তবু জলপরী, মৎস্যকন্যা, নরসিংহরা আছে। এ এক সিনথেসিস, ফ্যানটাসি বলে চিহ্নিত, যার জন্ম কল্পনার হিস্টেরিয়ায়। সমান্তরাল এক জীবন ও জগতের এই শিল্পভাষা সাহিত্যের একচেটে নয়। সাহিত্যভাষা মানস চিত্রকল্প, ক্যানভাসে তার প্রকাশ, তাকে রূপ দেওয়া নব্বইভাগ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। এ তার নিজস্বতা, এখানেই তার মৌলিকত্বের বীজ। বালুকারাশির কোনও চিত্র হয় না, শুধু মানসপটেই এ নিজেকে মেলে ধরতে পারে। অন্যথায় বালি পড়ে থাকবে শুধু কিংবা বালি রঙের একটি দড়ি দেখতে পাব আমরা। কণাগঠিত বস্তু যখন দেখি তখন কণাগুলি চলে যায় দৃষ্টির আড়ালে, এখানে, বালুকারাশি শব্দে, এই মানসচিত্রকল্পে কিন্তু তা হচ্ছে না, উভয়ের কেউই তৃতীয়কে গড়তে গিয়ে আত্মবিলোপ ঘটায়নি। মজা হচ্ছে এই শব্দ সৃষ্টির পিছনে কিন্তু এত যুক্তি, এত বিচার ছিল না— এ এক উন্মাদ কল্পনা মাত্র।

এই শব্দযুগলের স্রষ্টা লেখক হয়তো একে আজগুবি বলে মানতেই চাইবেন না। উল্টে এই গোত্রের আরো অজস্র শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চাইবেন ভিন দেশের ভাষা তার আচার, আচরণ যেমন স্বতন্ত্র, আপনার অজ্ঞাত অথচ অনুশীলনে চর্চায় আপনি শিখে নিতে পারেন, সাহিত্য তেমনই এক ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জীবন, সেখানে এসব শব্দ, চিত্রকল্প, ধ্বনি, যতি, শুধুতা শুধু ভাষা নয় জীবনও, একে ভাষাজীবন, ভাষাশরীরও বলতে পারি আমরা।

ঐ লেখককে আমরা জেরা করে চললে একসময় তিনি গোপন কথাটি ফাঁস করে দেবেন : বাস্তবের স্মৃতি এর উৎস, আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি, সেই স্মৃতি থেকে লেখা :

স্মৃতি শব্দটিকে আলাদা করে রাখা যাক। বাস্তব-ও থাক একটু তফাতে।

অভিজ্ঞতা শব্দটিকেও বেশ সন্দেহের চোখে দেখা দরকার। ক্রমানুসারে বাস্তব প্রথম— দ্রষ্টা ও দৃশ্য দুই-ই বাস্তব। কিন্তু স্মৃতি আর অভিজ্ঞতার পরম্পরা নিয়ে এক বিভ্রাটে জড়িয়ে যাই।

এখানে 'ব্যক্তি' মহাশয়টি আর এক ফাঁদ পেতে রেখেছেন। ব্যক্তির স্মৃতি, ব্যক্তির অভিজ্ঞতা তো শুধু নয়, তা প্রকাশ করায় পাল্লা আবার বেশি ঝুঁকে যাচ্ছে ব্যক্তিগত ভাষার দিকেও।

ক্রিয়া-কর্ম-অনুভূতি এক কুঠারিতে বদ্ধ আছে যেন, সেসব অতীতের স্মারক হয়েছে এখন। অভিজ্ঞতারই রূপান্তর ভাবাটা ঠিক হবে না, কারণ জারিত হওয়াটাও সম্ভবত অভিজ্ঞতারই এক পর্দা, পর্ব। স্মৃতিকে অভিজ্ঞতা থেকে এবং অভিজ্ঞতাকে স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করব কী করে। ধুকধুক স্পন্দনের, জীবনের, শুরুর দিন থেকে সে সঙ্গী। স্মৃতির অভিজ্ঞতাও আছে আমাদের— যেজন্য মাও সে তুঙ কথিত সাদা পাতা আমরা কখনওই নই। ফলে ছবি আঁকতে গেলে কিঞ্চিৎ জটিলতা অনিবার্য। যেসব আঁকিবুঁকি বয়ে বেড়াই তার কিছু যৌথের, যৌথ নিশ্চেতনার, কিছু ব্যক্তিগতও।

গোয়েন্দা বুলাও, ব্যক্তিগত মালটির ঢাকনা খোলা হোক, পাউডার ছড়িয়ে পায়ের ছাপ, হাতের ছাপ নেওয়া হোক।

নিত্য ব্যবহার্য, কাজকামের ভাষা, কেতাবের ভাষা, কেতার ভাষা, বিজ্ঞাপন ও গালমন্দের ভাষা, ভাষা ভাঙা শব্দ, শব্দের অক্ষর, প্রত্যয়, বিভক্তি— এবং আরও ভাঙতে-ভাঙতে ধ্বনিতে সুরে পৌঁছে যাওয়াটা অসম্ভব নয় কিন্তু অর্থ সংযোজন, সেটা কী ভাবে সম্ভব? এই ভাঙাগড়ায় যা সৃষ্ট হচ্ছে সেই মুখটির একদিক আলোকিত অন্যদিকটি রয়েছে অন্ধকারে। টেক্সটের এই আলোকিত দিকটি যদি হয় স্বচ্ছ সৃজনশীল অংশ তা হলে যা রয়ে গেল অন্ধকারে সেই অংশটি নিশ্চিত দুর্বোধ্য। এবং দুটি ভাগেরই পুষ্টির পিছনে অন্য অনেককিছুর সঙ্গে রয়ে গিয়েছে এক গ্রন্থপঞ্জী। রচনার মুহূর্তেও সম্পাদনার কাজ কিছু থাকে: প্রকাশ ও অপ্রকাশের মধ্যে থাকে একটা লেনদেন। অব্যক্ত বলে যাকে আমরা এতদিন চিহ্নিত করে এসেছি সে যে পাঠের অন্তর্গত হচ্ছে এটা এখন স্বচ্ছ হল যুক্তির দিক থেকে, কিন্তু প্রক্রিয়াটি বোঝা গেল না।

প্রকাশ ও অব্যক্তের এই টানাপোড়েনে বাস্তবের একটা রূপান্তর ঘটছে দেখি। বাস্তব হয়ে উঠছে শিল্প বাস্তব। এই অবধি তেমন মাথাব্যথা কিছু নেই, বিপদের থাবা ঝলসে উঠছে ঠিক এর পরেই: কী ভাবে ঘটে এই রূপান্তর, এই নবজন্ম।

বাস্তবের শিল্প বাস্তব হওয়ার পর্বগুলি লক্ষ করা যাক:

বাস্তব
↓
ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে আগত বাস্তব
↓
স্বপ্ন বাস্তব
↓
শিল্প মাধ্যমে গৃহীত/স্থান করে নেওয়া স্বপ্ন বাস্তব (সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষাই শিল্প মাধ্যম)
↓
শিল্প বাস্তব

ব্যক্তিগত ভাষাই শিল্পভাষা, ব্যক্তিগত উপাদান ভাষাকে মাধ্যমের অতিরিক্ত কিছু করে তোলে, সৌন্দর্য সৃষ্টির এটিই প্রধান উৎস। এর আগে আমরা যে উদ্বৃত্তের কথা বলেছি তারও গর্ভ এই ব্যক্তিগত ভাষা। যা স্বপ্ন ও বাস্তব, যা কল্পনা ও জ্ঞান, যা অভিজ্ঞতা ও অনুভব। একটি বাক্যে এর স্বরূপ হল : জগৎচিত্রের ভাষাচিত্র হয়ে ওঠা। এই কাণ্ডটি যখন ঘটছে বস্তু জগতের ত্রিমাত্রা, তার আকার, আয়তন, স্পর্শ, গন্ধ সমস্তই ভিনদেশের নাগরিকত্ব নিচ্ছে, সেইটি ভাষা দেশ। যে দেশকে আমরা সমান্তরাল জগৎ ও জীবন হিসাবেই চিনেছি। কিন্তু এই দেশ আরশিনগর নয়। বরং ককতোর সেই কুহক আয়না এটি যার মধ্য দিয়ে লাসাময়ী মৃত্যুদেবী অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে শুধু নয় কবির হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে, দেখিয়ে দিতে পারে, দুর্বোধ্য অথচ স্বচ্ছ দৃশ্যাবলী। দুর্বোধ্যের কারণেই স্বচ্ছ অতখানি স্ফটিক এবং উল্টো দিক থেকে স্বচ্ছতাই দুর্বোধ্যকে করে তুলছে অতখানি কুহকধর্মী, অনন্ত অর্থের ভাণ্ডার।

ব্যক্তিগত = নৈরাজ্য

এইখানে, ভুলে যাওয়ার আগে বা পাছে ভুলে যাই (কারণ শুধু তো স্মৃতি নয় আছে বিস্মৃতিও) সেই ভয়ে বলে রাখি, স্বচ্ছ সৃজনশীল ও দুর্বোধ্য কিন্তু টেক্সটে কখনো দুটি পৃথক খণ্ড হিসাবে উপস্থিত নয়, তারা আছে পরস্পরের সঙ্গে মিশে, দুই তন্তুর বুনন যেমন। এ ওর উপর আলো ফেলছে।

ভাষায় একটা নৈরাজ্য সংঘটনের দরুনই এমনটা হচ্ছে। সাধারণভাবে যে সাঙ্কেতিকতা ভাষা ধারণ করে তার ব্যবহার ও প্রচলিত নিয়মকানুন, সেসবের পুরনো অভ্যাস ইত্যাদিতে ঝরে যায় সাঙ্কেতিকতার পালকসমূহ। পাখির বাসা কাকের বাসা, তা নীড় নয়। কিন্তু পাখির নীড়ের মতো হলে 'র'-এর পুনরাবৃত্তিতে ধ্বনিমাত্রা এসে পড়ে, একটা অভিঘাত— এতে যা বলা হচ্ছে তাতে আশ্রয়-উষ্ণতা-আতিথ্য যেমন আছে তেমনি রয়ে গেছে উড়ান তথা গতিও— কেননা নীড় কুলায় নয় শুধু, সে রথের আসনও বটে। কখনো-বা শব্দ গুপ্তও রেখে দেওয়া হয়। পায়ে ধরে সেধেও রাধা রা না দিলে এবং পাগোল পা ছেড়ে দিলে পাই ধারাগোল। সাঙ্কেতিক লিপি যেন। [এই হেঁয়ালিটি খুব সরল ও গড়পড়তা নজির হল সন্দেহ নেই তবে সাঙ্কেতিকতার দিকটি স্পষ্ট করতে এর জুড়ি মেলা ভার।] ব্যক্তিগত ভাষায় ভাবতে গিয়ে কত কবি শব্দের রঙ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন, রঙ-বাচক শব্দে খুঁজে পেয়েছেন বিভিন্ন মাত্রার ঊষ্ণতা।

সাঙ্কেতিক ভাষায় রচিত এই ভিন জগতের কিছু আন্দাজ, কিছু উপকরণ আমরা জীবনানন্দের রচনায় সামান্য খুঁজলেই পেয়ে যাই, তারই কিছু খণ্ড দৃশ্য দেখব এবার। তার আগে বলে নিই, থার্ড থিয়েটারে যেমন কিছু অনুভব কিছু ধারণাকে ইম্প্রোভাইজ করার চেষ্টা থাকে, উদ্ধৃত অংশগুলিতেও আমরা দেখব সেরকমই একটি ধারণা ও অনুভূতিকে ইম্প্রোভাইজ করা হচ্ছে। আর তার নাম : ভালবাসা।

খণ্ড দৃশ্য : এক

'সত্যব্রতের নিজের জীবনেও এরকম প্রেমানুভূতা এসেছিল নাকি ? এরকম ? না, কোনোদিন এ জিনিশ পায়নি সে। ঘুরেফিরে কতকগুলো ভালবাসার গানেরই রেকর্ডের ফাঁকে মাধুরীকে দিনরাত্রির যে কোনো অবান্তর সময়েই আটকে ফেলে উপভোগ করতে পারে বলে বিনয়েশের বিশুদ্ধতার আর শেষ নেই।'

খণ্ড দৃশ্য : দুই

'জ্ঞানবাবুদের বাংলোতে সময়ে অসময়ে গ্রামোফোন বেজে চলে··· দিন-রাত্রির বিশেষ বিশেষ সময়ে বাছা বাছা রেকর্ডগুলো চড়িয়ে দিচ্ছে বিনয়েশ। বাড়িতে লোকজন কেউ নেই। এমনই রেকর্ড পছন্দ করে নাকি সে, একাই সে নাকি শ্রোতা ?··· নিজের মুখে রেকর্ড বেজে উঠতেই মাধুরী তার পড়ার ঘর থেকে নেমে আসছে। একেবারে দক্ষিণের বারান্দার দিকে চলে যাচ্ছে, বেতের চেয়ারটা টেনে, চশমাটা আঁচলে মুছে নিয়ে ভাল করে এঁটে, শুনছে। শুনছে সে, দেখছেও বটে, চশমা পরিষ্কার করার আবশ্যকতা ছিল তার'।

[মুখে রেকর্ড বাজে, গান দেখা যায়— এসব ঘটে সময়ে অসময়েও— বিশেষ বিশেষ সময়ে।]

খণ্ড দৃশ্য : তিন

'বিনয়েশের রেকর্ডে, ভোরে, দুপুরে, জ্যোৎস্নারাতে নক্ষত্রের সমারোহের ভেতর মাধুরীর প্রেমপ্রবণতা চরিতার্থ হচ্ছে শুধু, খুব গভীরভাবেই, কিন্তু এইটুকুর বেশি আর কিছুই নয়, বিনয়েশ ওর লক্ষ্য নয়, বিনয় যদি না থাকত, তার রেকর্ডগুলো থাকলেই যেন হয়, তারপর এই নক্ষত্র রয়েছে। অন্ধকার রয়েছে। শরের বন, বাবলার বনজঙ্গল, আউশ ধানের অনন্ত বিস্তৃত খেতপারের নীচে, নিজেকে নিজে নিয়ে বসে রইবার একটা অভঙ্গ অবসর এই সবই ত রয়েছে।'

খণ্ড দৃশ্য : চার

"সত্যব্রত বললে, 'তুমিই শুধু নয় মাধুরী, আমাদের পরিবারও শুধু নয়, অনেকেই এ পারে না, এই যে আমি এত বড়াই করছি, তোমার চেয়ে এত বেশি বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা পেয়েও কিছুতেই পারলাম না আমি, আমিও। কিন্তু এ পারা উচিত মাধুরী, পারা উচিত, পারা উচিত, এ সাধ ছাড়া এ সংকল্প সাহসকে বাদ দিয়ে এই সাহস ও আবেগে অর্জিত প্রেমকে জীবনে না পেয়ে আমাদের জীবনের কি মানে থাকছে ? কি প্রয়োজন ?'"

খণ্ড দৃশ্য : পাঁচ

'মাধুরীকে শীতাংশুর এ ভালবাসা, এ অনেকদিন ধরে, যুবকটি এ মেয়েটির জন্যই এই চার বছর ধরে পৃথিবীটাকে বিধাতার, অন্তত ভাগ্যবিধাতার সোনাফসলের ভাঁড়ার বলে

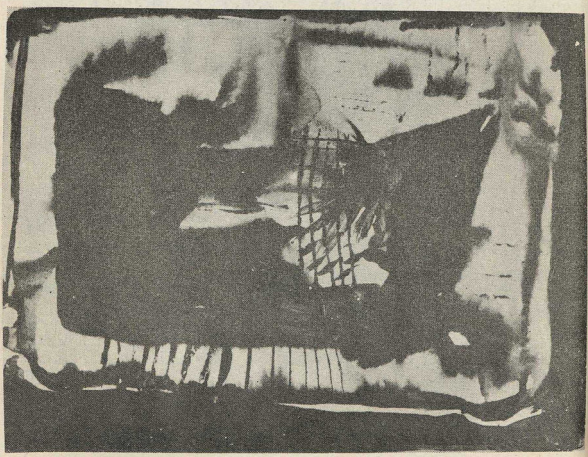

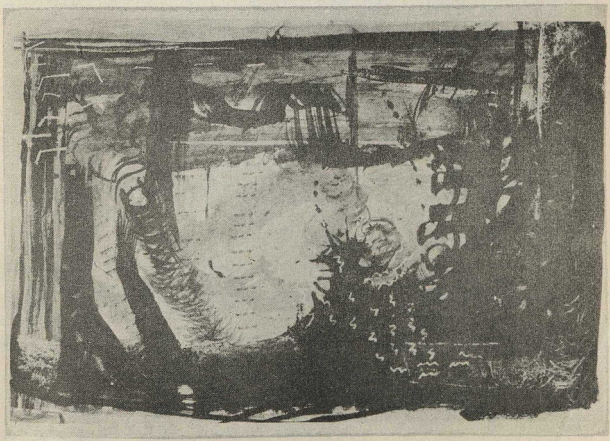

বুঝতে একবার নিরর্থক বিধাতাশূন্য মানবাত্মার গভীর সংগ্রাম সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার প্রদেশ বলে মনে করছে আর একবার। এসব কোনো কিছুর ভিতরেই কোনো শান্তি নেই, শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভস্ম।'

(শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভালবাসা : জীবনানন্দ দাশ)

ভাষার বহিরঙ্গে এখানে সর্ষে পরিমাণ দুর্বোধ্যতাও নেই। পরিচিত, সহজ সব শব্দ আত্মীয়বন্ধনে রয়েছে আর তাতে একটি গল্প ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে ক্যানভাসে। কিন্তু এত করেও বাস্তবের এমন এক প্রান্তিক এলাকা রচনাটির ভূমি, যে হয় আমরা একে বিলাস বা একপ্রকার অস্পষ্ট আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা বলে মনে করব, না হলে সবটাই কেমন ছায়াছায়া, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলেই মনে হবে। মাটির বেশ কিছুটা উপরে রয়েছে যেন, 'রিয়েল' নয়। চরিত্ররা কেউ স্পষ্ট নয় চিন্তা ও অনুভবে, তুলোর পুতুল যেন, টেক্সটে তা বলাও হয়েছে। দুনিয়াদারি এখানে নেই, সেই সময়, দেশও।

'এ শিহরণ ব্যথারও বটে, কিন্তু তবুও কি যে মধুরতার। মাধুরীও পৃথিবীর এই সমস্ত সমাবেশের ভিতরেই বসে রয়েছে সত্যব্রতের কাছে। কিন্তু তবুও এ ছবি মানুষের জীবনের অনুভব পরস্পরের চেয়ে কত দূর দূরান্তে— অনুভূতির লোকে এরা কেউ কারু মুখও চেনে না যেন।' এত বেশি 'তবু' ও 'কিন্তু' জীবনানন্দের খুব কম রচনাতেই আছে— এরা এক বিচ্ছিন্নতা এক অসহায়তা ও আর্তির কথা জানাতেই উন্মুখ— অথচ তাকে জানা ও জানানো দুইই অসম্ভবের নামান্তর। অব্যক্ত সে, চার বা দু অক্ষরের ভালবাসা/প্রেম।'

তার রূপ ও প্রতিটি তন্তু সন্ধান/উপলব্ধির প্রয়াস গল্প নামক এই রচনাটির ভাষা তাই অন্দরমহলে গভীরভাবে দুর্বোধ্য, সাঙ্কেতিক, ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত বলেই দুর্বোধ্য। ব্যক্তিগত ভাষায় রচিত শিল্পকর্মটি ত্বকের নিচের আলোর মতো। এ এক গোপন আলো, যা লুকিয়ে রাখে বহু অর্থ, সাঙ্কেতিকতার মোড়কে। সমগ্র রচনাটি ভালবাসার গানের এক পুরনো রেকর্ড যা সময় উজিয়ে বেঁচে আছে, যা যুগপৎ প্রাচীন ও আধুনিক। মাধুরী, সত্যব্রত ও অন্যান্যদের সঙ্গে আমরাও গীতটি শুনি। চরিত্ররা গানের মাঝে মাঝে দু-একটা মন্তব্য করে ফেলে, নড়েচড়ে 'যেমন আমরাও কেশে ফেলি, জল খাই, বা গানের একেকটা জায়গায় বাহবা দিয়ে উঠি। এই প্রক্রিয়ায় রচনাটি আর ফ্রেমের মধ্যে বন্দি থাকে না। সে জিনসের প্যান্টের পকেটের ছোট্ট টেপরেকর্ডারে গানটি চালিয়ে দিয়ে, দু কানে প্লাগ গুঁজে পেরিয়ে যায় ভিড়ের রাস্তা, চৌরঙ্গি, শিয়ালদা, লাফিয়ে উঠে পড়ে বাসে, দ্বৈতজীবনের এক নাগরিক সে। শিল্পের প্রান্তিক জীবন তাকেও মায়াময় করে তোলে, 'ঐ যুবকটি কি রিয়েল ?' এই প্রশ্নও উঠে আসতে চায়— আর স্বপ্ন তখন বাস্তব। স্বপ্ন-অভিজ্ঞতা স্মৃতি নিঃসৃত গীত হয়ে যাওয়ার পর একটা নোঙর পাওয়া গেল— যুক্তির রাজ্য অতদূর বিস্তৃত নয়। গানটি উঠে আসছে বহুদূরের সমান্তরাল জীবনের সেই ক্ষমাপ্রদেশ থেকে। আমরা বরং এখন আহ স্মরণ করি, স্পর্শ করি ঐ উন্মাদগীত···

[ঐ গীতটি সবাই শুনছেন, শুনবেনও, আমার এই রচনাথাতে আর আয়ুদহনের কোনো কারণ দেখি না। শুধু একটা কথা বলা জরুরি মনে করছি। অ্যাকাডেমিক্সের লোকজন যে কোনো রচনা লিখলে তার শেষে জানিয়ে দেন কার-কার সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছেন। এ ব্যাপারে একেকটি গোষ্ঠীর একেকটি নাম-তালিকা থাকে। রামা যদি শ্যামার বইয়ের উল্লেখ করেন তাহলে শ্যামাও তাঁর নিবন্ধে রামার বইয়ের উল্লেখ করবেন। এইভাবে কয়েকটি নামই শুধু ঘুরেফিরে সার্কুলেটেড হয়। আমার এই সামান্য রচনাটি অনেকের ঋণের এক অপব্যবহার বিশেষ। কিন্তু তাঁদের নাম উল্লেখ করব না এজন্য যে তাঁরা কেউই বেঁচে নেই। এ কেমন কারণ! খুব সোজা, ওঁরা তো আর আমায় নামটি ওঁদের রচনার শেষে দেবেন না সুতরাং আমিই-বা কেন দেব। কেউ যদি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন সেটা তাঁর ব্যাপার। যদিও ঠগ খুঁজতে গাঁ উজাড় হবে, শেষে দেখা যাবে এই রচনাটির একটি শব্দও আমি লিখিনি। আমাকে ধরুন চোর ঠাওরানো হল। তা হোক, কেননা আমরা তো জানি গীতের সেই কলিটিও :

কেকরা কেকরা নাম বাতাঁউ
জগমে সব হি চোর]

কিছু নিজস্ব মুদ্রা, খাপছাড়া আচরণ, উদ্ভট অভ্যাস ছাড়া ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য আর কীই-বা, এমনকি এইসব উদ্ভটত্ব ও বিচিত্র অভ্যাসও হুবহু এক এরকম বেশ কিছু ব্যক্তির দেখা মেলাও অসম্ভব নয়। যেমন ঠোঙা ও টুকরো কাগজ পড়া আমার পঞ্চাশ-ষাট বছরের অভ্যাস, সিরাজদ্দাকেও দেখেছি ঠোঙা পেলেই পড়তে। কিন্তু আমি এই অভ্যাসটির দরুন লেখালিখির ব্যাপারে যেভাবে উপকৃত হয়েছি আর কেউ তেমনটা হয়েছেন কিনা জানা নেই। ঠোঙায় পর্নোগ্রাফির পৃষ্ঠাও পেয়েছি কখনো কখনো প্রেমপত্রের মতো, সেই পুলক ভোলাবার নয়। এখানে ঠোঙা প্রসঙ্গ অবতারণার উদ্দেশ্য এই রচনাটিকে ঠোঙা বানানো নয়, যদিও সেটাই এইসব দাগ ও আঁচড়ের অনিবার্য ভবিষ্যত।

আসলে রচনাটি যখন শেষ হল, বা আমার লেখার শক্তি ও ইচ্ছে দুটোই ফুরিয়ে যাওয়ার দিন বারো পরে ৩০ মার্চ একটি ঠোঙা আমার হাতের চেটোয় পাখির মতো উড়ে এসে বসল। মিরাকল্ আর কাকে বলে! আরো আশ্চর্য, সেই ঠোঙায় 'অনাথ তত্ত্ব' শীর্ষক একটি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে আবার তা সরাসরি না বলে চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে এসেছে। তো ঐটি পড়ে আমি নির্মল আনন্দ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বিবেকদংশন, আমার দীর্ঘ লেখাটি পড়ে কোনও পাঠকই এর ছিটে ফোঁটাও পাবেন না। খারাপ লাগছিল, কষ্ট হচ্ছিল, তখনই মনে হল ছাপার কাজ তো শেষ হয়নি, পরিশিষ্ট, সংযোজন, বা ঠোঙা— জাতীয় একটা সাব-হেড দিয়ে জুড়ে দিলে কেমন হয়। বা, অনাথ তত্ত্ব নামেও ছাপা যেতে পারে।

এটা করতে গিয়ে যেহেতু ঠোঙা ঋণ কবুল করে ফেলছি তাই আর ছেনালি না করে বাদবাকি কর্জ কবুল করে একটি গ্রন্থসূত্রও দেওয়া হল।

ঠোঙা / ১

তাহার নাম অনাথবন্ধু কিন্তু উচ্চারণ মুহূর্তে সে শব্দটির আধখানা প্রকাশ করিয়া প্রতিবার দম লইত, ফলে তাহা শ্রোতার কানে ধরা দিত দুইটি অংশে : অনাথ বন্ধু। যেন-বা প্রথম অংশটি তাহার নাম আর শেষটুকু দাস-ঘোষ-মিত্র মার্কা পদবী। চমৎকার একটি সেকুলার ব্যবস্থা সন্দেহ নাই।

অনাথ বন্ধু কদাপি নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা পছন্দ করেন নাই, এবং··· একখানি আস্ত জীবনের মনিব হওয়ার ঝকমারি যে কতদূর অনাথ বন্ধু তাহারই এক জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত।

মানুষের সাজসজ্জা ও পারিপাট্য তাহার হৃদয়ের, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতকে গোপন করিতে পারে না। অনাথ গলপচ্ছলে বহু তালেবর লোকের এমন সব ঘটনার কথা বলিয়া থাকে শুনিলে তাজ্জব বনা ছাড়া উপায় থাকে না। কাউকে দেখিয়াছে হঠাৎ সঙ্কটে প্যান্টুলুন হলুদ করিতে, কারও নাকি ঘুমের মধ্যে দুই কষ বাহিয়া লাল গড়ায়, দোর্দণ্ডপ্রতাপ একজনকে স্ত্রীর ধমকে ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে পর্যন্ত দেখিয়াছে।

সভ্যতা শব্দটি ও তাহার নানান রূপের মোড়কে আমরা যে অনাথ সেইটি গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। যত বেশি যন্ত্র গড়িয়াছি, ততই আপনকার বিপন্নতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গোরুর বাচ্চা তাহার মা-এর পেট হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র লাফাইতে থাকে আর মানুষের বাচ্চার শুধু হাঁটাটুকু শিখিতে লাগে দুইটি বৎসর। শারীরিক দুর্বলতার ঘাটতি মিটাইতে লিভার, হাতল, কপিকল ইত্যাদির উদ্ভাবন, যদিও শেষপর্যন্ত আমরা ইঁদুরবৎ ধরা দিতেছি ঐ সব কলে। সমস্ত কল ও যন্ত্রাদি সরাইয়া লউন, তারপর নিজেকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করুন, আপনার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুর পরিবর্তে রক্ত বাহিবে, একমাত্র তখনই উপলব্ধি করিবেন দীনদুনিয়া শব্দটির তাৎপর্য।

ঠোঙা নামক হস্তশিল্পের নিদর্শনটির সঙ্গে সকলেই পরিচিত, অতএব বুঝতে পারছেন এটি পাঠ্যবস্তু হিসাবে টুকরো-টাকরা, অংশ, খণ্ডিত। যতদূর উদ্ধৃত করা হল ঠোঙার একটি পিঠ এখানেই শেষ এবং অপরপিঠ কন্টিনিউয়েশন হলেও মাঝে অনেকটা ফাঁক আছে, ঐ ফাঁক কল্পনা দিয়ে পূরণ করতে হবে।

ঠোঙা / ২

'অনাথবন্ধু' পাকেচক্রে এই নামপদ সমেত সে প্রায় একটি জীবন্ত দর্শন হইয়া উঠিয়াছিল, যেমত কমিউনিস্ট, ফেমিনিস্ট ইত্যাদি হইয়া থাকে। অনাথ বন্ধু একখানি কেতাব লিখিবে সংকল্প করিয়াছিল বটে কিন্তু এই কাজে সে বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার বিবেচনায় বৃক্ষসকলের মতো নয় বলিয়া, শিকড় নাই বলিয়াও মানুষ অনাথ ভাসমান। যেজন্য কোনো তত্ত্ব, চিন্তা ও দর্শন সে দীর্ঘদিন আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে না। এই অন্ধ পরিব্রাজক কোথায় যাইতেছে তাহা উত্তমরূপে জানে না, কখন মোড় ঘুরিবে তাহাও জানে না অথচ তাহার অগ্রগমনের শেষ নাই। ফলতঃ যাহা সে আজ ভাবিতেছে কল্য তাহা নস্যাৎ করা ভিন্ন ইহার কিছুই করার নাই। কালরূপ অগ্নিতে নিজেকে, নিজের সৃষ্টিকে ক্রমাগত নিক্ষেপ করাই এই শিশুর ধর্ম

ঠোঙা শেষ, মানে ঠোঙার কথা আর কিছু নেই। কিন্তু এই দুটি অংশ সংযোজনের পর বেশ ভয় লাগছে, বিপন্ন বোধ করছি। যুক্তি সংস্কার সর্বাত্মক, সর্বগ্রাসী বলে নিশ্চয়ই তর্জনী তোলা হবে কেন বেহুদা এইসব (কায়দাবাজি) করা। সত্যিই তো এসব করতে গেলাম কেন এই প্রশ্নে আমিও বিব্রত এই মুহূর্তে। সে কি এইজন্য যে, আমরা দীনের দুনিয়াকে ভেঙে গড়ে চলেছি নিয়ত, আমাদের চিন্তা শুধুই ভাঙা-গড়া আর এই মাদারি খেলে শিশু সদৃশ আমরা যে বিমল আনন্দ উপভোগ করি সে শুধু এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের নিহিত বিমূর্ততার জন্য, কেবলই অধরা, অসীমের টান···

কবির নিজস্ব ডিকশন, তার ভাষার ব্যক্তিগত ধর্ম কি রচনাটিকে অনাথ করে না? ইতিহাসের বাইরে ঠেলে দেয় না? বা এই প্রক্রিয়া অনাথের পিতা-অন্বেষণ হিসাবেও গণ্য হতে পারে। পূর্ববর্তী সমস্ত লেখকদের ভিড়ে এক তরুণ লেখক তাঁর পিতাকে খুঁজে চলেছেন, পিতাকে সৃষ্টি করে বলেছেন। ঐতিহ্যের এ ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ নেই। ঠোঙার 'অনাথ' শব্দটি একটি চাবি বিশেষ যা দিয়ে অনেক তালাই খুলে ফেলা সম্ভব। □

গ্রন্থসূত্র :

ক. ফাকিং কনশাসনেস অ্যান্ড হিস্টোরিয়া অফ ইমাজিনেশন : জে স্পিভাক অ্যান্ড ইসাবেলা টিউডর, অক্সফোর্ড, ১৯৯০।

খ. আউলিয়া মন : ড. মিতা সেন, পত্র প্রকাশনী, ১৯৪১।

গ. হাউ স্মল ইউ আর : জেনেথ অ্যান্ডারসন, পিকাডোর, ১৯৮৬।

ঘ. কাফকা পেপার্স : এডিটেড বাই ম্যাক্সিমাম ব্রড, আলফা, ১৯৭৯।

ঙ. রিলকে অ্যান্ড হোমোসেক্সুয়ালিটি : জাঁ পল জেনে, গ্যালিমার, ১৯৬৯

চ. রিপোর্ট অন নেটিভ প্লেস ১৯০০-১৯০২।

ছ. হাউ উই ডাই : শেরউইন বি নুল্যান্ড, ছাটো, ১৯৯৫।

জ. দ্য মর‍্যাল অ্যানিমাল : রবার্ট রাইট, সেভেন সিজ, ১৯৯৪।

আকাশকুসুমের রাজনীতি : কালচারাল স্টাডিজ প্রসঙ্গে দু-চার কথা

মানস রায়

[মানস রায়ের ইংরেজি-বাংলা মেশানো পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য এখানে উপস্থাপিত হল। ইংরেজি অংশগুলির শেষে আমার লেখা সরল বাংলা চুম্বক সবাইকে মূল ইংরেজি অনুচ্ছেদগুলি পাঠে উৎসাহিত করবে— এই আশা। লেখককে সমাপ্ত কাজটি দেখানোর সুযোগ ঘটেনি। তিনি এই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে (বিশেষত উপসংহারের অংশটুকু নিয়ে) বিস্তারিত চিন্তা ও অনুশীলনের জন্য প্যারিসে গেছেন। —উৎপলকুমার বসু]

১. মানস রায়ের স্ব-লিখিত প্রস্তাব (মূল : বাংলা)
২. ভাবা'জ ভাবনা (মূল : ইংরেজি)
৩. ভাবা-র ভাবনা (চুম্বক : বাংলা)
৪. ভাবা-র ভাবনা : মানস রায়ের প্রতিক্রিয়া (মূল : বাংলা)
৫ ক. থিয়োরী ইন ক্রাইসিস (মূল : ইংরেজি)
৬. পোস্ট-কলোনিয়ালিটি : অফ টেরিটরিস অ্যান্ড স্ট্রাইফ্স (মূল : ইংরেজি)
৬ ক. উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ : সংঘর্ষ ও স্থানাঙ্ক নির্ণয় (চুম্বক : বাংলা)
৭. ইনটারোগেটিং পোস্ট-কলোনিয়ালিটি (মূল : ইংরেজি)
   ১। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ক্যারেকটার
   ২। এসথিটিসাইজড অ্যাজেন্ডা
   ৩। ডিপ্লয়মেন্ট অফ পাস্ট
   ৪। কোয়েশ্চেন অফ গভর্নমেন্ট
   ৫। পলিসি কনসিডারেশন
   ৬। কনক্লুশন : টুওয়ার্ডস এ নিউ এথিকস্ অফ সোস্যাল লাইফ
৭ ক. উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদকে জেরা (চুম্বক : বাংলা)
   ১। প্রথম-বিশ্ব চরিত্র
   ২। এক নন্দনায়িত বিষয়সূচী
   ৩। অতীতকে কাজে লাগানো
   ৪। সরকার (গভর্নমেন্ট) বিষয়ক প্রশ্ন
   ৫। নীতি নির্ধারণ
   ৬। উপসংহার : সামাজিক জীবনে এক নবনৈতিকতার দিকে যাত্রা।

☐ এক যে ছিল পুকুর ☐

শহর প্রান্তে এক উদ্বাস্তু বসতি। বসতির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে লম্বা টানা রাস্তা। জবরদখল বাড়িগুলির ঠিকানা কলোনীর নামে, কেনা প্লটে বাবু-বাড়িগুলির ঠিকানা অবশ্য রাস্তার নামে। কলোনীর প্রান্তে ছিল এক মস্ত পুকুর।

আকারে আয়তনে সে যেমনি ঢাউস, মেজাজও ছিল তার আর-দশটা পুকুরের চেয়ে আলাদা। এসবই আমার ছেলেবেলার ফেলে আসা কথা। স্কুলে যাবার পথে দেখতাম পুকুরের একধারে ধোপারা কাপড় কাচছে। ভাসছে হাঁস, কোথাও বা হয়তো বাচ্চারা জলে লুটোপুটি খাচ্ছে। পুকুরের গায়ে কোথাও পড়েছে হিজল-বটের শ্যামলা ছায়া, কোথাও বা কচুরি-পানার মাঝে বেগুনি ফুল।

এসবের অনেকটাই আজ ইতিহাস। পুকুরটা ছিল স্থানীয় মাফিয়া জমিদার সরকার-মশায়ের। বিস্তর প্রতিপত্তি ও অনেক লেঠেল সত্ত্বেও উদ্বাস্তুস্রোতের কাছে তিনি হার মানতে বাধ্য হন। বিকিয়ে যায় একেবারে বিনামূল্যে তাঁর সাম্রাজ্যের সিংহভাগ। দিশেহারা অথচ ঐক্যবদ্ধ মানুষের কাছে তাঁর লেঠেলদের মুহুর্মুহু হানাদারি কোনো কাজে আসে না। এসব কথা আজ লোকস্মৃতি।

আমরা বড় হয়ে যে সরকার-মশাইকে দেখেছি তাঁকে দেখে পুরনো মানুষটাকে চেনার উপায় নেই। বিষয়-সম্পত্তি খুইয়ে তার চেহারায় তখন গভীর উদ্বাস্তু-ছাপ। যাক, যে-কোনো কারণেই হোক ভদ্রলোক মারা যাবার আগে ঐ পুকুরটা কলকাতা করপোরেশনকে দিয়ে যান। শর্ত ছিল, করপোরেশন পুকুরের দেখভাল করবে, তৈরি হবে একটা সুইমিং পুল এবং আরো কত কী।

পুকুরের শেষ প্রান্তে পাড়ার বাজার। পাড়ার বাজার হলেও তার চেহারাটাও ছিল বেশ বড়সড়, কারণ বে-পাড়ার লোকেরাও অনেকে আসত। মেজাজে কিছুটা গ্রামীণ এই বাজারে ঢুকতেই পাওয়া যেত সোঁদা গন্ধ। শুধু মাছের বাজারটা ছিল বাঁধানো। আর আলু-পেঁয়াজ-রসুনের একটা চত্বর ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার, যেখানে খবরের কাগজ জড়ানো বাল্ব জ্বলত।

সাতাত্তরে গেল সব পালটে।

নতুন এম. এল. এ এলেন। তিনি মন্ত্রী হলেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঐ বাজারটিকে ভেঙে ফেলা হল। কেউ কিছুই বলল না, কেননা তখন স্বপ্ন দেখার কাল। ওখানে মাল্টি-স্টোরিড পাকা বাজার গড়বে। শুরু হল মাটি কাটা, লরি ভর্তি এল ইঁট, সিমেন্ট, বালি, লোক, লোহা-লক্কর। প্রথম ক'দিন কাজকর্ম, হৈ হৈ চলল। তারপর নিস্তরঙ্গ ভাঁটা।

উনিশশো পঁচানব্বইয়ে আজ দেড়তলায় দাঁড়িয়ে আছে প্রতিশ্রুত মাল্টিস্টোরিড শপিং কমপ্লেক্স। 'নিস্তরঙ্গ' বলাটা বোধহয় ঠিক নয়, মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে যখন ও-চত্বর দিয়ে হেঁটে যাই তখন দেখি দু একটা মিস্ত্রি কী যেন ঠুকঠাক করছে।

কিন্তু বাজারটা তো আর হারিয়ে যেতে পারে না। বরং বাজার দিন দিন আয়তনে বড় হয়। ওটা এখন চলে এসেছে ঐ পুকুরের ধারে, বড় রাস্তার দুপাশে এবং এই মুহূর্তে পুকুরের ঠিক বুকের ওপরে। 'বুকের ওপর' কারণ, করপোরেশনের রক্ষণাবেক্ষণের ধাঁচটা অনেকটা শেয়ালের কুমিরছানা প্রতিপালনের মতোই। শহরের যাবতীয় জঞ্জালে পুকুরের অর্ধেকটা অচিরেই ভরে যায়। এতে সরকার মশাইয়ের ছেলে হাইকোর্ট থেকে ইনজাংশান নিয়ে আসেন। ফলত, জঞ্জালের ট্রাকগুলোর যাতায়াত কমে আসে, মাঝে মাঝে অবশ্য এখনো দেখি সন্ধ্যার দিকে তাদের আনাগোনা।

ঐ জঞ্জালের ওপরেই আজ উঠে এসেছে মাছের বাজার এবং মূল বাজারের আরও কিছু অংশ। দিব্যি কেনা-বেচা চলেছে। জঞ্জাল থেকে কুকুরের দল দৌড়ে আসে মাছ বা মুরগির নাড়িভুঁড়ির লোভে। জঞ্জালে নিয়ে গিয়ে তা তারিয়ে তারিয়ে খায়। শুনতে পাই আঞ্চলিক কাউন্সিলারের পুত্রস্বয় প্রোমোটার। এ সব গুজবও হতে পারে। লোকজন এখন মোটামুটি অভ্যস্ত ঐ দুর্গন্ধের সঙ্গে। শুধু প্লেগের দিনগুলোতে আশেপাশের লোকরা জঞ্জালের মূষিকবর্গের উপর চটে গিয়ে কয়েকটাকে পুড়িয়ে মারলে— তা খবরের কাগজের রিপোর্ট হয়।

অ্যাবস্ট্রাকশনের মতো জাহাজী ব্যাপারে নিতান্তই আদার গল্পে পাঠক নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত। এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে অ্যাবস্ট্রাকশনের চালচলন প্রসঙ্গে দু-চারটে মামুলি কথা বলতে চাই। আকাশকুসুমের স্বপ্ন যেমন একটি অধিকারের প্রশ্ন, তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রও বটে। উত্তর-ঔপনিবেশিকতার তত্ত্বচর্চাকে সামনে রেখে আকাশকুসুমের সঙ্গে ক্ষমতার প্রশ্ন কী— তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানবিরোধী জ্ঞানক্ষেত্রে ক্ষমতার বিক্ষেপ আর পাঁচটা জ্ঞানক্ষেত্রে ক্ষমতার বিক্ষেপের মতোই। এবং প্রত্যেক জ্ঞানক্ষেত্রের মতো এখানেও ক্ষমতার রূপ তার নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্যে হাজির। পাঠককে বলে রাখা ভাল এই লেখা আমার পরবর্তী কাজের ভূমিকা মাত্র। অর্থাৎ পাঠক কোনো বিস্তারিত বিশ্লেষণের আশা করবেন না। প্রবন্ধটি যদি কোনো তর্কের সূচনা করে তাহলেই আমি খুশি।

উত্তর-ঔপনিবেশিকতা-বিষয়ক লেখাপত্রে স্বনামধন্য হোমি ভাবা-র সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধের কতকগুলি অংশ নিচে উদ্ধৃত হল। অ্যাবস্ট্রাক্ট চিন্তায় ভাবা যে অত্যন্ত সুপটু উদ্ধৃতিগুলি তার পরিচয় বহন করে :

□ ২. Bhaba's Bhabna □

Homi Bhaba in his article : 'Freedom's basis in the Indeterminate' (October, 1994) has drawn out elegantly the lines of abstraction within which Postcolonial arguments operate. I quote liberally from his paper :

Postcolonial criticism bears witness to the unequal and uneven

forces of cultural representations involved in the contest for political and social authority within the modern world... Their critical revisions are formulated around issues of cultural difference, social authority and political discriminations in order to reveal the antagonistic and ambivalent moments within the "rationalizations" of modernity. To assimilate Habermas to our purposes, we could also argue that the postcolonial project, at its most general theoretical level, seeks to explore those social pathologies— "loss of meaning, conditions of anomie"— that no longer simply cluster around antagonistism, but break up into "widely scattered historical contingencies"...

This reconstitution requires a radical revision of the social temporality in which emergent histories may be written : the rearticulation of the "sign" in which cultural identities may be inscribed. And contingency as the *signifying sign* of counterhegemonic strategies is not a celebration of 'lack' or 'excess' or a self-perpetuating series of negative ontologies. Such indeterminism is the mark of the conflictual yet productive space in which the arbitrariness of the sign of cultural signification emerges within the regulated boundaries of social discourse....

Culture as a strategy is both transnational and translational. It is transnational because contemporary postcolonial discourses are rooted in specific histories of cultural displacement : in the "middle passage" of slavery and indenture ; in the "voyage out" of the colonialist civilizing mission ; in the fraught accommodation of postwar 'third world' migration to the West ; or in the traffic of economic and political refugees within and outside the Third World...

It has been my growing conviction that the encounters and negotiations of differential meanings and values within the governmental discourses and cultural practices that makes up 'colonial' textuality have enacted many of the problematics of signification and judgement that have become current in contemporary theory : aporia, ambivalence, indeterminacy...

How does the deconstruction of the sign, the emphasis on indeterminism in cultural and political judgements, transform our sense of the subject of culture and the historical agent of change ? If we contest the grand, continuist narratives, then what alternative temporalities do we create to articulate the contrapuntal (Said) or interruptive (Spivak) formations of race, gender, class and nation within a transnational world culture ?

□ ৩. ভাবা-র ভাবনা (বাংলা চুম্বক) □

হোমি ভাবা তাঁর এক প্রবন্ধে বিমূর্ততার চমৎকার লাইন টেনে এমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন যেখানে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুক্তিতর্ক ক্রিয়াশীল :

আধুনিক সময়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক সমালোচনাদি পাঠে আমরা জানছি যে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নির্বাচনে সংস্কৃতির একটা বিরাট ভূমিকা আছে— যে-ভূমিকা অসম ও অ-যথাযথ এবং খুলে দেখা যে আধুনিকতার 'যুক্তিবাদ' স্ব-বিরোধ ও অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। হাবেরমাস-কে এই আলোচনায় টেনে এনে এমনও বলা চলে যে উত্তর-ঔপনিবেশিক ক্রিয়াকাণ্ড, সাধারণভাবে দেখলে, যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে তা হল সামাজিক বিকারতত্ত্বের নানা রূপ— যেমন অর্থহীন জীবন, মূল্যবোধের বিলুপ্তি। এগুলি, সরলভাবে কোনো বিরোধাভিত্তিক কেন্দ্রকে ঘিরে সংগঠিত হয়নি, বরঞ্চ ইতিহাসের দূরদূরান্তে এলোমেলোভাবে ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে।

এগুলিকে একত্র করে নতুন ইতিহাস লিখতে হলে সামাজিক সমসাময়িকতার আপাদ-মস্তক নতুন বিবেচনা দরকার। সাংস্কৃতিক পরিচয়চিহ্নগুলির নব ভাষ্য দরকার।

সংস্কৃতিকে যদি কাজের ছক (স্ট্র্যাটেজি) হিসেবে গণ্য করি তবে দেখব এটি দেশসীমা অতিক্রমকারী এবং অনূদিত হতে পারে। অনূদিত হওয়ার তাৎপর্য এই যে সংস্কৃতির স্থানান্তরণের ইতিহাসেই আজকের উত্তর-ঔপনিবেশিক তর্কবিতর্কের শিকড় লুকিয়ে আছে : 'মধ্যপথবর্তী' দাস ও নরব্যবসার যুগ ; 'সমুদ্রপথে' বেরিয়ে-পড়া ঔপনিবেশিক সভ্যতার মিশন ; মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে তৃতীয় বিশ্বের বিপদসঙ্কুল পশ্চিমাভিমুখী গমনপথ ; অথবা তৃতীয় বিশ্বের ভিতরে এবং বাইরে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে উদ্বাস্তু মানুষের যাত্রা…

কীভাবে এইসব চিহ্নগুলির ভাঙাভাঙি এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিধানের অনিশ্চয়তার উপর জোর দেওয়ার ফলে, সংস্কৃতির বিষয় (সাবজেক্ট অফ কালচার) এবং পরিবর্তন সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণা পাল্টে গেল ? যদি আমরা বিশাল, বহমান এক ধারাভাষ্যকে সন্দেহ করি তাহলে আমরা কী ধরনের বিকল্প পার্থিব-জ্ঞান (টেম্পোরালিটি) তৈরি করব যা দিয়ে দেশসীমা অতিক্রমকারী জগতসংস্কৃতিতে গোষ্ঠী, জাতি, লিঙ্গ এবং শ্রেণীর বিষম-সমন্বয় (কনট্রাপাঙটাল : এডোয়ার্ড সাঈদ) বা বিঘ্নিত স্তরগুলি (গায়ত্রী স্পিভাক) বোঝা যাবে ?

□ ৪. মানস রায়ের ঐ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া (মূল বাংলা) □

হোমি ভাবার রচনা থেকে নেওয়া এই উদ্ধৃতিগুলি উত্তর-ঔপনিবেশিক লেখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে ধরা যেতে পারে।

অথচ এখানে কালচারাল স্টাডিজ-এর যে-কক্ষপথ চিহ্নিত হয়েছে তাতে কি উদ্বাস্তু এলাকার ঐ নির্বাসিত পুকুর স্থান পাবে ?

যদি না পায় তাহলে কালচারাল স্টাডিজ-এর জ্ঞান-ক্ষমতার রাজনৈতিক স্বরূপ কী ?

উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদীরা ঐ প্রায়লুপ্ত পুকুরের 'ঐতিহাসিক বর্তমান' (হিস্ট্রি অফ দ্য প্রেজেন্ট) রচনায় আগ্রহী হবেন না কারণ এখানে শুধু পশ্চিমী জ্ঞানদীপ্তির (এনলাইটেনমেন্ট-এর) সর্বগ্রাসী শিকারের কথা বলে দায় সারা শক্ত।

অন্যদিকে মার্ক্সিস্ট-রা এই পুকুর-হত্যাকে নিতান্তই সয়ে-যাওয়া অভিজ্ঞতা (লিভ্ড এক্সপিরিয়েন্স) বলে উপেক্ষা করবেন। উৎপাদনের চরিত্র-ব্যাখ্যা ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তাগিদে ইতিহাসের এইসব মহান অভিযাত্রীরা পথের ধারে পড়ে-থাকা যা-কিছু তার দিকে না তাকানোই শ্রেয় মনে করবেন।

বিমূর্ত তার এমনই তীব্র প্যাশন !

অথচ এই সাদামাটা পুকুরকে নিয়েই লেখা যেতে পারে জমিদারী আমল থেকে প্রোমোটার-রাজের বংশলতিকা (জিনিওলজি)। অ্যাবস্ট্রাকশন-এর রাজকীয়তা, ইতিহাসের ঘটনাপটীয়সী (কনটিনজেন্ট) ঘাত-প্রতিঘাত, কতটা সহ্য করতে পারবে—তা অবশ্য অনুমানের ব্যাপার।

□ ৫. Theory in Crisis □

Caught between panoptic surveillance and carnivalesque libertarianism, cultural theory paradigm today faces nothing short of a crisis in the West. For an ex-colonial formation like India, this crisis is even more acute. Some of the reasons for this are : absence of any entrenched tradition of cultural theory, the rise of Hindu militant chauvinism as an alternative cultural identity movement ; the fall of Soviet Marxism that to some extent served as an inspiration for theory and policy thinking in India since the early 50s ; and the recent move towards an open-door liberalizing economic policy and the plunge into service and information sectors as a way of containing the prevailing crises of a bureaucratically nurtured, largely semi-feudal society. Partly as an attempt to work towards a new paradigm, the project proposes *to re-write the thesis of postcoloniality*.

If the burgeoning literature in this field is any indication, not only has postcoloniality gained access to academia with a remarkable degree of success in a rather short period of time, as a 'frame-work of sense' (to use a rather unfavorable expression), it has also emerged as a primary contester of European post-enlightenment rationality. Bent on deconstructing the concept and the authority of the 'West' and the assumed supremacy of the Western knowledge apparatus, postcoloniality has taken as its task the unveiling of the history of European colonialism as determining both the institutional conditions of knowledge as well as the terms of contemporary institutional practices. Here lies its undoubted relevance for cultural studies. Like postmodernism, it is both a new paradigm and if its claims of interstitial mode of operation are to be taken seriously, also the end of paradigmatic thinking. Unlike postmodernism (or at least some of its transatlantic versions), however, it tries to grapple with the problem of past and the profound obstacles that complicates such enterprise.

I, however, contend that there is a serious need to rewrite post-coloniality. This is because of its *first world agenda*, its *aestheticizing approach to culture*, its *specific deployment of history/histories* that at times tends to get precariously close to an originary mode of analysis, its neglect of *the question of government* and the virtual absence of any *policy axis*.

I plan to investigate, briefly, postcoloniality as an emerging form of disciplinarity, For the proposed re-writing, I intend to interrogate the field in terms of different thematics.

☐ ৫ ক. তত্ত্ব পড়েছে সমস্যায় (বাংলা চুম্বক) ☐

পশ্চিমে কালচারাল থিয়োরী-র তত্ত্বকাঠামো (প্যারাডাইম) আজ এক সমস্যার সম্মুখীন। একদিকে তাকে নজরে রেখেছে সদাজাগ্রত সর্বদৃশ্যনিরীক্ষণকারী চোখ এবং অপরদিকে টানছে সোভিয়েত মার্কসিজম-এর পতনের ফলে 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন'-গোছের উচ্ছ্বাসের স্রোত। ভারতবর্ষ, যা একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক সংগঠন, সেখানে সমস্যা আরো জটিল। এর কয়েকটি কারণ হল

— দেশের মধ্যে দেশজ সাংস্কৃতিক তত্ত্ব-ঐতিহ্যের অভাব,

— মারমুখী হিন্দু মৌলবাদীদের একদেশদর্শিতাকে বিকল্প সাংস্কৃতিক চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা,
— পাঁচ দশক ধরে যে সোভিয়েত মার্কসিজম অন্তত কিছুটা তাত্ত্বিক দিকনির্দেশের প্রেরণাসঞ্চার করেছিল— তার পতন,
— সম্প্রতিকালের মন্বন্তর অর্থনীতি, এবং
— আমলাতন্ত্র-শোভিত এক আধা-সামন্ত ভারতীয় সমাজের সমস্যাবলীকে ইনফরমেশন প্রযুক্তির ব্যবহারিক চাকচিক্য দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা।

আমাদের উদ্দেশ্য এক নতুন তত্ত্বকাঠামোর প্রস্তুতি।

অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর-ঔপনিবেশিক রচনাবলী আমাদের পাঠসূচীতে স্থান করে নিয়েছে। 'আবেগসংপৃক্ত নক্সা' হিসেবে দেখলে (কিছুটা বিরূপভাবে) এগুলি, অর্থাৎ উত্তর-ঔপনিবেশিক রচনাদি ইয়োরোপীয় উত্তর-জ্ঞানদীপ্তির (পোস্ট-এনলাইটেনমেন্ট-এর) যুক্তিবাদকে বা র‍্যাশনালিটিকে চ্যালেঞ্জ করছে। পশ্চিমের আধিপত্য এবং তথাকথিত পশ্চিমী জ্ঞানযন্ত্রের কলকব্জা খুলে দেওয়ার জন্য এবং সেই সঙ্গে তার কলোনিয়াল অতীতের সূত্রে জ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক করে তোলার চেষ্টা এবং আজকের জগতজোড়া প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের শর্তাদি কেবল পশ্চিম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে— এমন ধারণাকে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর।

উত্তর-আধুনিকতার মতো উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদও রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশকারী এবং তার সেই প্রবেশের দাবিকে গুরুত্ব দিতে হয়। তার মতো এটি-ও এক নব তত্ত্বকাঠামোর এবং সেই সঙ্গে তত্ত্বকাঠামো-নির্ভর চিন্তারও অবলুপ্তি।

আমি অবশ্য বলব যে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের পুনর্লিখন দরকার। বিভিন্ন দিক থেকে আমি এই পুনর্লিখনের চেষ্টাকে বিবেচনা করে দেখতে চাই।

□ ৬. Postcoloniality : of territories and strifes □

At the moment, there does not seem to be any agreement about what postcoloniality is, or even where it is. For Seid, the terrain of the postcolonial is resolutely global, engaged as he is in dismantling the 'science of imperialism'. For Spivak, of primary interests are the heterogeneity of colonial power, the complicity of opposition and the contradictory modes of address of colonialism that constitute an ambivalently positioned colonial subject. Fanon's politics (now somewhat dated) centres around the internalization and refraction of the colonizer's address, the denial of the right to subjectivity. Bhaba's concern is the impossibility of symmetrical antagonisms, [the spill-overs in 'self/other' constructs] and as such

his position is somewhat close to that of Spivak. For Dipesh Chakraborty, it is a matter of 'politics of despair' (valorized, no doubt). Openly narcissistic, it talks of the problems of having to navigate through history with tools and concepts obviously suspect.

One of the first targets of the project is to *map the terrain* of postcoloniality — its aims, resonances, methods of operation and internal contradictions. This is not in the spirit of a search for a *constituting essence*, the very approach that postcoloniality problematizes as 'eurocentric'. Since all ideological battles are not just about history but in and through history, the attempt to impose a rationally constructed, uniform calculus may result in massive fetishization. Instead, my attempt to map the territory is more in the spirit of interrogation with a set of specific targets. These are : its (alleged) first world character, it aesthetizing mold, its mode of deployment of past, its neglect of the question of governmentality and its lack of any policy orientation.

As mentioned earlier, part of my aim for mapping the terrain is to focus on the emerging forms of disciplinarity of this avowedly anti-disciplinary field of knowledge. Here discipline is viewed as the possibility condition, a principle of limitation — the ins and outs, the principles of inclusions and exclusions, as well as the set of vocabularies, the boundary work (intellectual eco-systems, as it has been termed), the infrastructural set-ups, journals, funds, and networks, etc.

☐ ৬ ক. উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ : সংঘর্ষ ও স্থানাঙ্ক নির্ণয় ☐

উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ বলতে কী বোঝায় বা কোথায় গেলে এর দেখা পাওয়া যাবে — এ-নিয়ে মতভেদ আছে। এডোয়ার্ড সাঈদের মতে উত্তর-ঔপনিবেশিক ক্ষেত্র অবশ্যই পৃথিবীব্যাপী কারণ তিনি যে-বিজ্ঞান উপনিবেশ তৈরি করে তাকে ভাঙতে চান। গায়ত্রী স্পিভাক-এর প্রধান লক্ষ্য হল ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সংমিশ্রণ, বিরুদ্ধবাদীদের সেই মিশ্রণের সঙ্গে আঁতাত এবং ঔপনিবেশিকতার নানা ভঙ্গিতে কথা বলার ফলে উপনিবেশবাসীদের (কলোনিয়াল সাবজেক্ট-দের) অনিশ্চিত অবস্থা। ফ্রানজ ফ্যানন (কিছু পুরনো হয়ে গেলেও) জানতে চান কলোনাইজার বা উপনিবেশ

সৃষ্টিকারীদের ভাষা কীভাবে উপনিবেশবাসীরা আত্মস্থ করেছে এবং বাঁকিয়ে চুড়িয়ে নিয়েছে। তার ফলে, উপনিবেশবাসীরা বিচ্যুত হয়েছে তাদের স্বভাবজ চিন্তাপদ্ধতি থেকে। হোমি ভাবা বলছেন, 'একের বিরুদ্ধে এক' এই প্রতিসাম্যের (সিমেট্রিক্যাল) ঝগড়া অসম্ভব এবং স্ব/অপর (সেল্‌ফ/আদার) বিতর্কের পাত্র উপচে পড়ছে। একদিক থেকে দেখলে হোমি ভাবার বক্তব্য গায়ত্রী স্পিভাক-এর চিন্তার কাছাকাছি দাঁড়ায়। দীপেশ চক্রবর্তী বলছেন, উত্তর-ঔপনিবেশকতাবাদ এক 'অসহায়ের রাজনীতি' যাকে, নিঃসন্দেহে গৌরবান্বিত করা হয়েছে। খোলাখুলিভাবে বলতে হয়, তাঁর প্রস্তাব আত্মরতিমাত্র (নারসিসিস্‌টিক)। তিনি ইতিহাসচর্চায় ব্যবহৃত পুরনো ধারণা এবং কলাকৌশলকে সন্দেহ করছেন।

আমাদের প্রথমে দরকার উত্তর-ঔপনিবেশিকতার একটি মানচিত্র। আমরা চাই এর উদ্দেশ্য, এর ব্যঞ্জনা এবং এই সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি ও আভ্যন্তরীণ বিরোধের খসড়া। এই দাবি কোনো মৌলিক নির্যাস (এসেন্স) খোঁজার আবেগ থেকে জন্ম নেয়নি। আমার এই মানচিত্র নির্মাণের প্রেরণার কারণ হল আমি কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে বিবেচনা করে দেখতে চাই। এগুলি হচ্ছে :

—উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রথম-বিশ্ব চরিত্র,

—এর নান্দনিক ধাঁচ,

—অতীতকে এ কীভাবে বিন্যাস করে,

—সরকারী শাসনব্যবস্থাকে এর গবেষণায় না আনা,

—কোনো কার্যব্যবস্থার বা পলিসি-র দিকে এর না যাওয়া।

□ ৭. Interrogating Postcoloniality □

১. **First World Character :** The present agenda of postcoloniality is markedly first world in character, In its deployment of the concept-metaphor, core/periphery, and in its overwhelming concern with the politics of 'othering', its unspecified territorial and subject constituting project, postcoloniality targets as its space of operation the first world scenario of cultural politics. The inadvertent (?) result of this ballet of metropolitan ego rivalries (of which post-coloniality is a part, even if as an adversary) is the reduction of peoples of the periphery as faceless entities, helpless expectants of metropolitican cultural games, thus occluding historical particularities and markedly different positionalities as well as different programmes of population formations. What is especially debilitating is that much of postcolonial politics goes 'in the name of' the third world,

while precious little is offered even as translation devices or bridge-heads.

By portraying the Occident as a smooth and homogeneous totality, postcoloniality is trapped in a complicit relation with what it contests, ie., Orientalism— the fusion of historically antagonistic ideological grooves into an organic whole and the division of the world in the binary terms of nativism and modernity. In the case of postcoloniality, it takes the form of a nostalgic return to native ethos in the face of a corrupting, overriding modernism. The masquerading of this 'valorized nativism' is quite often accompanied with and justified by, strange as it may sound, a large-scale importation of Continental academic jargons (via the USA). The roots of such paradox lie squarely in the peculiar positioning of literary-critical production in our country and a cultivated obfuscation of the intricate and crucial mediations that connect cultural engagements with other societal processes, the choices and options at a particular point of history. As a matter of fact, postcolonial criticism's endeavour to retrieve the many bodies of history lost in the imperial glare of totality, its attempts to locate sources of rupture and resistance in the past goes very well with the mores of diasporic imagination. In fact, I argue, at the very heart of the postcolonial enterprise is the inscription of diaspora, defined as a process of reconstruction of identities based on assimilation, hybridization and resistance, a memory-work of cultural return. As a result, the history of present that postcoloniality writes and the present that one experiences in India seem to be on very different registers. Postcoloniality's Calcutta (Dipesh Chakraborty's Garbage essay as an instance, where the municipal corporation's failure to deal with the city's waste is made to look like a sign of protest against the metropolitan notion of cleanliness and celebrated as a possible inauguration of a different mode of aesthetics) is not the same Calcutta one experiences as its citizen.

The synchronic expansion of concerns that cultural studies has brought about in its wake— questions of gender, social categories,

locality, ecology, etc—and the corresponding emphasis on qualitative techniques, heuristic approach, multiple options, primacy of values and what has been described as 'the ordinary dimension of meaning' (de Chertieu) is no doubt welcome and have their own specificities and histories. These trends, however, need to be situated on the broader context of macro social changes— for instance, the failure of technocratic elites to garner support for economic growth which forced them to consider other groups even as the West's first blush of romance of living with 'others' in its own lands is fast fading out, the transition from a hierarchical fordist society to a corporatist order where networks conceal power relations, the reversal of roles between the public sector and private corporations (the former too keen to imbibe as its primary legitimation the 'efficiency-model' of the latter, which in its turn promotes the new ethos of community and horizontality in workplace and shapes itself as the administrator of social bonds and dispenser of public service benefits), the emergence of electronic public sphere that thrives on the principle of inclusion and lived experience unlike the preceding bourgeois public sphere that operated by keeping large constituencies outside its purview, and the sporadic eruption of 'micro resistances' to be read alongwith the new modes of surveillance that privilege "scattered, tactical and 'do-it-yourself' creativity".

২. **An Aestheticized Agenda :** Like much of cultural studies, postcoloniality's style of analysis lie deep in post-Kantian European aestheticism, particularly of the German variety, which in a nut-shell can be characterized as transforming political realities into occasions for moral critique and whose profundity simply under-estimates the mundane or 'worldly' nature of the governmental. Moving between a series of exemplary oppositions, postcolonial critique is characterized by perpetual dialogue, continual negotiations and transcendence of mundane politics in the form of cultivation of indeterminacy. This explains the unreachable character of its critique as well as its attempt to define the cultural question solely in terms of the question of symbolic production, its strategies of

intervention that take the form of textual insurrection, not very dissimilar to the 'semiotic terrorism' practiced by the high-priests of film theory in the early 70s.

One of the results of this exclusive focus on the *question of representation* (at the cost of social representation) is an undervaluation of the importance of the state. Admittedly, with the setting up, at national, regional and international levels, of new forms of organization of production and distribution better suited to global logic, and the corresponding rise of a new technocratic middle class, the nation-state faces new crises of legitimacy. But this need not be read as the withering away or even the weakening of the state apparatus. In fact, only a 'positive' understanding of the state leads us to such conclusion, since the state is, as it always has been, the site of power whose incessant transactions with civil society, and flexibility and mobility to engage in and partially incorporate economic and social contradictions is the key to its existence. The state does not have an interior that can wither away. The same applies to the various agendas of citizen formation, agendas that have their own traditions and trajectories and are at the same time open to myriad contingencies and imperatives of disparate kinds. This requires detailed micro-level analysis. From my perspective, something like 'cultivation of indeterminacy' can well be a technology of the self (and a quite valid one, at that) but as a strategy (that too a sole one) for understanding, engaging and working towards social change is not only inadequate but can also be politically profoundly disabling

৩. **Deployment of Past :** For Fanon, plunging into the chasm of the past is the condition and source of freedom. Partly as a move against such position, Spivak warns us against the nostalgia for lost origins as a basis for counter-hegemonic ideological productions. But by assigning an absolute power to hegemonic discourse in constituting and disarticulating the native, by reading ex-colonial subjectivity solely in terms of the nexus of colonial past and neo-colonial present, Spivak's too is a profoundly originary discourse. There is

no denying that western nations destroyed complex societies, instituted a mechanism of surplus appropriation and then wrote histories which placed the West at the pinnacle of civilization. Postcoloniality rejects Marxism's characteristic mode of foregrounding an escatological notion of history. Instead, it proposes to write the colonized back into history, to retrieve the value and dignity of a past transmogrified in Western representations, deconstruct colonialism's discursive field, show trace-routes of the valorized Western canons in the whole process of the creation, subjection and final appropriation of Europe's 'other'. However, with the process of decolonization now in its fifth decade and the internal rifts and rivalries of most excolonial countries assuming marked proportions, it is perhaps time to ask whether and to what extent a mangled past can well be an alibi for a worsening present. Framing the past could get fetishized into a knowledge of essence, a teleology of history.

৪. **Question of Government :** What provides energy to this teleological analysis is the age-old conflation of the vision of philosophy with the object of vision where the theorist acts as the exemplar of the moral self per excellence. By framing 'reflection into self' and 'reflection into other' as a dynamic unity, postcoloniality not only acquires a narcissistic tone, it writes the 'oppressed subject of the Third World' as an anthropological invariant. Indeed, postcoloniality's subject is not an empirical subject. Its onslaught on rationalism leaves little room for any consideration of how rationality is inscribed into systems of practices. In other words, the question of government is not one of postcoloniality's concerns— the shifting ambitions and concerns of all those social authorities that seek to administer lives and associations, the *ensemble* formed by institutions, procedures, analyses and reflections, the series of finalities that work together (even if in a contradictory mode) towards population-formation, the ever-porous borderline between the private and the public. As such postcoloniality has very little to offer in terms of explaining specificities of particular

social conflicts or the *real* changes in power-matrix after colonialism.

৫. **Policy Consideration :** If the writings of Gayatri Spivak, Homi Bhaba and Dipesh Chakravorty are any indication, one can conclude that the more ineffectual, the more abstract and global its target, the more vehement is the tone of postcolonial critique. Our project, however, is committed to the changing shape of the thinkable and hence is primarily interested in locating potential transformations inscribed in what is actually existing. In other works, we privilege the programmatic character of social research. Policy choice is not an either/or game as is often supposed, but an engagement with intricate webs and specific contexts of social reality which we define as a practice of politics and which is where our project situates itself :

৬. **Conclusion : towards a new ethics of social life :**

In conclusion, I ponder on the possibility of privileging such ethical traits as rhetoric, manners and self-empowerment, traditionally associated in the European context with pre-Enlightenment and opposed to modern Enlightenment humanism's notion of will-to-perfection in the form of ideals of self-transcendence. Due to their common Kantian heritage, both Marxism and postcoloniality subscribe, I contend, to the notion of ethics as a matter of principled positions, values and ideals, a perfect state of affairs (in Marxism, a possible future time to be achieved by historical collectivity whose utopic expression is 'not yet', while in the case of postcoloniality, a form of nostalgic aspiration), a transcendent condition that can provide a measure of world's shortcomings. If Enlightenment makes exceptions to general rule and sponsors a universalist nature of ethics, pre-Enlightenment makes inclusions for limited purposes and prefers specific constituencies like woman, warrior, scholar, etc. I am by no means suggesting that pre-Enlightenment ethics is free of problems. Its cult of virility, aristocratic privilege, divine command are some such negative instances. What I however find interesting is its emphasis on habit-formation, on various deportments (ways of

conducting oneself) and the consequent framing of ethics as a de-ontologised realm, in sharp contrast to the Kantian conception of a form-giving intellect and sense-giving feelings. In other words, the importance it gives to qualities and traits that we now conventionally characterize as 'superficial' (as against self-founding ethical goals that are profound by definition) is what interests me in this area.

This is an attempt to re-negotiate (and not to reject) the Enlightenment ideals by bringing back some of the concerns of the renaissance. Needless to mention, I am as yet rather speculative realizing all to well that for an ethical agenda to be successful one needs to discover resonances in the local cultural histories and locate strategies in a fastly changing global milieu. I, however, do see reasons to make a beginning. The writings of Mauss, Elias, Foucault, Hadot, Donzelot, the recent reinterpretations of Weber (particularly by Wilhelm Hennis), and a whole host of contemporary literature, especially of post-Foucaultian variety (Colin Gordon, Ian Hunter, Jeff Minson to name a few, and the *Economy and Society* collective in general) serve as the the theoretical forecourt for a new departure.

☐ ৭ ক. উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদকে জেরা ☐

১. প্রথম-বিশ্ব চরিত্র :

বর্তমানকালে উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদের চরিত্রে স্পষ্টতই প্রথম-বিশ্বের ছাপ আছে। রূপ/রূপক, কেন্দ্র/সীমান্ত, 'অপর' সৃষ্টিকারী (আদারিং) কূটনীতি, বিষয় এবং অঞ্চল নির্ধারণ নিয়ে অনির্দিষ্ট কর্মপন্থা— প্রথম-বিশ্ব নির্মিত সাংস্কৃতিক রাজনীতির চিত্রনাট্যে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ যেন এগুলিই সাজাতে গোছাতে ব্যস্ত।

ফলে, অনিচ্ছাকৃতভাবে (?), প্রথম-বিশ্বে, নিজেদের মধ্যে এক অহং-এর লড়াইয়ে (উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ যার একটা বিষয়) সীমান্তে বসবাসকারী মানুষজন যেন পরিচয়হীন খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্বাতন্ত্র্য এবং স্বভূমি বিচার ও সেই সঙ্গে জনগোষ্ঠী নির্মাণের নানা কার্যক্রম সেজন্য আজ অস্পষ্ট। দুঃখের কথা এই যে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রথম-বিশ্ব রাজনীতি 'তৃতীয়-বিশ্ব'-এর নামেই চলে আসছে এবং দায়িত্ব হস্তান্তরণ বা সেতু নির্মাণের কোনো প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না।

পাশ্চাত্য জগতকে এক মসৃণ, গোলালো চরিত্র দান ক'রে, তার বিপরীতে প্রাচীকে (ওরিয়েন্টালিজম) খাড়া করেছে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ। ফলে, পৃথিবী আধুনিক ও আদিম এই দুই ক্ষেত্রে ভাগ হয়েছে এবং বিকৃত ও বাতিল আধুনিকতাকে পরিত্যাগ করে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ স্মৃতিমেদুর আদি সত্তায় ফিরে যেতে চাইছে। উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ চর্চার কেন্দ্রে মুদ্রিত আছে, আমি বলতে চাই, ছিন্নমূল মানুষের আত্মপুনর্গঠনের চেষ্টাচিহ্ন— যা অঙ্গীভূতকরণ—, মিশ্রণ— ও বাধাদানের সমন্বয়; যেন স্মৃতিপথ ধরে এক সাংস্কৃতিক প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা।

ফলে, উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ যে-বর্তমানের ইতিহাস লিখছে এবং ভারতবর্ষে আমরা যে-বর্তমানকে চাক্ষুষ করি— তাদের হিসেবের খাতা আলাদা।

কালচারাল স্টাডিজ পাঠে আমরা লক্ষ করছি কয়েকটি প্রসঙ্গের সম লয়ে বিস্তার— সাংস্কৃতিক শ্রেণীবিচার, নারী-পুরুষ (জেন্ডার) সমস্যা, স্থানাঙ্কনির্ণয়, পরিবেশচিন্তা, ইত্যাদি। সেই সঙ্গে গুণগত মান নির্ধারণের পদ্ধতির উপর অধিক গুরুত্বদান, অনুসন্ধানী-প্রবৃত্তির বিকাশ, যত মত তত পথ-এর নির্দেশ, মূল্যবোধের প্রাধান্য এবং যাকে বলা যায় 'তাৎপর্যের সাধারণ দিক' ভেবে দেখার প্রবণতা ইত্যাদি কর্মের নিজ নিজ ইতিহাস এবং স্বতন্ত্র চরিত্র নিয়ে আবির্ভাব অবশ্যই শুভ।

২. এক নন্দনায়িত বিষয়সূচী ঃ

ইমানুয়েল কান্ট-এর পরবর্তীকালে ইয়োরোপে, বিশেষত জার্মানীতে, যে-নন্দনচর্চার বিস্তার ঘটেছিল, তারই ভিতর নিহিত আছে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের বিশ্লেষণ-ভঙ্গি। কালচারাল স্টাডিজ-এও অনেকটা তাই, সংক্ষেপে বলা যায় রাজনৈতিক বাস্তবতাকে এক গভীর নীতিমূলক বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো এর উদ্দেশ্য। এই গভীরতা আমাদের দৈনন্দিন ভাত-কাপড়ের সমস্যাকে, অর্থাৎ শাসন-পোষণের প্রশ্নকে (যাকে বলা চলে 'গভর্নমেন্টাল') অবহেলা করে। ফলে, এক অনিশ্চিতি-চর্চার অনুশীলন ঘটছে এবং সে-বাছবিচারের কাছাকাছি যাওয়া যাচ্ছে না। কেবল সাংস্কৃতিক প্রশ্নকে কিছু প্রতীকবিন্যাসে রূপ দেওয়া হচ্ছে মাত্র। রূপান্বিত করার উপর এই জোর দেওয়ার ফলে, রাষ্ট্রবিষয়ে আমরা কম গুরুত্ব দিচ্ছি। একথা অবশ্য মানতে হয় যে আন্তর্জাতিক, জাতিক ও স্থানীয় স্তরে, বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে, আধুনিক বহু প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হচ্ছে। এবং সেই সঙ্গে দেখছি এক প্রযুক্তিপ্রিয় মধ্যবিত্তের উত্থান। পাশাপাশি এ-ও লক্ষ করছি যে বৈধতার ক্ষেত্রে, বা 'লেজিটিমেসি'-র প্রশ্নে, জাতি-রাষ্ট্র (নেশন-স্টেট) নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তার অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা লোপ পেয়েছে অথবা কমে আসছে। রাষ্ট্র, আগের মতোই, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা। এর কোরক ঝরে যাওয়ার নয়। তাই এসব টানাপোড়েন বোঝার জন্য চাই চুলচেরা বিশ্লেষণ। আমার দিক থেকে শুধু এটুকু বলতে পারি যে অনিশ্চিতি-চর্চা হয়তো এক ধরনের আত্মিক প্রযুক্তি (টেকনলজি অফ দি

সেলফ) এবং তার হয়তো যথেষ্ট সমর্থন আছে। কিন্তু কর্মপন্থা হিসেবে তাকে গ্রহণ করলে সমাজকে বোঝা এবং সমাজ-পরিবর্তনের চেষ্টা পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে।

৩. **অতীতকে কাজে লাগানো :**

ফ্রানজ ফ্যানন-এর মতে অতীতের গহ্বরে ঝাঁপ দেওয়ার মধ্যেই আছে মুক্তির শর্ত ও উৎস। এই মানসিকতার বিরুদ্ধে আমাদের সাবধান করে দিয়ে গায়ত্রী স্পিভাক জানাচ্ছেন যে হত অতীতের প্রতি আকর্ষণের ফলে, আমরা, রাষ্ট্রের পরস্পর লড়াইয়ের আদর্শকে জোরদার করছি। একথা অনস্বীকার্য যে পশ্চিমী জাতি অনেক বহুমাত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে, মুনাফা লোটার নানা কৌশল তৈরি করেছে এবং উত্তর-কালে এমন এক ইতিহাস রচনা করেছে যেখানে পশ্চিমী সভ্যতাকেই শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে অভিহিত করা হচ্ছে। মার্কসিজমও চিরাচরিত ইতিহাসকেই শেষ কথা বলে মাথায় তুলেছে। কিন্তু উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ, তাকে অগ্রাহ্য করে, উপনিবেশের লোকদের ইতিহাসে পুনর্লিখিত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমোচনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পাঁচ দশক পরেও আমরা দেখছি নতুন দেশগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং পরস্পরের যুদ্ধবিগ্রহ। সুতরাং এমন প্রশ্ন হয়তো তোলা যেতে পারে যে আজকের এ-অবনতির জন্য আমাদের বিক্ষত অতীত কতটা দায়ী। অতীতকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে আমাদের কাজ এক ধরনের নির্ষাস আহরণকারী বস্তুকাম বা 'ফেটিশ'-এ পর্যবসিত হবে যা তথাকথিত ইতিহাসচর্চার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

৪. **সরকার (গভর্নমেন্ট) বিষয়ক প্রশ্ন :**

যুগ যুগ ধরে দার্শনিকের দৃষ্টি এবং দৃশ্যবস্তুর মিশ্রণের ফলে—যেখানে তাত্ত্বিক নিজেই এক চরম নীতিবাগীশতার উদাহরণ— ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য (টেলিওলজি) বিশ্লেষিত হওয়ার শক্তি উৎপাদিত হয়। 'নিজের মধ্যে প্রতিফলন' এবং অপরের মধ্যে প্রতিফলন'-এর ক্ষমতাশালী সমন্বয়ের ফলে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ শুধু যে এক আত্মরতিপ্রবণ (নারসিসিসটিক) দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে তাই নয়, সে 'তৃতীয় বিশ্বের অত্যাচারিত জনগণকে' নৃতাত্ত্বিক এককে পরিণত করেছে। বস্তুত, উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের বিষয় কোনো 'এম্‌পিরিক্যাল' বা তথ্যানুশ্রয়ী গবেষণা নয়। তৃতীয় বিশ্বের জনগণের ব্যবহারবিধিতে যুক্তিবাদ বা 'র‍্যাশনালিটি' কীভাবে উৎকীর্ণ হয়ে আছে তা দেখার তার সময় নেই কেননা উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ শুরুতেই যুক্তিবাদকে খারিজ করেছে। অর্থাৎ, সরকার-বিষয়ক প্রশ্ন নিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিকতা চর্চাকারীরা ভাবিত নন। ফলে, কোনো সামাজিক বিরোধকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে, অথবা ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হওয়ার পর যে নতুন ক্ষমতাপুঞ্জের 'নেটওয়ার্ক' তৈরি হল, সেসব বিষয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের তেমন কিছু বলার নেই।

৫. **নীতি নির্ধারণ :**

গায়ত্রী স্পিভাক, হোমি ভাবা এবং দীপেশ চক্রবর্তী পাঠান্তে একজন এই সিদ্ধান্তে

পেঁছাতে পারে যে এঁদের রচনার লক্ষ্য যত বিমূর্ত, যত বিশ্বব্যাপক, যত অকার্যকর— ততই উচ্চগ্রামে বাঁধা এঁদের উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদের ভাষা। আমার কর্মপন্থা (প্রোজেক্ট) অবশ্য যা-চিন্তনীয় (থিঙ্কেবল) তার পরিবর্তনশীল গঠনকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে। সুতরাং, যা আজ চোখের সামনে দেখছি তার মধ্যে যে যে সম্ভাব্য পরিবর্তনের চিহ্নসমূহ লিখিত আছে সেগুলির অনুধাবনই প্রথমত প্রয়োজন।

নীতি নির্ধারণ বা 'পলিসি চয়েস'কে প্রায়শ ভুল করে হয়/নয় (ঈদার / অর) খেলা ভাবা হয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত নির্ধারণ আসলে এক জটিল সামাজিক জাল ও বাস্তব ক্ষেত্রবিশেষের সঙ্গে বোঝাপড়া। এই হল রাজনীতি এবং সেখানেই আমাদের 'প্রোজেক্ট'-এর অবস্থিতি।

৬. উপসংহার : সামাজিক জীবনে এক নবনৈতিকতার দিকে যাত্রা :

আলঙ্কারিকতা (রেটরিক), রীতিনীতি এবং আত্মশক্তি সৃজন— এই ছিল জ্ঞানদীপ্তিপূর্ব (প্রি-এনলাইটেনমেন্ট) ইয়োরোপের নৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এদের আজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনা আছে কি? এর বিরোধী হল উত্তর-জ্ঞানদীপ্তি পর্বের (পোস্ট-এনলাইটেনমেন্ট) মানবতাবাদ— যাকে চালিত করে নিখুঁত দক্ষতার অভিলাষ এবং যার আকাঙ্ক্ষা আত্ম-অতিক্রমণে (সেলফ-ট্রানসেনডেনস-এ) প্রকাশ পায়।

আমার বক্তব্য এই যে মার্কসিজম ও উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ দুইয়েরই ঐতিহ্য এক —কান্ট-দর্শন। সেজন্য, আমার ধারণা, উভয়েই নৈতিকতার জন্য এক নিয়মাবদ্ধ স্থান, মূল্য ও আদর্শ নির্ধারণ করেছে। যেন এক ত্রুটিবিচ্যুতিহীন ক্রিয়াকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। মার্কসিজম-এর ক্ষেত্রে আছে এক সুসময়ের স্বপ্ন যা ঐতিহাসিক সমবায়ের ফলে বাস্তব হয়ে উঠবে, কিন্তু 'এখনই নয়'; অপরদিকে উত্তর-ঔপনিবেশিকতার বক্তব্য হল সুসময় ছিল অতীতে। এই তুরীয় (ট্রানসেন্ডেন্ট) অবস্থান আজকের পৃথিবীর দুঃখদুর্দশাকে মাপতে সাহায্য করবে।

জ্ঞানদীপ্তি যদি নৈতিকতার এক বিশ্বব্যাপী (ইউনিভারসাল) রূপকে সমর্থন জানিয়ে থাকে, পূর্ব-জ্ঞানদীপ্তি সেক্ষেত্রে নৈতিকতার জন্য এক সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য এবং বিশেষ বিশেষ মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করেছে— যেমন নারী, যোদ্ধা, পণ্ডিত প্রমুখ। তার মানে এই নয় যে পূর্ব-জ্ঞানদীপ্তির নৈতিকতা সমস্যাবর্জিত ছিল। এর অভিজাতকে সুবিধাদান, বীরপূজা, ঐশ্বরিক নির্দেশপালন ইত্যাদি নঙর্থক দিক আছে। কিন্তু যা আমার উৎসাহ উদ্রেক করে তা হল পূর্ব-জ্ঞানদীপ্তি স্বভাবসৃষ্টির উপর বিশেষ জোর দেয়। ফলে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে নৈতিকতার ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকে— যা কোনো তত্ত্বনির্ধারিত, জ্ঞাননির্দেশিত অনুশাসন নয়। অপরদিকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, 'কান্ট' মতাবলম্বনে বুদ্ধি তৈরি করে আধার এবং সংবেদনশীলতা দান করে চেতনাবোধ।

আমার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য জ্ঞানদীপ্তিকে ছোট করে দেখা নয়। সেই সঙ্গে আমি ফিরিয়ে আনতে চাই 'রেনেশাঁস'-এর যুগের চিন্তাভাবনাকে। আমি ভুলে যাইনি যে আমার নীতিনর্ভর প্রস্তাব তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন স্থানীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের অভ্যন্তরে সে এক অনুরণন শুনতে পাবে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে নিজ কর্মকাণ্ডের সঠিক স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে পারবে। একালের অনেক চিন্তাবিদদের রচনা (নামগুলি ইংরেজি লেখায় আছে), সমসাময়িক গবেষণাদি এবং সমাজ ও অর্থনীতি যে সমবায়িকা তৈরি করেছে— তাই হবে আমার যাত্রারম্ভের তাত্ত্বিক ক্ষেত্র ॥ □

☐ Space donated by a Well Wisher ☐

□

With best compliments from :

LINOBYTE

9C, Gobindapur Road
(Jodhpur Park)
Calcutta-700 045
Phone : 473 0798
A House of Excellence for Computerised
Composition & Offset Printing

□

With best compliments from :

CHAUDHURY & CO.

67/45, Strand Road
Calcutta-700 007
Phone : 238-2850
238-9056
239-0134
237-0502

□

With best compliments from :

Star Tea Company Pvt. Ltd.

[Since 1940]
Retailer Wholesaler & Exporter
8/1 LALBAZAR STREET
CALCUTTA-700 001
Office : 220 0559 / 220 5710 Shop : 248 2630
Branch :
23 R. G. KAR ROAD
CALCUTTA-700 004
Phone : 55-6599
Cable : HINDCHA Telex : 212352 STAR IN

□

With best compliments from :

Office-555
Phone-S.T.D. : 031732.....
Residence-554

GHOSH SERVICE CENTRE

Dealer : Indian Oil Corporation Ltd,
P.O.—Kakdwip, Dist.—24 Parganas (S)

□

With best compliments from :

Minnie Pan Travels Pvt. Ltd.

(A Peerless Group Company)
6A, A. J. C. BOSE ROAD
CALCUTTA-700 017
Phone : 247-9269/1052/4369/40-3262/0138
Telex : 2566 MPCU IN

□

□
With best compliments from :

HEXT (I) PVT. LTD.

12, PRINCEP STREET
CALCUTTA-700 013

□
With best compliments from :

PATAKA BIDI

Aurangabad
Dist : Murshidabad

□

Space donated by :

A WELL WISHER

With best compliments from :

ALLIES

Printing, Stationery &
General Order Suppliers &
Consultancy Services

26, Vivekananda Sarani
Calcutta-700 078
Contact No : 245-0659

□
With best compliments from :

SCARLET

Consult for Silkscreen, Design, Art Work, Banners, Gift items.
5A, K. N. SEN ROAD (Kasba)
CALCUTTA-700 042
Phone : 42 4288

□
With best compliments from :

Unique Organics Limited

98, STEPHEN HOUSE : 6th Floor
4, B. B. D. BAG (EAST)
CALCUTTA-700 001
Phone : 220-0487/220-5664
Fax No. (033) 221-1302

□

With best compliments from :

CIVTECT (I) PVT. LTD.

Engineers, Contractors & Consultants
73/29, GOLF CLUB ROAD
CALCUTTA-700 033
Phone : 473-1166/472-0133
Fax : 473-0687

Declaration No. : 96/93 ☐ Jul.-Sep. 1995 ☐ Rs. 32

M/s. DAS PRINTERS
123/1, ACHARYA P. C. ROAD
CALCUTTA-700 006
Phone : 350-4312, 350-8843
Leading House of Quality Letter Press & off-set Printing.

সঞ্জয় চক্রবর্তী কর্তৃক ইমপ্রিন্টা, ২৪৩/২বি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত ও টি জি ২/২৯, তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০ ০৫৯ থেকে প্রকাশিত।
চিত্র মুদ্রণ : দাস প্রিন্টার্স, ২২৩/১, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬